দুয়েকটি ঘর দুয়েকটি স্বর

লোকনাথ ভট্টাচার্য

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর ঃ
বিশ্বনাথ কবিরাজ
হাতীবাগান প্রিণ্টার্স
৫৭, গ্রে স্ট্রীট (অরবিন্দ সরণী),
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
কান্তি রায়

আট টাকা

শ্রীমনোজ ভট্টাচার্য
শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য
—দুই শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে,
এক সন্ধ্যার স্মারক

'আরো একবার, শুধু একটি দ্বিতীয়বার, জলে ঝাঁপ দাও না তুমি যুবতী, দাও না আবার আমায় স্বর্ণসুযোগ তোমাকে, ও আমাকেও রক্ষা করার !' একটি দ্বিতীয়বার, বাপরে, কী আশঙ্কা-সঙ্কুল প্রস্তাব ! ধরুন, প্রিয় মহাশয়, প্রস্তাবটাকে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হ'তে হলো, তখন তো কাণ্ডটার শেষ না দেখা পর্যন্ত আমাদের নিস্তার থাকবে না, থাকবে কি ? ওরে বাবা ··! জল কী কনকনে ঠাণ্ডা ! কিন্তু এত ভাবনাটাই বা কিসের, সে-সুযোগ আর তো আসার নয়, কারণ সময় পেরিয়ে গেছে। সময় চিরকালই ঠিক পেরিয়ে যাবে — ভাগ্যিস !

—'চ্যুতি' : আলবের কাম্যু

এক ॥ রাখালের বিরক্তি

আজ সমস্ত কলকাতার সঙ্গে যেন দেখা হওয়ার কথা আছে। যেন এই হাত-পা ছড়িয়ে দু'দণ্ড বসার শান্তিটুকু কেউ সহ্য করবে না বলে পণ করেছে। যেন একটা ষড়যন্ত্র, একটা চক্রান্ত, একটা অভিসন্ধি একটি কোণার মানুষের বিরুদ্ধে সকলের।

এবং সেই কোণার মানুষটির দোষটি কী হয়েছে, কোন মহাপাতকে সে পাপী? সে কি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী? না সে কি কাল সন্ধ্যায় গলায় কাপড় দিয়ে হাত যোড় ক'রে বেড়িয়ে ফিরেছে লোকের দরজায় দরজায়, উলুবেড়েয় আর যাদবপুরে আর নিউ আলিপুরে, ব'লে যে মশাই, দয়া ক'রে আমার ইচ্ছাকৃত অবসর সময়ে একটু পায়ের ধুলো দেবেন অমুক রাস্তায় অমুক নম্বর বাড়ির অমুক নম্বর ঘরে? বলেছে, দয়া ক'রে একটু বিরক্ত ক'রে কৃতার্থ করবেন?

সত্যি, না জেনে শুনে, এবং কখনো কখনো সম্পূর্ণ অকারণে, মানুষ যেভাবে মানুষকে বিরক্ত করতে পারে, উত্যক্ত করতে পারে, তাকে প্রায় উন্মাদ হওয়ার দরজায় এনে ফেলতে পারে, তা' নিয়ে কবে এই তথাকথিত নব্য যুগের সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদরা একটু পড়াশুনো করবেন, একটু আলো দেবেন? ইচ্ছা ক'রে আগে থেকে অনেক ভেবে-চিন্তে, মানুষ যখন মানুষকে খুন করে, তাকে আর্তনাদ করার সময়টুকু পর্যন্ত না দিয়ে, সেও বরং অনেক ভালো। কিন্তু এ কী? পলে পলে যেন চিমটি কাটা, যেন কাঠ পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া বগলে-উরুতে? এখানে হর্ণ বাজানো নিষেধ, রাত দশটার পরে লাউডস্-স্পীকার চালানো

চলবে না—খুব ভালো, খুব ভালো। এ সব তো মানুষের সভ্য হওয়ার পথে চলতে পারার নিদর্শনই। না, তার বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই। পথচারীদের বিড়ম্বনার তো এমনিতেই শেষ নেই, বিশেষ ক'রে এই গরমে, প্যাচপেচে ঘামে, ফুটন্ত গলন্ত পিচের রাস্তায়, অথবা শান ক্ষয়ে-যাওয়া ফুটপাথে, তাদের যে-যার নানান তাগিদের পা চালায়, হিড়িকে—তার ওপর আবার তুমি ভাগ্যবান গাড়ি চালিয়ে হর্নের ভেঁপুটি তাদের কানে না হয় না-ই বাজালে। আর লাউডস্‌ স্পীকারটা তো সত্যিই একটা সর্বনাশা জিনিস, একটা ঘৃণিত, কলুষিত, অপদার্থ পদার্থ। বিশেষ ক'রে রাত্তিরে।

যাগ-গে, কথা তা' নয়। কথা হচ্ছে, হ'তে তো পারে যে কখনো-কখনো মানুষ একটু একলা থাকতে চায়, একেবারে একলা, নিজের মধ্যে নিজে, দরকার হ'লে নিজের থেকেও পালিয়ে, মনে মনে ছুটতে একটু নির্ঝঞ্ঝাট নিশ্চিন্ত ফাঁকের আকাশে, একটু হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে এক মুহূর্তের জন্যে যা-কিছু নিজের কোল-জুড়ে বসে থাকা, পচা, দুর্গন্ধ, অতি ভয়ঙ্করভাবে পরিচিত? এক কথায়, একটু হাত-পা গুঁটিয়ে বসতে, বিশ্রাম নিতে? কথা তা-ই। আর কোন্‌ হতভাগার এমন কী আসতে যেতে পারে তাতে, যদি সে ব্যাটার চোখের আড়ালে, তার কোনো অশুভ কামনা না ক'রে, কেউ একটু হাত-পা গুঁটিয়ে বসতে চায়!

কিন্তু হয়েছেটা কী? হঠাৎ এত বিরক্তির কারণটা কী রাখালের? কারণ? ঐ শোনো, দরজায় আবার টক টক পড়েছে। এই নিয়ে দিনে দ্বিতীয় বার, এবং তাও পনের মিনিটের মধ্যে উপর্যুপরি।

এখন পাল্টা প্রশ্ন হ'তে পারে—এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক—বেশ তো, দরজায় আবার না হয় টক টক পড়েছেই, কিন্তু তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে? দুটি বারের ধাক্কাতেই (তোমাকে অতর্কিতে রাস্তার ওপর উল্টে ফেলে দিয়ে নয়, শুধু একটি আঙুলের মৃদু আঘাত পাঁচ হাত দূরের দরজায়), এত কাত্‌ তুমি? লোক আসবে

না? এটা কি আপিস নয়? আপিস বলে আপিস, একেবারে ইন্‌কাম ট্যাক্স আপিস। ভূভারতে দেখাও দেখি এমন আর একটি আপিস যেখানে এত অজস্র লোক নিত্যে আসছে যাচ্ছে,—কেউ ককিয়ে কাঁদতে, একটু দয়া-ভিক্ষা চাইতে, কেউ তর্ক করতে, ঝগড়া করতে, দরকার হ'লে অপমান করতে, এমন কি ভয় পর্যন্ত দেখাতে, কেউ বা শুধু সামান্য বা অসামান্য একটি খবর চাইতে? তা' ছাড়া, কী বাপু এমন লাট তুমি হে, বর্ধমানের মহারাজা? মাইনে পাওয়া চাকরে নও? একটা আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, একটা বিবেক বলে বস্তু নেই? এই যে মাসে মাসে এতগুলো ক'রে টাকা পকেটস্থ করছ, যাতে তুমি খেয়ে-পরে বেঁচে আছ, ইদানীং একটু ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা যাচ্ছে, যে টাকায় তোমার সংসার বেঁচে আছে, যার দয়ায় ট্রাম চড়ছ বাস চড়ছ, সিনেমায় লাইন দিচ্ছ, খেলার মাঠে ছুটছ, ইত্যাদি, ইত্যাদি—সেটা কি এই আপিসে ব'সে তোমার মনে মনে ছোটবার জন্য একটু নির্ঝঞ্ঝাট নিশ্চিন্ত ফাঁকের আকাশে, একটু আজগুবি ফুরফুরে হাওয়ায়? কোন্ ধরণের মামার বাড়ির আবদার এ: নিজের থেকে নিজে পালাবে: মরি, মরি: তা' বেশ তো, পালাও না এই মুহূর্তে পালাও। গড়ের মাঠে যাও। সেখানে প্রচুর ঘাস, আর অনেক গোরু। মন ব'লে কোনো বস্তুই নেই। কিন্তু তা' করার আগে দয়া ক'রে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যাও।

কিন্তু এই ধরণের যুক্তি শুনলে রাখাল আঁতকে উঠবে, ভয়ে নয়—বিস্ময়ে। বিস্ময়ের চেয়েও বড়, ঘৃণায়। এই সমস্ত ছেলেমানুষী যুক্তির পক্ষে বা বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়াই তো নিজেকে ছোট করা। মানুষ কি গাধা, না গোরু, না ঘাস? তার যে মন আছে, আর ঐ মনটা নিয়েই যে যত মুস্কিল। ঐ সর্বনেশে বস্তুটি মানুষের মধ্যে ঢুকিয়েই তো বিধাতা তাকে ফ্যাসাদে ফেলেছেন। কিন্তু এ সব কথা বলা কাকে! মনহীন গর্দভ জাতীয় মানুষদের, যারা ওরকম অমানুষিক যুক্তির অবতারণা করতে পারে? তা ছাড়া, কে বলছে যে পয়সা নেব, কিন্তু

কাজ করব না? আর কাজ করব মানেও এ নয় যে কাজের সময় প্রতিটি মুহূর্ত শুধু কাজই করব, একটু ভাবব না বা বিরাম চাইব না। অনেক সময় আবার এই ভাবনা, এই একটু ক্ষণের বিরাম, তা' ঝিমিয়ে-পড়া মনকে জীইয়ে তোলে, আরো ভালো ক'রে কাজ করতে সাহায্য করে।

এ ছাড়া আরো আছে। মানুষের মনের গড়ন, তার শিক্ষা-দীক্ষা, পিছনের দিনগুলোর জ্যোতি বা অন্ধকারের অবিনশ্বর ছাপ এই ক্রমাগতই চ'লে যাওয়া আজকের ওপর। আছে কথা ভিতরের, অন্তরের। সেই অন্তর্জগত আর বহির্জগত, এ-দুটোর সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি ঘটতে পারে না জীবনে, ঘটতে পারে না জীবনের কোনো একটি মুহূর্তেও। আর রাখালের শিক্ষার কথা, তার দীক্ষার কথা, পিছনের দিনগুলোর সেই জ্যোতি বা অন্ধকারের কথা? তাও অনেক, ও তা' অতি বিশিষ্টই।

আজ না হয় কাজ করতে হচ্ছে—আর কাজ করতে সকলকেই হয়, কারণ বাঁচতে সকলকেই হয়, আর বাঁচতে গেলেই পয়সা চাই, পয়সার জন্যে চাকরি চাই—আজ না হয় রাখালকে কাজ করতে হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স আপিসে। এবং তাও, কত সাধ্য সাধনা ক'রে, কতবার তথাকথিত ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে, কত হিন্দী শিখে আর গুজরাটি শিখে আর পাঞ্জাবী শিখে কত বছর ধ'রে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে (উঃ, ধূসর কেরানী জীবনের সেই দম বন্ধ হয়ে আসা দিনগুলো!) তবে না আজ অবশেষে অফিসার হয়েছে! অফিসার হয়েছে, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হয়েছে, তা' সত্যি, ও তা' অনেকখানি। কিন্তু তাই ব'লে কি তার মনটাও ইনকাম ট্যাক্স হ'য়ে গেছে? না তা' সম্ভব? এই চল্লিশ বছরের দিগন্তকে যে রাঙিয়ে গেছে অনেক সূর্যোদয়, অনেক সূর্যাস্ত, ও যার সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। এই মুহূর্তটিতে যে সেই সব ক'টি সূর্যোদয়ের নির্যাস,

সেই সব কটি সূর্যাস্তের রঙ—এ একটি সত্তার অংশ। এ নয় খণ্ড বিচ্ছিন্ন এক উড়ে-আসা তুলোর বীজ, চেনে না তার গাছকে, জানে না কোন মাটিতে এসে পড়ল। এ কি শুধু ফ্যানের তলার মুহূর্ত, গুমোট ঘরের, পাল পাল নিরর্থকতার? আসলে, কোনো মানুষই কোনো মুহূর্তেই নয় শুধু নিছক অফিসার, সে আরো অনেক কিছু।

আর রাখাল তো বিশেষ ক'রে চেষ্টা করলে আজ সে হ'তে পারত একটা অধ্যাপক, অন্তত ছোট খাটো একটা কলেজে। হয়নি, কারণ শিক্ষকতার দিকে সে যেতে চায় নি। হয়তো ভুল করেছে, হয়তো ভুল করেনি। সে-প্রশ্ন করার নয় আজ। এবং সে-প্রশ্ন রাখাল নিজেকে কোনো দিন করেনি। চাকরিতে ঢুকেই দিন কেটে গেছে সংগ্রামে। শান্তি যে আজ মিলেছে, তা' নয়। কিন্তু শান্তি কোথায় মেলার? কখনো কি মেলে? যাকগে, সে-কথা থাক। কথা হচ্ছে, একটা অধ্যাপক গোছের বস্তু সে আজ হ'তে পারত। আর তার বাবা তো তা' চেয়েছিলেনও। বাড়িতে সবাই-ই তো শিক্ষক, তিন চার পুরুষ ধ'রে—বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা, বাবার বাবা, তাঁর বাবা, ইত্যাদি। তাই বোধ হয় এক ধরনের বিদ্রোহের ভাবে রাখাল গিয়েছে অন্য পথে। নইলে ডিগ্রীর তার কিছু অভাব নেই। আর পরীক্ষায় সব সময় এমন কিছু আহা মরি কৃতিত্ব লাভ না করতে পারলেও পড়াশুনোয় খারাপ সে কোনোদিন ছিল না। তা' ছাড়া, কীই বা এমন আহা মরি কৃতিত্ব-ওলা ছেলের দরকার পড়ে শিক্ষক হ'তে গেলে? কথা তা' নয়। কথা হচ্ছে, আজ যদি তুমি রাখালকে জানতে চাও ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে, এবং শুধু ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবেই—যেহেতু সে এই মুহূর্তে এই চেয়ারে ব'সে আছে, ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে—তো তুমি তার অনেক কিছুই জানলে না, হয়তো তার কিছুই জানলে না। তার মানে এ নয়, নিশ্চয়ই নয়, যে সে আপিসের কোনো ধারই ধারে না, কাজ হ'ল কিনা হ'ল সে-বিষয়ে তোয়াক্কাই করে না। এই তো সেদিনই তাকে

নিজের ঘরে ডেকে বলেছেন এ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার সাহেব: 'কী তদন্তটাই করেছ, রাখাল। ব্যাটা মুদি হ'য়েও যে এত পয়সার মালিক, তা' কে জানত! তাই তোমাকে সাক্ষাতে জানাতে চেয়েছি, কতখানি একেবারে চমৎকৃত তুমি আমাদের ক'রে দিয়েছ। দেখি, তোমার কোনো প্রোমোশান-টোমাশানের সম্ভাবনা আছে কিনা।'

অতএব?

তাই, কথা তাও নয়। তবু এখনো তো বলাই হয়নি রাখাল সম্বন্ধে একেবারে আসল কথাটা, অন্তত যেটাকে সে নিজে এতদিন আসল ব'লে জেনে এসেছে নিজের সম্বন্ধে, জানতে চায় আজো, ও চিরকালই জানতে চাইবে ব'লে মনে করে। সেটা হচ্ছে তার সাহিত্য-চর্চার ব্যাপারটা। চর্চা মানে নয় কেবল পড়া। তা' তো আছেই—যথার্থ সাহিত্যরসিক বলতে যা' বোঝায়, তার থেকে কিছু কম নয় ও। এই তো কিছুদিন আগেই কী এক কথোপকথন প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল অতি-আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটক নিয়ে। ঘটনাটি ঘটেছিল একটি বন্ধুর বাড়িতে, সন্ধ্যেবেলা। একজন ব'লে উঠল, ওসব নাটকে সংঘাত ব'লে আর কোনো বস্তু নেই, মানুষ পশুর জড়ত্ব পেতে চলেছে, আর সেইটেই হ'ল আজকের সভ্যতা। যেই না একথা বলা, রাখাল তাকে এমনি চেপে ধরল যে আলোচনা চলল রাত বারোটা পর্যন্ত। আলোচনার উত্তেজনায় এমন অনেক কথা রাখাল ব'লে ফেলেছিল সেদিন যে তাই নিয়ে পরে ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়, সত্যিই তো, কথাগুলো অত্যন্ত খাঁটি ও নতুন, এগুলির মধ্যে একটি বিশেষ বক্তব্য আছে, যা' আগে কেউ তেমন বলে নি। সেই বিশেষ বক্তব্যটিকে ও পরে আরো পরিষ্কার ক'রে ও সাজিয়ে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করে।

না, রাখালের সাহিত্যচর্চা মানে শুধু সাহিত্য পড়াই নয়—সাহিত্য করাও। প্রধানত কবি ও, এবং ছেলেবেলা থেকেই। কবিতাকে নিয়েছে ও তপস হিসেবে। বিশেষ করে আজ যেন রূপ দেবার

অসম্ভব ক্ষমতাকে অত্যন্ত সামান্য অংশে আয়ত্ত করতে পেরেছে ব'লে মনে করছে। এটা সম্ভব হয়েছে বহু বছর ধ'রে লেখার পরে—রাতারাতি নয়। কত নির্মম যন্ত্রণার মুহূর্তে তার মনে হয়েছে, দূর ছাই, পারলাম না, যা' বলতে চাই তা' আসছে না। কিন্তু আজ যেন আসছে, একটু একটু ক'রে। ইতিমধ্যেই তার একটি ছুটি কবিতা কতকগুলি সংকলনে স্থান পেয়েছে। নানান নতুন পত্রিকা হ'তে লেখার তাগিদও আসে মাঝে মাঝে। এবং কবিতা ছাড়াও রাখাল অন্য আরো কিছু লেখার চেষ্টা করেছে। প্রকাশ করেছে কম নয়, আরো অনেক বেশি করতে পারতও নিশ্চয়ই। এবং সে স্বনামধন্য নয়, তাকে নিয়ে কোনো হৈ-হুল্লোড় পড়েনি। হৈ-হুল্লোড় পড়ুক তাকে নিয়ে একদিন, সে রকম আশা বা আকাঙ্ক্ষাও সে পোষণ করে না। শুধু লিখে যাওয়া, যতটুকু পারা যায়, এই ইনকাম ট্যাক্সের চাকরি ক'রেও।

এবং যে-মানুষটা লেখে, অন্তত এই রকম লিখতে চায়, তার কি একটি বিশিষ্ট মনের গড়ন নেই? যেহেতু সে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হ'য়ে আপিসে ব'সে আছে, তার কি অধিকার ভাবতে পারার, এই, মুহূর্তে শুধু অঙ্ক, শুধু কে কোথায় সরকারকে ফাঁকি দেবার তাল খুঁজছে, ইত্যাদি, সেই কথা? কিন্তু এসব বোঝানো কাকে, আর কেনই বা বোঝানো! এক মুহূর্তের নীরবতার যে-বেদনা, যে-প্রচণ্ড আনন্দ, যে-নামহীন সম্পূর্ণ নিরর্থক শান্তি, তা কেমন ক'রে বোঝানো যাবে সেই অরসিকদের, যাদের প্রতিটি মুহূর্ত নিক্তির ওজনে ওজন-করা, শুধু অর্থপূর্ণ এক খেলো ব্যবহারিক ভাবে? তাতে সূর্যালোক যদি পড়ে তো পড়ুক, কিন্তু তা' পড়বে শুধু যেন ভিজে কাপড় শুকোনোর জন্যে। কিন্তু সেই সূর্যের ধাবমান আলো, যা জানে না কেন মন্দিরের সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে মরতে চায়, অথবা যা গা এলিয়ে শুয়ে আছে ভিজে মাটির গন্ধে, বৃষ্টি ধৌত প্রান্তরে প্রান্তরে—তার কথা? না, সে-মুহূর্তের কথা আলাদা। তার ঠিকানা জানে

রাখাল—হ্যাঁ, সেই নামধারী ইনকাম ট্যাক্স অফিসারটি, যে এখন আপিসের পয়সায় ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। আর ভাবতেই যে হবে কিছু, কবিতার কথা, বা জ্যোতির কথা, বা অন্ধকারের কথা, বা সেই আজগুবি ফুরফুরে হাওয়ার কথা—এমন সাংঘাতিক সর্ত কোনো অবসরের মুহূর্তের সঙ্গে কোনো ভাবুকের নেই। হয়তো রাখাল তেমন কিছুই ভাবছে না এই মুহূর্তে—তাতেই বা কী ? আসলে সে সত্যিই কিছুই ভাবছে না, একটি ফাঁকা, ফাঁপা মুহূর্তের অন্তরে ঢুকে তার শান্তি বেদনা-আনন্দ খুঁজছে, সেই শান্তি-বেদনা-আনন্দের কথা সজ্ঞানে এতটুকু না ভেবেই, কিছু না ভেবেও ভাবতে পারা যায়, কিছু না ক'রেও করতে পারা যায়, সৃষ্টিশীল মনের এই অতীব গূঢ় রহস্যটি যেদিন ঐ লৌহ মস্তিষ্ক গর্দভজাতীয় মানুষরা বুঝবে, সেদিন হয় প্রচণ্ড এক আকস্মিক বিস্ফোরণে পৃথিবীটা আর থাকবেই না, নয় নতুন ইতিহাসের পাতা আরম্ভ হবে।

যাক গে, লোক আসবে, রাখাল তা' মানে—তা' নিয়ে কোনো তর্ক উঠতে পারে না। কারণ এটা আপিস। কিন্তু তার ঘরে এত কী লোকের যাওয়া-আসা রে বাবা, দরকারটা কী ? এইভাবে এসে-যেয়ে কে কোন্ মোক্ষটা পাচ্ছে, কাকে সে কোন্ মোক্ষটা দিতে পারছে ?

বেশির ভাগই তো জানা আছে আসে কী জন্যে, অন্তত বছরের এই সময়টাতে। ফর্ম চাইতে। যুধিষ্ঠিরের পুত্র সব, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটি পড়েছে। আর অমনি ছুটেছে। যেন কন্যাদায়। যেন এই মুহূর্তে বাস্-এ ঝুলতে ঝুলতে বেশ কয়েকটি পয়সা অর্থদণ্ড দিয়ে ড্যালহৌসী স্কোয়ার অভিমুখে তীর্থযাত্রাটি না করলেই নয়! তারপর দর্শন দেওয়া এই ঘরে। কারুর হাতে ছাতা, কারুর হাতে লাঠি, কেউ বা বেপরোয়া বুশ শার্টে। সকলেরই ঘর্মাক্ত মুখ, আর পিঠে, একটি ক'রে প্রকাণ্ড সিক্ত গোল্লার ছাপ, যার ভিতর দিয়ে ছেঁড়া গেঞ্জীটি পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে—হাঁড়ির খবরটি সর্বসমক্ষে নীরব চীৎকারে জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু এ-সহরে কারই বা

লজ্জা আছে! বিশেষ ক'রে যখন সকলের হাঁড়ির খবরটিই উনিশ-বিশ সমান। এবং সেই ছেঁড়া গেঞ্জীটি দেখানোর জন্যে এই ঘরে তাদের ঢুকতেই হবে। যেন দেখাতে, ছাখো, ছাখো, আমার গেঞ্জীতে কী সুন্দর একটি ছিদ্র আছে! কিন্তু কে এখানে ধন্না দিয়ে ব'সে আছে তোমার গেঞ্জীটির ছিদ্রটি দেখতে চেয়ে—খেয়েদেয়ে যেন আর লোকের কাজ নেই। এবং তারা চাইবে ফর্ম। কিসের ফর্ম? —বাঃ, ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে না? বলতে হবে না, মাসে মাসে কত উপায় করেছি, সারা বছরে কত উপায় করেছি, চাকরি ছাড়াও অন্য কিছু উপরি পাওনার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ঘটেছে কিনা, হাতে কিছু দু-পয়সা এসেছে কিনা, বাবা বা খুড়ো বা মামাশ্বশুর কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি? এক কথায়, যে-আত্মজীবনী এখনো লেখা হ'য়ে ওঠেনি, তা' অন্তত অংশত এই অনবদ্যভাবে জটিল ও ধোঁকা লাগানো ফর্মের কয়েকটি পৃষ্ঠায় না লিখে ফেললেই চলবে না কি? নইলে কি এসেছি অমনি-অমনি? আমাদের যে রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না, বাজারে আলু কিনতে গিয়ে টাকার ভাঙানি নিতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছি, সত্যনারায়ণের পূজো দিতে গিয়ে মনে প'ড়ে যাচ্ছে, ঐ যাঃ, সরকারের ঋণ তো এখনো শোধ হয় নি!

লোকগুলোর ভাবখানা যেন এমনিই। যেন এখুনি-এখুনি এই ফর্মটি আদায় ক'রে তাকে সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণভাবে, ও ধর্মাবতারের সততার সঙ্গে পূরণ না করতে পারলে তাদের অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগের সম্ভাবনা আছে। সত্যি, এই ধরনের যুধিষ্ঠিরপুত্রদের বিংশ-শতাব্দীর কলকাতায় থাকা কেন? যাক না তারা লুপ্ত হস্তিনাপুরে, অথবা সেই ধর্মের কুকুর ভীমের অগ্রজকে যা' করেছিল, তেমনি করে তাদেরও পথ দেখাক না আকাশের সিঁড়ির? অবশ্য, দোষও দেওয়া যায় না। বেচারারা করবেই বা কী? সরকার তো এদিকে ওস্তাদ, সবাই-এর নাম-ধাম-ঠিকানা হাতড়ে নিজে থেকে ফর্ম পাঠানোর দায়িত্ব তো

তিনি গ্রহণ করবেন না—অন্যদেরই তাঁর দরজায় আসতে হবে। এবং না আসলে তাদের যথাযথ শাস্তিরও সুচিন্তিত ব্যবস্থা সরকার ক'রে রেখেছেন।

না, ফর্ম চাইতে আসার জন্যে তাদের কেউ দোষ দিচ্ছে না। কথা হচ্ছে, তারা আসবে কেন এই ঘরে। এটা কি ফর্ম চাওয়ার ঘর? ফর্ম চাওয়ার ঘরটা না দোতলায়, সিঁড়ির পাশে? সেখানে না তিন-তিনটে লোক আছে ফর্ম বিলি করার জন্যে? এ-ঘরে কেন?

শুধু আবার তা-ই নয়। অনেকে হয়তো বেশ ভালোভাবে জ্বালাতন-টালাতন করার পর এ-ঘর থেকে বিদেয় হ'ল, পৌঁছোল যথার্থ স্থানে। ফর্ম চাইল। শুনল (অবশ্য ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কোমরে প্রায় ব্যথা ধ'রে যাবার যোগাড় হওয়ার পর, বা এ-জানালা থেকে ও-জানলায় বেশ কয়েকবার চরকিবাজী খাওয়ার পর) যে ফর্ম নেই, ছাপা নেই বা ফুরিয়ে গেছে, বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বা এই ধরনের কিছু একটা নঙর্থক উত্তর। রাখাল জানে যে এই ধরনের উত্তরের অধিকাংশই একেবারে নিছক বাজে কথা—শুধু অসহায় লোকগুলোকে অনর্থক ঘোরানোর জন্যেই বলা। আসলে ফর্ম হয়তো সত্যিই আছে, কিন্তু কেরানীটি খুঁজতে চায়, না হয় আলস্যে, নয় ঘুষের লোভে, নয়……। যাক গে। বলার কথা হচ্ছে যে সেই একই লোকগুলো যারা ঘণ্টাখানেক আগে এ-ঘরের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় অরাজকতা এনে বিদেয় হয়েছিল, তাদের সবাই গুড় গুড় ক'রে আবার এসে উপস্থিত। কী ব্যাপার? না ওপরে নাকি প্রশ্ন করলে উত্তরও মেলে না, আর যদিই বা মেলে তো ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে কে কোন্ প্রশ্ন করছে আর কার কোন্ উত্তরটা আসছে, তা' নিয়ে নাকি মহা সমস্যায় পড়তে হয়। তাই মহাশয়েরা আবার এসে উপস্থিত, জানতে ফর্ম পাওয়ার সম্ভাবনা কোনো অদূর ভবিষ্যতে আছে কি না, আর যদি থাকে তো কোন্ তারিখ নাগাদ তাঁরা আবার পায়ের ধুলো দিতে পারেন—

কারণ আরো একবার খামাখা এই গরমে পয়সা খরচ ক'রে এসে সময় নষ্ট করতে তাঁরা প্রস্তুত নন।

খুব সত্যি কথা, ন্যায্য কথা। কিন্তু সময় বস্তুটাকে কি তাঁরাই একমাত্র একচেটে ক'রে রেখেছেন? সময়ের দামটা কি একলা তাঁদেরই আছে, অন্য কারুর নেই? হতভাগাদের বোঝানো যায় কী ক'রে যে আপিস একটা হ'লেও তাতে কাজ হয় হরেক রকমের ও অজস্র, এবং বিশেষ ক'রে এ-ঘরে ফর্ম নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না? তবু এ-ঘরে আসা (আসা মানে ফের ফিরে আসা) কেন? কারণ এ-ঘরে নাকি অন্তত একটা কিছু উত্তর পাওয়ার আশা আছে। লোক কম। বাইরে থেকে দেখেও নাকি ঘরটাকে বেশ ভারী ভারী সম্মানজনক মনে হয়। এখানে এলে হয়তো কেউ ধাপ্পা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে না।

কথাটি হচ্ছে তাই। এ-ঘরটি একটি মহা মুস্কিলের ঘর। এবং সেই মুস্কিলটি হচ্ছে এই যে ঘরটি একেবারে বড় ফটকের প্রায় পাশে। ঢুকলেই নজরে পড়বেই। এবং যেহেতু আশে-পাশের ঘরগুলোর আভিজাত্য ব'লে বস্তু নেই, দরজাগুলো হিপোপটেমাসের হাঁর মত হাট ক'রে খোলা, এবং তার মধ্যে প্রায় অগুনতি অল্প মাইনের লোক কাজ ক'রে যাচ্ছে (অর্থাৎ ব'সে আছে, পান চিবোচ্ছে, নিজেদের মধ্যে কখনো-সখনো ঠাট্টা-তামাশা করছে, ও মধ্যে মধ্যে কিছু কালি-কলমও চালাচ্ছে), চেয়ার-টেবিলের ঠেলায় ঘরগুলোর মধ্যে হাঁটুতে ঠোকর না খেয়ে নড়বার উপায় নেই, তাই বাইরে থেকে কেউ এলে সচরাচর ঐ ঘরগুলোর দিকে পা বাড়ায় না। কিন্তু যেতে তো হবে কোথাও, নইলে ঢুকেছে কেন? তাই নজরে পড়ামাত্র সটাং চ'লে আসে এই ঘরটার দিকে, হন হন ক'রে।

কাছাকাছি অন্য ঘরগুলোর তুলনায় এ-ঘরটি আপাত দৃষ্টিতে ভদ্র ও আকারে ছোট, সন্দেহ নেই। এবং ঘরে মাত্র দুটি লোক।

দুজনেই অফিসার। ভিতরে দুটি বড় টেবিল এবং গোটা ছয়েক চেয়ার থাকা সত্ত্বেও স্থানের অভাব নেই। এবং বাইরে থেকে ভড়কে দেবার মত তেমন একটা মারাত্মক আভিজাত্যও নেই ঘরটার, যেমন সাজগোজ করা চাপড়াশী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা, ইত্যাদি। এক কথায়, ভ্যাবাচাকা খাওয়া অনাহূতদের আকর্ষণ করার মত সমস্ত বাহ্যিক উপকরণই আছে ঘরটির। সুতরাং···।

তাই রাখাল চেয়েছিল, এবং তার সঙ্গী সহকর্মীটির সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল সেই প্রস্তাবে, যে ঘরটিতে ঢোকার যে-দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজা, তাদের ওপর একটি ক'রে স্প্রিং-আটা ছোট দরজা লাগিয়ে দেওয়া যাক। ব্যাপারটা একদিনেই কার্যকরী হ'য়ে ওঠেনি—এক দিনে কিছুই সম্ভব হয় না সরকারী আপিসে। কত লেখালেখি, ফাইলের দৌড়ঝাঁপ এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, এ-হাত থেকে ও-হাতে, এর টীকা, ওর টিপ্পনী, এর জানতে চাওয়া এই অতিরিক্ত খরচের আবশ্যকতা কী, ওর উত্তর দেওয়া খরচটির আবশ্যকতা অপরিমেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি ক'রে তিন মাস বাদে অবশেষে দরজা দুটি তৈরি ক'রে লাগানো হ'ল। যাক বাবা, খানিকটা তো রক্ষে। তারপর দুটি দরজার মাঝামাঝি জায়গায় বাইরের দেয়ালের ওপর বোর্ড লাগানো হল—এটাও প্রথমে এসেছিল রাখালেরই মাথায় ও পরে সঙ্গী সহকর্মীটির উৎফুল্ল সম্মতি সমেত—'ঢোকার আগে দয়া ক'রে টোকা মারুন।'

বলাবাহুল্য, মানেটা এই নয় যে কোনো পিওনকেও ঘরে ঢোকার আগে টোকা মারতে হবে বা নিম্নতন কোনো কর্মচারী ড্রাফট সই করাতে আগের মত সটাং এ-ঘরে আর আসতে পারবে না। অনুরোধটির লক্ষ্য ছিল বহিরাগতরা। আর বড় কর্তারা? তাঁরা তো প্রথমত ছোটদের ঘরে আসেনই না, দরকার বোধ করলে তাদের ফোন ক'রে ডেকে পাঠান—আর ন'মাসে-ছ'মাসে যদিই বা হঠাৎ একদিন এসে পড়তে বাধ্য হন তো বাইরে কী লেখা-টেখা আছে

তাতে নজর দেন না। নজর দিলেও গায়ে মাখেন না। তা' ছাড়া, অফিসারের পদ পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারলে এই ধরনের কিছু কিছু ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর স্বাধীনতা পাওয়া যায়। যত তুমি ছোট, অর্থাৎ নিম্নে, তোমার অধিকারও তত কম। তখন তোমার হাঁচতেও ভয়। কিন্তু ওপরে উঠতে আরম্ভ কর, দেখবে আবহাওয়ার কী পরিবর্তন! রাখালের আজো মনে পড়ে তার কেরানী জীবনের এক ব্যাটা ডেপুটি সেক্রেটারীকে। ব্যাটা নিজেই সারাজীবন কেরাণীগিরি করেছে, তারপর উপরিওলা কোন মহাপ্রভুর করুণায় একদিন হঠাৎ তার চটাচট উধ্ব'গতি আরম্ভ হ'ল। পেনশন নেবার বছর দুয়েক আগে হ'য়ে দাঁড়াল ডেপুটি সেক্রেটারী। তখন তার দেমাক কী, বাপরে! নিজের ইচ্ছামত চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে বসতে পর্যন্ত পারত না রাখাল। কিন্তু এখন? মোড় ফিরেছে। এখন সে নিজেই অফিসার।

যাই হোক, স্প্রিং-আঁটা দরজা, বোর্ড, ইত্যাদি আপাত অনাবশ্যকতার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ঐ বহিরাগত পঙ্গপালদের অযথা আক্রমণ হ'তে নিজেদের একটু ঠেকিয়ে রাখা। ভেবেছিল রাখাল যে এত করার পর আর রাম-শ্যাম-যদু-মধু হুট ক'রে হয়তো ঢুকে পড়বে না ঘরটায়, অন্তত এখন থেকে তাদের মনে হ'য়তো একটা প্রশ্ন জাগবে, একটা সমীহের ভাব আসবে, একটা সন্দেহ হয়তো। এবং শেষে হয়তো তারা অন্যত্র, অন্য কোনো ঘরের দিকে চ'লে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। হায়রে, কত বড় ভুল সেই ধারণা। নিস্তার যেন নেই, নেই।

অবশ্য, সব সত্ত্বেও, দরজায় আবার একটা সামান্য ধাক্কা পড়াতে রাখালের এই অদ্ভুত বিরক্তিটা একটু যেন বাড়াবাড়ি মনে হ'তে পারে। মেনে নেওয়া গেল সে কবি, সে এই, সে ঐ, তার জীবনের এই আলো, তার জীবনের ঐ অন্ধকার, তার কাছে কী দাম একটি মুহূর্তের নীরবতার, আর ঐ অবাঞ্ছিত অনাহূত পঙ্গপালের আক্রমণ

তার ঘরের প্রভৃতি, ইত্যাদি ইত্যাদি, মেনে নেওয়া সবই গেল। কিন্তু, তা' সত্ত্বেও···। কী এমন হয়েছে? দরজায় টোকা পড়েছে। আর তা' পড়েছে, কারণ তুমি নিজেই সেই রকম নির্দেশ বাইরে টাঙিয়েছ ব'লেই।

কিন্তু রাখালের দোষটা কোথায় নেই, তা' বুঝতে গেলে জানতে হবে আজকের কয়েকটি ঘটনা।

সকালে আপিসে পৌঁছানোর প্রায় পনের মিনিটের মধ্যে বড় কর্তার তলব এল। কী আদেশ? না এখুনি রাখালকে ছুটতে হবে খিদিরপুরে, কিছু তথ্যের সন্ধান আনতে। আর এসব কাজ সাধারণতই বেশ নোংরা কাজ, কারণ নোংরা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, আর তাতে নিজের হাতটাও পরিষ্কার থাকে না। ছুটল তাই খিদিরপুরে। বলাবাহুল্য, বাস-এ। অন্যান্য আপিসে শোনা যায়, সরকারী যানবাহন অপেক্ষাকৃত সহজে মেলে বাইরের কাজে বেরোতে গেলে। এ-আপিসে সবই উল্টো। তা' ছাড়া, এখানকার কাজই তো প্রায় টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ানোর, খামাখা লোকের নিন্দা ও গালাগাল পেতে ও লোককে নিন্দা দিতে। সুতরাং গাড়ি পেলাম না, তা' নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। আর আজকালকার দিনে বাস-এ চলাফেরা করা পূর্ব জন্মের নারী হত্যার ফল। কয়েক বছর আগেও, ভিড় এড়াতে চাইলে আপিসের সময়টা এড়ালেই চলত। অন্তত যে-সব বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান ট্রাম-বাস্ ধরতে পারতেন আপিসের সময়টি বাদ দিয়ে, তাঁরা সেই রকমই বলতেন। এখন? সব সময়ই যেন আপিসের সময়, আর ভিড় শুধু একটি দুটি লাইনের সীমাবদ্ধ নয়, কলকাতার সর্বত্র। সহরটা যে এখনো কী ক'রে খেপে উন্মাদ হ'য়ে ওঠেনি, সেইটেই আশ্চর্য। আর একবার বাস্-ট্রামে চড়লে জামা-কাপড়ের অবস্থা, নিজের চেহারার ছিরি, সব যেন নিমেষে পাল্টে যায়। যেন বেরোনোর আগে ছিলাম রাম, ফিরে এলাম কুম্ভকর্ণ হ'য়ে। যাক গে। খিদিরপুরে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট ক'রে, কাজ

হাঁসিল না করতে পেরে ও ডজন খানেক শ্রুতিমধুর গালাগাল খেয়ে রাখাল ফিরে এল সাড়ে বারোটা নাগাদ, এক পাহাড় প্রমাণ মাথা-ধরা নিয়ে।

ফিরল যখন, মেজাজেরও বারোটা বেজে গেছে। ইচ্ছে ছিল একটু হাত-পা এলিয়ে বসে, খানিকক্ষণ জিরিয়ে আপিসের ক্যান্টিন থেকে একটা ঠাণ্ডা কোকা-কোলা আনায়—যদি কোনোরকমে মাথা ধরাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতে দেখে কী? এক মক্কেল তারই টেবিলে ব'সে, অবশ্য উল্টো দিকের চেয়ারে পায়ে পা' তুলে। শুধু তা-ই নয়, লোকটা তারই পেন্সিল নিয়ে তারই প্যাডের ওপর নিশ্চিন্ত মনে একটি কুমড়ো আঁকছে। হয়তো কুমড়ো, হয়তো লাউ, কিম্বা পেঁপে। কথা তা' নয়। কিন্তু লোকটার আস্পর্ধাটা ছাখো।

সহকর্মী অফিসারটি ঘরে নেই—হয়তো তলব পড়েছে, কিম্বা কোথাও গেছে।

রাখালের পায়ের শব্দ শুনেই মক্কেল ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। বললে:—'আসুন দাদা, বসুন। আপনিও এসেছিলেন ফর্ম চাইতে, এ্যাঁ? যেমন শালার আপিস, তেমনি শালার লোকগুলো। আমি কিন্তু নড়ছি না, যতক্ষণ না কারুর সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারি।'

লোকটাকে ভাগাতে লাগল দু' মিনিট, এই ধরনের অবস্থায় কী বলতে হয় বা বলা উচিত, তা' ব'লে ব'লে রাখালের মুখস্থ হ'য়ে গেছে। লোকটা ভাগলো বটে, কিন্তু মাথা-ধরাটা ছাড়ল না।

তবু যদি এততেও যন্ত্রণার শেষ ঘটত। চরমটি, যেন একটি সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা কালো কুচকুচে কাঁকড়া বিছের চুমু, ঘ'টে গেছে খাওয়ার ঘণ্টার পরেই—তার মানে, এই তো মিনিট পনের আগে। অর্থাৎ, দরজায় প্রথম বার যখন ধাক্কা পড়েছিল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। দুপুরের খাওয়াটা রাখাল আপিসেই খায়—সকাল ৯টার সময় বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে

আপিসে আসার মত মনের জোর তার কর্মজীবনের প্রথম হ'তেই কোনোদিনই ছিল না। সময়ে খেতে পারাটা বড় কথা। তাই বাড়ি থেকে সামান্য কিছু বহন ক'রে আনে একটা ভদ্রগোছের টিফিন ক্যারিয়ারে—যা' আনে, তা' অবশ্য বেলা একটা পর্যন্ত আর খুব মুখরোচক থাকে না। প্রথমত, ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়; দ্বিতীয়ত, এই গরমে কলকাতার মনুষের মতই, বন্ধ টিফিন ক্যারিয়ারের গুমোট তাকে ঘর্মাক্ত ক'রে তোলে—তার চেহারাটাই পাল্টে যায়। কিন্তু কী করা যাবে—সময়ে খাওয়াটা তো অন্তত হয়! খাওয়ার শেষে ক্যানটিন থেকে এক কাপ চা' আনিয়ে নেয়, যা খানিকটা উষ্ণ আমেজে পেটটাকে সিক্ত করে। চ'লে যায়।

আজো তেমনি খাওয়া শেষ করে সবে চা'টি ধরেছে—তখনো ব'সে ঘরের কোণে পর্দা টাঙানো পার্টিশানটির আড়ালে, একটি অন্য জগত, নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট, একেবারে নিজের সঙ্গে নিজে একলা—এমন সময় দরজায় করাঘাত। যে-লোকটি ঢুকল—লোকটি বললে ভুল হবে, বলা উচিত ভদ্রবেশী মধ্যবয়সী একটি গুণ্ডা—দেখা গেল, সে অনায়াসে হ'তে পারত কাবুলিওয়ালা। আসলে লোকটি পাওনাদার। রাখালের বি. কম. ফেল-ক'রে ব'সে-থাকা চাকরি না-পাওয়া উড়নচণ্ডী গুণধর ভাগনেটি না কি এই ছদ্মবেশী কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়েছিল তিন মাস আগে, আজো ফেরত দেয় নি। তাই কাবুলিওয়ালার সশরীরে আগমন এখানে—এবং যা'-তা' কথা উচ্চারণ করা, মায় ভাগনেটিকে উদ্দেশ ক'রে ভীতি প্রদর্শন পর্যন্ত। এবং যেহেতু দিদির সংসার একভাবে খানিকটা রাখালেরই ঘাড়ে—জামাইবাবু হঠাৎ গত বছরে বসন্ত রোগে মারা গেছেন—এ-দেনা একমাত্র রাখালই শোধ করতে পারবে ভেবে কাবুলিওয়ালা ঠিকানা যোগাড় ক'রে এখানেই এসে হাজির।

ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাজনক—বিশেষ ক'রে সহকর্মী অফিসারটি তখন ঘরে ব'সে। 'এই নিন আপনার দশ টাকা, আর এই আপনার

যাতায়াতের বাস-খরচা। এইবার দয়া করুন', বলে রাখাল নিষ্কৃতি পায়। এখনো সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠেনি অপমানের ভাবটা।

এই ঘটনাগুলির কোনো একটি বিচ্ছিন্নভাবে নয়—বিচ্ছিন্নভাবে ধরলে মনের ওপর তাদের জের বেশিক্ষণ টি'কতে পারার কথা নয়—কিন্তু তারা যেন একটি সমষ্টিগত চেতনায় সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে একটি বিশেষ মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, তার কাছে শান্তি, বিশ্রাম, সঞ্জীবনী সুরা যখন আবার অকস্মাৎ আসছে, যেন কোন অদৃশ্যের বিদ্রূপের হাসি বহন ক'রে এল দরজায় এই দ্বিতীয় করাঘাত : টক টক।

রাখালের ভিতরে কোথায় কী যেন একটা চিনচিন ক'রে উঠল, রাগে, ক্ষোভে, বিরক্তিতে, যন্ত্রণায়। এবং বিশেষ ক'রে যখন এই মুহূর্তটিতে সে আবার একটু ধাতস্থ বোধ করতে আরম্ভ করছিল ধীরে ধীরে, তার সঙ্গী সহকর্মীটিও তাকে একলা রেখে কোথাও বাইরে গিয়েছে।

অথচ, শুধু যে তা-ই, তাও নয়। অর্থাৎ, শুধু এই ঘটনাগুলোর জন্যেই নয়। রাখালের এই মুহূর্তের স্বরূপটা আরো জটিল। স্বচ্ছ কাচের গেলাসের মধ্য দিয়ে যেমন ক'রে জলকে দেখা যায়, তেমন ক'রে এই মুহূর্তটিকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ মুহূর্ত তো শুধু মুহূর্ত-নয়, সে যে মনের অংশ। আর সেই মনটি রাখালের যেন আজ সারাদিনই একটু খাঁচা-ছাড়া পাখি। কাজে সকাল হ'তেই মন নেই। তাই হয়তো খিদিরপুরে গিয়ে কিছু হ'ল না। কী এসে-যায় রে বাবা—কাল সকালে আবার সূর্য উঠবে, আজ রাতে ঘুমও হবে, খাওয়াটাও হজম হবে। যেন এমন একখানা ভাব।

বিশেষ ক'রে সঙ্গী সহকর্মীটি হঠাৎ একটু বাইরে চ'লে যাওয়াতে বেশ মন্দ লাগছিল না। কাবুলিওয়ালার অপমানটা তখনো কানে বাজছে—কিন্তু তার ধ্বনি ইতিমধ্যেই ক্ষীণ। এ-রকম তো হ'য়েই থাকে জীবনে, গায়ে না মাখলেই হ'ল—বিশেষ ক'রে যখন দশটা টাকা দেওয়া হ'য়ে গেছে, ল্যাটা চুকে গেছে। অজস্র ফাইল পড়ে আছে

ট্রেতে, কোনোটা আর্জেন্ট, কোনটা অর্ডিনারী। কিন্তু ওসব দেখতে যাচ্ছে কে আজ! এ-জগতে কোন্‌টা আর্জেন্ট, কোনটা অর্ডিনারী! তাই কিছুক্ষণ আগের মক্কেলের মত সেও বসেছে পায়ের ওপর পা তুলে, চেয়ারটাকে একটু ঘুরিয়ে টেবিল থেকে। হাজার হ'লেও, এটা তো তারই ঘর। কানে যা' শুনতে পাওয়া যায় না, সেই রকম যেন কোন দূরাগত সঙ্গীত ভেসে আসছে, যেন কোন অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে মনটা ডুবতে চাইছে, ডুবতে চ'লেছে। শান্তি—না ঠিক শান্তিও নয়—যেন একটা অপ্রকাশ্য বাসনা, একটা বেদনা, একটা আনন্দ, একটি ছোট্ট কিছু—না, তারই ইঙ্গিত।

স্প্রিং-আঁটা দরজা বাইরের দালানটার সবটুকু আলোই আটকায় নি, কারণ ঘরের প্রবেশ পথের দুটো বড় দরজাই হাট ক'রে খোলা—এবং দালানের টুলটার ওপর পিওনটাও নিশ্চয়ই আছে, হয়তো ঝিমোচ্ছে, হয়তো বিড়ি টানছে। ভালোই তো, সবই আছে, ঐ বাইরের জগতটাও, আর এই ঘরের শান্তিটাও। রাস্তায় নিশ্চয়ই লোক ছুটছে, পাল পাল লোক, এই দুপুর রোদে—গরমের ঝাঁজটা কিছুটা আসছে বন্ধ কাচের জানলা ভেদ ক'রে, পর্দার আড়াল হ'তে। কী সহর রে বাবা! আর লোকগুলোর কারুরই মুখে একটা তাজা ভাব নেই—সে তিন বছরের একটা পুঁচকে ছেলেই হোক আর তিরাশি বছরের বুড়োই হোক। সমস্ত মুখগুলো যেন দুদিন আগের কেনা খরমুজা—চুপসে যাওয়া। তবু, সব সত্ত্বেও, ঐ কৃষ্ণচূড়া দেখা যাচ্ছে—এই ঘরের ভিতর থেকেও, পর্দার আড়াল হ'তে, দূরে। কী নিষ্ঠুর নির্লজ্জ লাল, কী মর্মান্তিক সৌন্দর্য—যার সঙ্গে জীবনের, এই ধাবমান জনতার যেন কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা একটা অন্য জীবনের ঘোষণা, এবং সেটাও নিশ্চয়ই আছে, ঐ সুন্দর, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর লালের জীবন। চোখ থাকে তো দেখে নাও, এবং দেখে নিয়ে পারো তো নিজেকে সমৃদ্ধ কর। ডাকটি শোনো, কারণ তা' যে শুনতেই হবে জীবনে—নইলে এসেছ কি শুধু রোদ্দুরে নিরর্থক ঘুরে মরতে?

এ হেন যখন মনের অবস্থাটি রাখালের, এ হেন মুহূর্তটি তার, স্প্রিং-আঁটা দরজায় ধাক্কা পড়েছে। দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার। এবং সেই দুটি আপাত-অর্থহীন ছোট্ট টক টক শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে রাখালের বিরক্তি, ক্লান্তি, ইত্যাদি। আর তার মনে হওয়া, সমস্ত কলকাতাটাই যেন আজ তার সঙ্গে দেখা করবে ব'লে পণ করেছে। আর কিছু নয়। এত ভাবাভাবি, কথা কাটাকাটি, প্রশ্ন আর পাল্টা প্রশ্ন, এসব শুধু এই বিশেষ মুহূর্তটির ভূমিকা দেওয়ার জন্যেই।

কিন্তু খামখা রাগ ক'রেই বা লাভটা কী, যখন যে-হতচ্ছাড়াই এসে থাকুক না কেন, ঠিক দরজায় বা ভুল দরজায়, তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে? ঘরের ভিতরে গুম হ'য়ে ব'সে থেকে উত্তর না দিয়ে কি তাকে ফেরানো যাবে, না ফেরানোটা উচিত হবে? হয়তো আবার কেউ এসেছে ফর্মের খবর চাইতে ও দু' মিনিটেই বিদেয় হবে। নাঃ, ঐ টোকা মারার নির্দেশটা তুলে ফেলাই ভালো। কই, তা' কি পেরেছে লোকের আসা ঠেকাতে? টোকা শোনার বিরক্তি, আর পরে আগন্তুকের আসার কারণে বিরক্তি, এ-দুটো বিরক্তি একসঙ্গে সহ্য করা কেন?

ঘড়ি দেখল, দুটো বাজতে পাঁচ। অবশ্য রাখালের ঘড়িতে-ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটাতে নয়, যেটা আপিসের সম্পত্তি এবং যেটা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিন মিনিট ফাস্ট বা ঠিক তিন মিনিট স্লো চলবেই। কিন্তু কোন্ সময়টা ফাস্ট আর কোন সময়টা স্লো? দুটো বাজতে পাঁচ—কে বলেছে? যদি বলি তিনটে বেজে চার, তাতেই বা কি এসে যায়? সময়ের আবার একটা-দুটো-তিনটে, তাকেও মানুষ ফাস্ট-স্লো করেছে! যাক গে, মরুক গে।

কিন্তু হ্যাঁ, উত্তর দিতে হবে। তাই, ধাক্কা পড়ার তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই, একটু অনাবশ্যক ভাবে ভারী গলায় রাখাল ব'লে উঠল:

'—আসুন।'

দুই ॥ লোকটা

যে-লোকটা ঢুকল, 'সদ্য বৃষ্টিধৌত' জানালার কাঁচের মত তার কপাল দিয়ে গাল দিয়ে তখনো ঘামের বিন্দু বিন্দু নদী ঝরছে। এবং হয়তো লোকটি মধ্যবয়সী, অন্তত এক তির্যক চোখের চাওয়ায় রাখালের তো তাই মনে হ'ল। আর কিছু ভালো ক'রে দেখবার বা লক্ষ্য করার মত তেমন কোনো প্রবৃত্তিও রাখালের তখন ছিল না। আপদ কতক্ষণে বিদেয় হবে, চিন্তাটা সেই দিকটিকেই যেন। হ্যাঁ, আর সেই চোখের চাওয়া লোকটির, কেমন একটি ঝাপসা দৃষ্টি, যেন ঘষা কাঁচ, যেন তাতে লুকোনো অনির্দেশ্য প্রশ্ন, আর ক্লান্তি, আর কী যেন এক প্রত্যাশার আভাস। ক্লান্তিটাই বড়, ও সবার আগে নজরে পড়বার মত। হয়তো বাইরের রোদ্দুরের কারণে, হয়তো বা সে-ক্লান্তি খানিকটা মানসিকও। কিন্তু এত ভাবার দরকারটা কী? একটা লোক বই তো নয়।

'মণ্টুবাবু আছেন কি?' আগন্তুকের প্রশ্ন।

যাক বাবা, অন্তত রাখালকে খুঁজতে আসে নি। 'আপনি কি মণি মুখার্জীকে খুঁজছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'উনি তো ছিলেন এই একটু আগেই। হয়তো কোথাও বেরিয়েছেন।'

'কখন আসবেন বলতে পারেন কি?'

'আজ্ঞে আমাকে তো কিছু ব'লে যান নি। তবে মনে হয় এখুনি এ[illegible]রণ বাইরে কোথাও গেলে আমাকে নিশ্চয়ই ব'লে

যেতেন। হয়তো পান কিনতে বেরিয়েছেন, কিম্বা বাথরুমে গেছেন হয়তো। উনি কি জানেন আপনি আসবেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি নিজেই আমাকে আসতে বলেছিলেন এই সময়ে।'

'তবে নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। একটু বসুন না।'

রাখাল হাত দিয়ে দেখাল অন্য টেবিলটির সামনের দুটি চেয়ারের দিকে। তার নিজের টেবিলে বসানোর কোনো দরকার নেই। অন্যের এক সাক্ষীগোপালকে সামনে বসিয়ে রেখে তার কী হবে ?

লোকটি ধীরে ধীরে গিয়ে একটি চেয়ার টেনে বসল দূরে, সহকর্মী অফিসারের টেবিলটির সামনে। রাখাল ব'সে উত্তরদিকে মুখ ক'রে, অর্থাৎ যে-দিকে বাইরের বারান্দা ও ঘরের দরজা। সহকর্মী সঙ্গীটির চেয়ার চেয়ে থাকে পশ্চিম দিকের দেয়ালে, যেখানে ওপরে মাঝামাঝি জায়গায় টাঙ্গানো আছে জহরলাল নেহরুর সহাস্য মুখচ্ছবি। অর্থাৎ রাখালের ডানদিকে পড়ে অন্য টেবিলটি, ও দুটি টেবিলের মধ্যে ব্যবধান গজ দেড়েকের। টেবিল দুটি ঘরে যে-ভাবে পাতা, তাতে একটি সমকোণের ভঙ্গী, শুধু মাঝখানে কেবল খানিকটা ফাঁকা।

কিন্তু কতটুকুই বা সেই ফাঁক ? হঠাৎ রাখালের মনে হ'ল যেন একটি মানুষের আত্মা, একক ও একাকী, জাগতিক সর্ব প্রয়াসের মধ্যে একটু ফাঁক চেয়ে মরছে, সে চাইছে অবকাশ, আরো একটু আকাশ, এক বৃহত্তর ব্যাপ্তি। চাইছে যেন নিশ্বাস নিতে পাবার ক্ষমতা, বুকটাকে যথাসম্ভব ফুলিয়ে। থাকবে না বাধা, থাকবে না কলুষের গন্ধ—থাকবে শুধু এক শান্ত, অনন্ত, প্রাণদাতা বায়ুর ঘ্রাণ দিকে দিগন্তে। পূর্ণতার সুরভিতে মাতাল এক শূন্যতা শুধু একজনের, একটি একক ও একাকী আত্মার, আনন্দের ও অনুভবের জন্যে। সেই একক উপস্থিতিটি ব্যাহত হ'ল, যে-মুহূর্তে আরো একটি লোক এসে হাজির। দ্বিতীয় লোকটি এল কোন অজ্ঞাত ও ভিন্নতর শূন্য হ'তে, এল কেনই বা ? তবু শুধু কি আরো একটি লোক ? কত কোটি কোটি লোক, কত অজস্র

প্রাণী, কীট, গাছ, ধুলো, এক অপরিমেয় জড়ের কী গুরুভার মূঢ়তা—সব এসে ভিড় করেছে সেই একটি মানুষের প্রার্থিত জগতজোড়া ঘরে। এই সবের কথা বলা অথবা নীরবতা, তাদের চলাফেরা বা ব'সে থাকা, তাদের গ্লানি বা আনন্দ, তার চাপে চেপটে যাওয়া মুহূর্তের রূপ। শান্তি বন্দী এক অপ্রকাশ্য বেদনার কারাগারে, তার মাথার উপর জল্লাদের খাঁড়া উদ্যত হ'য়েই রয়েছে।

অবশ্য, বৃহৎ বাহ্য জগতটা এত অপরিসীম, এত অচিন্তনীয়ভাবে জটিল ও এত স্বাধীনভাবে স্বপ্রকাশ যে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া কোনো একটি ব্যক্তির বা কয়েকজন ব্যক্তির বা অজস্র ব্যক্তির হবে মূঢ়তারই সামিল। এবং সেরকম কোনো অভিপ্রেতও রাখালের নেই। তার এই সামান্য চল্লিশ বছর ধ'রে জীবন ধারণের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে, যে জন্য সকলের মতই সেও এক নামহীন সংজ্ঞাহীন মানুষ এই পৃথিবীর বুকে, যুদ্ধরত শুধু বাঁচবার ব্রত ও অভীপ্সা নিয়ে, শুধু দেখতে চেয়ে আরো অনেক সূর্যাস্ত, শুধু ক্ষণের ক্ষণজীবী আনন্দ খুঁজে কখনো লিখে বা প'ড়ে, কখনো কিছু না ক'রে, কখনো সিনেমায় বা খেলার মাঠে বা চায়ের আড্ডায়, কখনো বা স্ত্রীর আলিঙ্গনে, আবার কখনো বা তারই মত নামহীন সংজ্ঞাহীন একটি মুহূর্তের নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়। না, বিশ হাত দূরেরও যে-জগতটা বাইরের—যার অনিবার্য ও অনির্দেশ্য আভাস পাওয়া যাচ্ছে আপিসে ব'সেই, জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে—তা' তার বোধের বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার বাইরে। জানে তা রাখাল।

কিন্তু এই ঘরটা? কতটা দৈর্ঘ্য হবে এর—বিশ ফুট? হয়তো আরো কম। আর প্রস্থে হবে বড় জোর চোদ্দ ফুট। এই ঘরটার খুঁটিনাটি সে জানে অল্পবিস্তর, ও সেই খুঁটিনাটিদের নিয়ন্ত্রণ করারও ক্ষমতা তার খানিকটা আছে। যেমন, সে জানে টেবিলের পায়াটা ভাঙলে সেটাকে সারাবার বন্দোবস্ত সে করতে পারে, বা আরেকটা চেয়ার দরকার পড়লে সে সেটা আনতে পারে, ইত্যাদি। দিনে ঘণ্টা

সাত্তেক ধ'রে এই ছোট ঘরটার কোণটুকু তো অন্তুত তার অল্পবিস্তর আয়ত্তের মধ্যে—এখানে যদি সে এক মুহূর্তের শান্তি চায়, সেটা কি তার পাওয়া উচিত নয়, সে-শান্তি কি তার প্রাপ্য নয়, তার অর্জিত নয়?

নয়—ও তা' বোঝাই যাচ্ছে। সকাল থেকে আজকের একটার পর একটা ঘটনা শুধু সেই সত্যটিকেই প্রমাণ করতে উদ্যত। কিন্তু সমস্ত মানুষ না ভাই, তারা না জগতে এসেছে পরস্পরকে ভালো-বাসবার অভীপ্সা নিয়ে? হয়েছে কী?—আরেকটি লোক এসেছে ঘরে। সে তোমায় বিরক্ত করছে না, তোমার কান ধরে টানছে না, এমন কি তোমার দিকে ড্যাব ড্যাব ক'রে সে তাকিয়েও নেই। সে আছে অন্য দিকে মুখ ক'রে, টুঁ শব্দটি করছে না, তুমি কী ভাবছ তা' সে জানতে চায় না, সে কী ভাবছে তা' তোমায় জানাতে চায় না। কী হিসেবে তার উপস্থিতি তোমার বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে? আর সে তোমার কাছেও আসে নি, তোমাকে সে চেনেই না, তোমাকে চেনবার জন্যে তার তেমন কোনো মাথাব্যথা আছে ব'লেও মনে হয় না। সে এসেছে তার নিজের ধান্দায়, নিজের কাজে বা অকাজে, এসেছে আরেকটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে। অতএব?

তা' ছাড়া, মানুষে যদি মানুষের সঙ্গ এইভাবে অপছন্দ করতে আরম্ভ করে তো এ-জগতে কে কোথায় টিকে থাকতে পারবে? তার নিজেরই স্বার্থে মানুষের কখনো চরম স্বার্থপর হ'তে নেই। তাই তো ইতিহাস যুগে যুগে তাঁদেরই মহাপুরুষ ব'লে নমস্কার ক'রে এসেছে যাঁরা বলেছেন সেই প্রেমের বাণীটি, সেই ঐক্যের বাণী, নিজের কারাগার হ'তে বেরিয়ে এসে অন্যকে আলিঙ্গন করার সেই কথাটি। আলিঙ্গন করতে না চাও তো ক'রো না, এমন কি ভালোবাসতেও যদি না পারো তো নাই পারলে, অন্তত এইভাবে ঘৃণা ক'রো না লোকটার অসহায় উপস্থিতি তোমার ঘরে। পাকে-চক্রে ও এসে হাজির হয়েছে তোমার ঘরে, না জেনে যে এটা তোমার ঘর। এবং এটা যে শুধু তোমার একলারই ঘর, তাও নয়। এখানে তোমারই মত আরো একটি অফিসার

বসে। সেই অফিসারটির সঙ্গে এই লোকটি দেখা করতে এসেছে। অতএব ?

নাঃ, ঘুরে ফিরে আবার ঐ লোকটিকে নিয়ে পড়া। কী দরকার রে বাবা ? মরুক গে। একটু প্রশান্তির ভাব আনা যাক মুখে। ভুরু কুঁচকে লাভ নেই। রাখালের খেদ নেই। সে নয় কূপ-মণ্ডুক, সে এই জগতের মানুষ, এক সামাজিক মানুষ। তা' ছাড়া, মানুষের প্রতি কোনো ঘৃণা তার নেই সত্যিই। কখনো কখনো একটু একেবারে একলা থাকতে চাওয়া, তা অন্য জিনিস। তার মানেও এই নয় যে সে অন্য কারুর সঙ্গ সহ্য করতে পারে না। তবে সে অনর্থক কেন এরকম ভাব দেখাবে, যেন ছু' হাতে ছুটো করাত ঝুলিয়ে সে ব'সে আছে, ব'লে, 'আমার কাছে এসো না, আমার দিকে তাকিয়ো না, আমার সঙ্গে কথা ব'লো না ?' শান্তি, শান্তি, শান্তি।

হঠাৎ রাখাল যেন কেমন একটু অন্য ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করল। তার মনে হ'ল, লোকটাকে এইভাবে চুপচাপ বসিয়ে রাখা হয়তো খুব ভদ্রোচিত নয়। হয়তো খবরের কাগজ, কিম্বা কোনো পত্রিকা, কিম্বা ঐ ধরনের কিছু একটা পড়তে দেওয়া উচিত। কিন্তু কী পড়তে দেওয়া যায় ? নিজের টেবিলটার চারপাশে তাকিয়ে দেখে, দেবার মত কিছু নেই। একটা খবরের কাগজও না। রাখাল আপিসে কাগজ পড়ে না। আপিসে বেরোনোর আগে বাড়িতেই প'ড়ে আসে। এমন অনেকে আছে, যারা তাদের কাগজটি নিয়ে আসবেই আপিসে। ট্রামে উঠবে সেটিকে কোলে ক'রে—ডান হাতটি ট্রামের হাতল ধরতে উদ্যত, বাঁ হাতে ছাতা ও পুঁটলি। ও মুখে পান চিবোনো। না, অত সয় না রাখালের। এমনিতেই তো ট্রাম-বাসে ওঠার ব্যাপারটা আজকাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সার্কাসে ভেলকিবাজী দেখানোর মত, ঝাড়া-হাত-পা হ'য়ে কোনো রকমে উঠতে পারাটাই যেন যাত্রীদের একটা বিস্ময়কর ক্ষমতার প্রমাণ। তার ওপর অনর্থক ঝক্কি বাড়িয়ে লাভ কী ? তা' ছাড়া, খবরের কাগজের কীটও নয়

রাখাল। তার প্রতিটি লাইন র'য়ে স'য়ে পড়ার মত ধৈর্যও তার নেই। যেন পান চিবোনো। তা' যারা পান চিবোয়, তারাই পারে।

কিন্তু লোকটাকে দিতে তো হয় কিছু। যাক গে। কিছুই যে নেই, দেবে কী? আর, সৌজন্যের এতটা বাড়াবাড়ি করার দরকারটাই বা কী? হয়তো লোকটা বেশই আছে, হয়তো সে পড়তে চায়ও না কিছু। তবে কি একটা কথাবার্তা আরম্ভ করা উচিত? একটা কোনো প্রসঙ্গের উত্থাপন, একটা কথোপকথন? এই যেমন, 'উঃ, কী গরমই পড়েছে।' অথবা, 'কলকাতা সহরটা যা হ'য়েছে।' দরকারটা কী রে বাবা? হয়তো লোকটাও তারি মত শান্তি চায়। কিন্তু দুজনের এইভাবে ব'সে থাকাটাও কেমন একটু অস্বস্তিকর, যেন একটু আড়ষ্ট-আড়ষ্ট ভাব! হঠাৎ বাইরে যদি একটা বোমা পড়ে, কিম্বা কোনো একটা কারণে কোনো প্রচণ্ড শব্দ হয় তো জানলা খুলে তাকানো যায়, অস্বস্তির ভাবটা কাটে। তবে এই অস্বস্তির ভাবটা নিয়েও হয়তো রাখাল বেশ একটু বাড়াবাড়ি করছে, হয়তো এই রকম অসহ্য বোধ করার মত তেমন কিছুই হয় নি। না, মণ্টুবাবু এখুনি এসে পড়বে, নিশ্চয়ই এসে পড়বে বিশেষ ক'রে লোকটিকে সে যখন নিজেই আসতে বলেছে এই সময়। এবং মণ্টুবাবু এলেই ল্যাটা চুকে যাবে।

রাখাল কিন্তু স্বার্থপর হ'তে চায়নি, সে ঘৃণা করতে চায়নি লোকটির উপস্থিতি। বরং সে চেয়েছে লোকটিকে ভালো ক'রে বসাতে, তাকে কিছু পড়তে দিতে। পড়তে দেবার মত কিছু খুঁজে পেল না, সে-দোষ তো তার নয়। মনে মনে রাখাল এই ধরনের যুক্তি আরম্ভ করল। ও মুহূর্তের মধ্যে তার অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেল। নিজের কাছে নিজেকে আর দোষী মনে হ'ল না। আর কী দোষই বা সে করেছে লোকটি ঘরে ঢোকা পর্যন্ত? অতএব নিশ্চিন্তে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যাক।

হঠাৎ সত্যি বাইরে থেকে একটা চীৎকার শোনা গেল। এবং মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শব্দ: ক্যাঁক। নিশ্চয়ই কোনো মোটর গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ প্রাণপণে ব্রেক কষেছে। একটা কিছু

হয়েছে। দেখা যাক তো। জানলাটা রাস্তার ওপরেই—খুলে গলা বাড়িয়ে দেখা যাক। জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যখন শব্দটা এত জোরে কানে এসে পৌঁছেছে, নিশ্চয়ই বড় রকমের একটা কিছু হয়েছে। কেউ না মরলেই হল। তবু রাখাল একটু কেমন ধরনের হাঁপ ছাড়ার ভাব অনুভব না ক'রে পারল না—যাক, এভাবে ব'সে থাকার থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল অন্তত একটুক্ষণের জন্যে।

'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

লোকটি যেন চমকে উঠল। যেন কিছুই শোনেনি।

'আজ্ঞে ?' গলার স্বরটা যেন বন্ধ কলসীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার মত।

'বাইরে কিছু হ'ল বলে মনে হচ্ছে। একটা শব্দ শুনলেন না ?'

'কিসের শব্দ ?'

হরিবোল। লোকটা কালা না কি ? কিন্তু তাই বা কী ক'রে সম্ভব ? রাখালের কথা তো সব দিব্যি শুনতে পাচ্ছে। তবে কি অন্যমনস্ক ? কিন্তু এত অন্যমনস্ক হওয়া যায় কী ক'রে ?

'একটা এ্যাক্সিডেন্ট-ট্যাক্সিডেন্ট কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। হঠাৎ মনে হ'ল একটা গাড়ি যেন প্রাণপণে ব্রেক কষল। আর তার আগেই একটা লোক চেঁচিয়ে উঠল।'

'তা আর আশ্চর্য কী। নিত্যই হচ্ছে।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, লোকটার কোনো কথাবার্তা চালানোর মন নেই। কথাবার্তা চালানোর কোনো ফিকিরই খুঁজছে না। তবে রাখালই বা কেন খুঁজবে ? অতএব অনর্থক কেনই বা জানলা খুলে বাইরে তাকানো ? যা' হয়েছে, হয়েছে—যদি গাড়ি চাপা প'ড়ে কেউ ম'রে থাকে, মরেছে। তাতে রাখালের কী ? এবং তাতে রাখাল কী-ই বা করতে পারে ?

এই বাড়াবাড়ির দরকারটা কী রাখালের ? একটা লোক ঘরে এসেছে, তাতে অস্বস্তি বোধ করার কারণ তো নেই। অতএব ? না,

কথাটা হচ্ছে, লোকটা হয়তো ভাবতে পারে এ-আপিসে একলা ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে চুপ চাপ ব'সে থেকেই বুঝি লোকে মাসে মাসে মাইনে নেয়, অন্তত রাখাল তা করে। অনর্থক এমন একটা ধারণা একটা বাইরের লোককে কেন সে দিতে যাবে? বিশেষ ক'রে সে-ধরনের কোনো ধারণা যখন এত সম্পূর্ণভাবে অমূলক, এত অসত্য, এই রাখাল সম্বন্ধেও। কাজ যখন সে করে, যখন তাকে দৌড়োতে হয় এ-এলাকা থেকে ও-এলাকায়, অথবা যখন হিসেবের পাতায় অঙ্ক কষতে কষতে চোখে টান ধ'রে যায়, তখন একবার এসে দেখে যাক না এই লোকটাই। অবশ্য তাকে কাজ দেখানো এখনও চলে, এই মুহূর্তেই চলে। ধরা যাক না একটা ফাইল, যে-কোনো ফাইল। লোকটা ব'সে থাকতে থাকতেই শেষ ক'রে ফেলা যাক না সামনের ট্রেটা, যার গায়ে বড় বড় অক্ষরে ধ্যাবড়ানো কালিতে লেখা Most Immediate.

Immediate না হাতি, সবই immediate, সবই urgent, অথচ সবই প'ড়ে থাকতে পারে দিনের পর দিন। থাকুক না পড়ে। অন্তত আজ তো রাখাল ও-সবের কিছুতে হাত দিচ্ছে না, কিছুতেই না। মন নেই, ভালো লাগছে না, যেন চুপ ক'রে ব'সে থাকতেও ভালো লাগছে না। না, আজ আর ফাইল নিয়ে পড়বে না রাখাল, তা' লোকটা যতক্ষণই ব'সে থাকে, থাকুক, যা খুশী মনে করে, করুক।

তা' ছাড়া, লোকটা কিছু মনে করছেই না। রাখালের প্রতি, বা অন্য কোনো কিছুর প্রতি, তার তেমন মনই নেই। আর তা তো এখুনি দেখাই গেল। এত বড় একটা শব্দ হ'ল, শুনতেই পেল না? কী ভাবছে রে বাবা? কন্যাদায়? টাকা চাইতে এসেছে? কিন্তু তাই বা কী ক'রে হয়? কত বয়স হ'তে পারে লোকটার —চল্লিশ? হ্যাঁ, হ'তেও পারে। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ কিছুতেই নয়। ধরা যাক চল্লিশ, রাখালেরই মত। ধরা যাক লোকটা বিয়ে করেছে বিশ বছর বয়সে। অত তাড়াতাড়ি বিয়ে আজও বহু লোকে করে। ধরা যাক একটি মেয়ে আছে, যার আজ বয়স আঠার উনিশ।

হ্যাঁ, হ'লে কন্যাদায় হ'তে পারে, খুবই হ'তে পারে। কিন্তু মণ্টুর কাছে এসেছে কেন? হয়তো মণ্টুরই জানা পাত্র। কী রকম সে-মেয়েটি হবে এমন একটি লোকের? বলা শক্ত। তবে সে সুন্দরী হ'তেও পারে, আজকে বাপকে দেখতে যেমনই হোক না। একটা বয়স আসে যখন সবাই-ই সুন্দর দেখতে হয়, বিশেষত মেয়েরা। কী করুণা সেই সব মেয়েদের চোখে, কী শান্ত স্তিমিত জ্যোতি তাতে, যেন পাড়াগেঁয়ে দীঘির জল আসন্ন সন্ধ্যায়। দূর ছাই, এসব আকাশ পাতাল ভেবে কী হবে? হয়তো লোকটা আসলে চাকরীর সন্ধানে এসেছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই।

'বেরোনোর আগে কি আপনাকে কিছুই ব'লে যান নি?'

এবার রাখালেরই চমকে যাবার পালা। 'আজ্ঞে?'

'বলছিলাম মণ্টুবাবুর কথা। আপনাকে কি কিছুই ব'লে যান নি?'

'কই না।'

'উনি কি এই সময় রোজ একটু বেরোন না কি?'

ভদ্রলোকের হাবেভাবে বেশ একটি ভদ্রতা আছে। রাখালের তো লোকটিকে এক ধরনের ভালো লাগতেই আরম্ভ করছে। অন্তত আর তেমন খারাপ লাগছে না, লোকটার উপস্থিতি আর তেমন ব্যতিব্যস্তকর ঠেকছে না। প্রশ্নগুলির মধ্যেও অর্থাৎ প্রশ্নগুলি করার ধরনের মধ্যে, একটি ভদ্রতা নিহিত আছে। অনেকে আছে, তেড়ে-মুড়ে ঘড়ে ঢুকবে, আর প্রশ্ন করবে এমনভাবে যেন তারা আক্রমণ করতে উদ্যত, যেন তাদের প্রতি ঘোর একটা অন্যায় করা হয়েছে, এখন কৈফিয়ৎ চায়। তেমন নয়। এবং একটু ভালো ক'রে তাকিয়ে থাকলে লোকটিকে দেখতেও তেমন কিছু কুশ্রী ব'লে মনে হয় না। চুলে একটু উস্কোখুস্কোতা, এই গরমে এখানে আসার ক্লান্তি, জামা-কাপড়ের অতি-সাধারণত্ব, তা অন্য ব্যাপার, ও তা' কলকাতায় কার-ই বা নয়? এ-সহরে কে-ই বা ফিট-ফাট, কার মুখে নেই ক্লান্তির সেই অবিসংবাদিত অনিবার্য ছাপ?

'আজ্ঞে না, সেরকম কোনো নিয়ম নেই। তবে মাঝে মাঝে আমরা সকলেই একটু বেরিয়ে থাকি।'

'কিন্তু সেরকম বেরোনোর তো এতক্ষণ লাগা উচিত নয়।'

'হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। এদিকে আমাকেও কিছু ব'লে গেলেন না।'

'ভারী আশ্চর্য তো।'

'আমার মনে হয় এসে পড়বেনই। অবশ্য এক যদি কোথাও আটকা না প'ড়ে গিয়ে থাকেন। জানি না কাজে বেরিয়েছেন কিনা। স্বভাবত কাজে বেরোলে আমাকে ব'লে যান। তবে তার ব্যতিক্রমও হ'তে পারে। আজ হয়তো হঠাৎ কিছু ঘটেছে, তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছেন বেরোনোর আগে কিছু ব'লে যেতে।'

'মস্কিল হ'ল তো।'

'আপনি এক কাজ করুন না। বেলা চারটে নাগাদ আসুন না। তখন থাকবেনই। অবশ্য ততক্ষণ যদি এখানেই অপেক্ষা না করতে পারেন।'

ব'লেই রাখালের মনে হ'ল : এই রে, হয়তো লোকটা সত্যিই চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যাক গে, কী আর হবে—আজকের দিনটা নষ্ট তো এমনিতেই হয়েছে। না হয় আরো খানিকক্ষণ নষ্ট হবে।

'ওরে বাবা, চারটে!'

তারপর দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্ল : 'এখন তো সবে দুটো বাজতে তিন দেখছি। তার মানে এখনো অন্তত দু' ঘণ্টা।'

'আজ্ঞে, ও-ঘড়িটার দিকে তাকাবেন না। ওটা পাঁচ মিনিট স্লো।'

'পাঁচ মিনিটে আর কী আসে যায় বলুন। হরে দরে ঐ দু'ঘণ্টাই। ততক্ষণ অপেক্ষা করা তো মুস্কিল হবে।'

'তা হ'লে চারটে নাগাদ আবার ফিরে আসুন না?'

'ওরে বাবা, তা' একেবারেই অসম্ভব।'

শুনেই রাখালের মনে হ'ল, তা হ'লে চাকরীর কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। তা যদি হ'ত, তবে চাকরী পাবার আশায় ঘণ্টা দুয়েক

অপেক্ষা করা বা পরে ফের ফিরে আসা 'একেবারেই অসম্ভব' হ'ত না। এবং সে-ক্ষেত্রে অসহায়ের মত পিতৃদেবকে স্মরণ করারও প্রয়োজন ছিল না। চাকরী এমন একটা সাত-রাজার-ধন-এক-মানিক এই কলকাতা সহরে। তার জন্যে লোকে কী না করতে পারে? দুটি ঘণ্টা, ষাট দু'গুণে একশো বিশ মিনিট (এবং কত সেকেন্‌ড যেন? যাক গে, মরুক গে), অপেক্ষা করতে পারে না? না, তা হ'লে চাকরী নয়।

আবার লোকটি: 'আমার ভয়, হয়তো ভুলেই গেলেন নাকি আমার আসার কথাটা।'

'পাকাপাকি কোনো কথা দিয়েছিলেন কি আপনাকে?'

'কী আশ্চর্য, বললামই তো।'

'সত্যিই আশ্চর্য তো। তবে কথা যখন দিয়েছেন, নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। দশবারো মিনিট ওদিক হ'য়েই থাকে। কতক্ষণই বা আপনি এসেছেন?'

'আজ্ঞে, কথা তো তা' নয়—আমাকে যে বললেন ঘরেই থাকবেন।'

'ঠিক কী বলেছিলেন আপনার মনে আছে?'

'এই দেখুন। আমাকে বললেন দুটো নাগাদ আসতে। আজ, সোমবার। আমি জানতে চেয়েছিলাম দুটোর আগে না পরে, না ঠিক দুটোয়—কারণ আমার হাতে সময় নেই। বলেছিলেন, একটু আগে বা পরে বা ঠিক দুটোয়, যখন খুশী আসুন। এ তো আমার খুশীর কথা নয়, তাই বলেছিলাম, আপনার সময় মতই আসব, একটা সময় দিন না। তখন বলেছিলেন, ঐ দুটো নাগাদই আসুন, ও-সময়টা আমি সাধারণত ঘরেই থাকি, এবং সেদিন নিশ্চয়ই থাকব, আপনার জন্যে তৈরি হ'য়েই থাকব।'

'হুঁ, তবে এই এলেন ব'লে।'

হঠাৎ রাখালের কী মনে হ'ল বলল: 'আপনি কি এমন কোনো কাজে এসেছেন যাতে আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'অর্থাৎ ?'

'আপনি কি কোনো খবর জানতে চান বা কোনো সাহায্য চান সরকারী কোনো ব্যাপারে যাতে হয়তো মণিবাবুর অনুপস্থিতিতে আমি আপনাকে সে-খবরটা দিতে পারি ?'

'আজ্ঞে না, বহু ধন্যবাদ। আমি এসেছি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপারে।'

অতএব ? আর কী করা যেতে পারে ? ব'সে থাকতে হয় ব'সে থাকো, ফিরে আসতে হয় ফিরে এসো। যতদূর রাখালের ক্ষমতার সীমার মধ্যে, তা' সে করেছে। লোকটিকে সম্ভব মত সাহায্য করার প্রস্তাবও সে করেছে, যদিও সে-প্রস্তাবটা আগেই করা উচিত ছিল। আসলে, কথাটা তার তেমন মনে আসে নি, আর আজ তার রূপটা ঠিক দক্ষ অফিসারের রূপ নয়, অর্থাৎ আপিসে অন্যদিনে যে-স্বাভাবিক রূপে সে থাকে, সে-রূপটা কেমন যেন মুছে গেছে আছ। লোকটি যদি সত্যিই কোনো সরকারী কাজে আসত তো কী ভাবত। কীই বা ভাবত ? এসেই তো খালি মণ্টুবাবু-মণ্টুবাবু করছে, আর রাখাল তাকে সাহায্য করার প্রস্তাবও পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তা ছাড়া, সরকারী কাজেই যদি আসত তো তার বক্তব্য অনেকক্ষণ আগেই জানাত, আপনা থেকেই। না, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত ও সেটা মণ্টুর সঙ্গে।

তবু সব সত্ত্বেও বলতেই হবে, লোকটি ভদ্র। ঐ যে 'আজ্ঞে না, বহু ধন্যবাদ,' এসবের একটা দাম আছে। ক'টা লোক সে-দাম দিতে জানে ? এ-আপিসে শুধু তো রাজ্যের যত অভদ্র নিয়েই কারবার, কিম্বা যত মেকী ভদ্র, ভদ্র সাজে শুধু স্বার্থের খাতিরে। তাই ক্বচিৎ কদাচিত একটা সত্যিকারের ভদ্রলোক দেখলে বেশ একটু মন্দ লাগে না, এই আর কি।

'আপনার খামাখা সময় নষ্ট করছি। আমি অনায়াসেই বাইরে অপেক্ষা করতে পারি।'

'সে কি কথা। না-না-না-না-না, আমার কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। আপনি দয়া ক'রে বসুন।'

দেখলে তো, এই ধরনের ভদ্রতাটি এ-আপিসে বছরে ঠিক ক'বার দেখা যায়? হাত গুণে বলা যায়। আর রাখালের সময় নষ্ট করার কথা? তা' যা' হবার, তা' তো হয়েছেই। তা' নিয়ে রাখাল নিজেই আপশোষ করা ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেছে—লোকটিকে যে তার এমন কিছু গদগদ ভালো লেগেছে ব'লে নয়, সেরকম ভালো মন্দ লাগার প্রশ্ন উঠতেই বা সে দেবে কেন? হাজার হলেও, সম্পর্কটা কী? একটা আগন্তুক এসেছে আরেক জনের কাছে, তার কাছে তো। তবে? সেই আরেকজনটি রাখালের (এবং দেখে-শুনে মনে হচ্ছে আগন্তুকটিরও নিশ্চয়ই) মহান দুর্ভাগ্যবশত অনুপস্থিত ব'লেই দুটি লোকের মধ্যে যেন জোরজবরদস্তি ক'রে একটা পাঁচ মিনিটের সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। সে-সম্পর্কের জন্যে উভয়ের কেউই আগে হ'তে প্রস্তুত ছিল না, সে-রকম কোনো সম্পর্ক তাদের কেউই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনাও করে নি। এবং সে সম্পর্কের ঘটনাটা এখন অবিসংবাদিতভাবে ঘ'টে গেছে ব'লেই যে তা আগামী অনন্তকাল ধ'রে ঘটতে থাকবে, এমন ভাবনা বা ভয় করতে চাওয়া হবে নিছক এক পরিপূর্ণভাবে অনাবশ্যক দুঃখবাদিতার রূপান্তর। আসলে, এই অবিসংবাদিতভাবে ঘ'টে-যাওয়া সম্পর্কের ঘটনাটার জন্যে দায়ী রাখালও নয়, লোকটিও নয়। দায়ী যদি কেউ থাকে তো সে মণ্টুবাবু, বা সেই মণ্টুবাবুর অনুপস্থিতি। সুতরাং, ভালোলাগা বা মন্দলাগার প্রশ্ন উঠতে যাবে কেন? এটা একটা ঘটনা যা ঘ'টে গেছে, যা তোমাকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলের মত। এখন তুমি তাকে লুফে নাও, বা তোমার হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাতে সেটা তোমার ঘাড়ে এসে পড়ুক, একই কথা। যাই কর না কেন, সে-ঘটনাটি তোমাকে স্পর্শ করবেই, সেই ছুঁড়ে-দেওয়া বস্তুটির সঙ্গে তোমার একটি অন্তত ক্ষণিকের সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠবেই।

আসলে এই ধরনের ঘটনাকেই হয়তো দুর্ঘটনা বলে—দুর্ঘটনা, কারণ ভালো বা খারাপ ঘটনা ব'লে নয়, কথাটা হ'ল যে এই ধরনের ঘটনার ওপর তোমার কোন হাত নেই।

না, লোকটিকে ভালো লেগেছে বা মন্দ লেগেছে, সে-প্রশ্ন অবান্তর, ও তার কোনো সত্যাসত্য নেই। যদি তার সময় নষ্ট হওয়া নিয়ে রাখাল নিজেই এমন আপশোষ করা ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেছে তো তার কারণটি হ'ল এই যে আজকের একটার পর একটা ঘটনার (বা দুর্ঘটনার) এই যে অবিশ্রান্ত অবিচ্ছিন্ন স্রোত তাতে খানিকটা অসহায়ের ভঙ্গীতে অবশেষে গা এলিয়ে দেওয়াই একমাত্র শ্রেয় পন্থা বলে সে মেনে নিচ্ছে। তবে এই লোকটি ভদ্র, সন্দেহ নেই। এবং হয়তো সে রাখালের সময় নষ্ট করছে এরকম চিন্তা যেহেতু তার মনের মধ্যে এসেছে, তার কাছে রাখাল কৃতজ্ঞ।

ঐতো, ওটা কি উঁকি মারছে যেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এ ভুল হবার নয়। বোম্বাই-এর সিনেমা জগত সম্পর্কীয় একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা। মণ্টুবাবুর টেবিলের এক কোণার ট্রে হ'তে প্রচ্ছদপটটার একটা দুমড়ানো অংশ বেরিয়ে আছে। সহজে নজরে পড়া শক্ত, কারণ তার ওপর এদিক ওদিক দুয়েকটা ফাইল চিত হয়ে শুয়ে আছে, কে জানে কতদিনের ধুলো সঞ্চয় ক'রে। হ্যাঃ, কী যে রুচি! রাখাল তো কোনোদিন ওধরনের পত্রিকা স্পর্শ পর্যন্ত করতে চাইবে না। তবে মণ্টুর কথা আলাদা। পয়সা খরচ ক'রে কিনবে এরকম জিনিস, তাকে লুকিয়ে রাখবে যত্নের সঙ্গে অনাবশ্যক ফাইলের তলায়, যাতে ফুরসত্ মতো পড়া যায়, বা ছবি দেখা যায়। কী রুচি! সত্যি, গা ঘিন ঘিন করে। এবং মণ্টুবাবুকে দেখেছেও রাখাল সময়ে-অসময়ে এধরনের জিনিস পড়তে—আপত্তি কখনো করে নি। কেনইবা করবে? যার যেমন রুচি।

বাঘ যেমন ক'রে তড়াক ক'রে লাফ মারে নিশ্চিত শিকারের ওপর, তার চোখে জ্বলে প্রতিজ্ঞা ও তৃপ্তি, রাখালও উঠল চেয়ার

ছেড়ে, হন হন ক'রে এগিয়ে গিয়ে টেনে বার করল পত্রিকাটিকে। বহু পুরানো সংখ্যা, প্রচ্ছদটা এখনো কোনো রকমে এক হ'য়ে লেগে আছে দেহের সঙ্গে—তবে সেটি ইতিমধ্যেই বেশ নড়বড় করছে, ও যত্নের সঙ্গে না ধরলে যেন এই মুহূর্তেই ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। এবং পরের জিনিস, ও রাখালের মতে যত বাজে জিনিসই হোক না কেন, তা পরের আদরের জিনিস। অতএব যত্ন ক'রে ধরাই ভালো। বেরিয়ে থাকা ত্নমড়ানো অংশটি ধূলায় ধূসর, এক পাংশু সবুজ প্রচ্ছদের ছবিটি একটি ঘাঘরা-পরা মেয়ে, মাথায় কলসী। ত্নটি হাত উপর দিকে তোলা, কলসীর কানা ধ'রে— বুকের ঔদ্ধত্যটি যেন আরো পরিস্ফুট করার জন্যেই। চোখে এক ধরনের অতি সস্তা হাসি, এক অতি সস্তা আহ্বানের ভঙ্গীতে। রাম রাম।

'এই নিন। আপনি ততক্ষণ একটু চোখ বোলাতে পারেন।'

'ওঃ।'

'আর বিশেষ কিছু পেলাম না আপনাকে দেবার মতো। আমার আবার কিছুই থাকে না।'

'না, তা' ঠিক আছে। কিন্তু বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে না?'

'আমি কী করি বলুন। বল্লামই তো, হয় ফিরে আসুন, নয় অপেক্ষা করুন। যা আপনার খুশী।'

'না, আপনি আর কী করবেন। দেখি, আরো একটুখানি।'

ত্যাখো বাবা, সব ত্যাখো, যতক্ষণ যা খুশী তোমার। আচ্ছা ঝামেলা রে বাবা।

রাখাল ফিরে এল নিজের চেয়ারে। ঘড়ি দেখল, ত্নটো বেজে পাঁচ। সত্যি, লোকটাকে এই ভাবে আসতে বলাই বা কেন যদি তুই জানতিস যে তোকে বেরোতে হবে? একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই। অন্তত বেরোনের আগে তো ব'লে যেতেও পারতিস কোথায় যাচ্ছিস, কখন ফিরবি, ইত্যাদি? এখন লোকটাকে নিয়ে করবে কী রাখল? যেতে বললে যায় না, অপেক্ষা করতে বললেও অসন্তোষের ভাব দেখায়।

হঠাৎ রাখালের মনে হ'ল মন্টুবাবুর কিছু হয় নি তো? কিছুক্ষণ আগে একটা শব্দ হয়েছিল, নিশ্চই একটা এ্যাক্সিডেন্ট-ট্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোথাও। হয়তো মন্টু……। না, না, তা হ'তেই পারে না। তা' হলে একটা কোনো খবর পৌঁছোতই এতক্ষণে। ঘটনাটা ঘটেছে কাছেই—আর এত লোক এখানে, এত পিওন-টিওন। কেউ জানবে না? কিন্তু কতক্ষণ আগেই বা শব্দটা হয়েছে? বলা যায় না, হয়তো সত্যিই মন্টুবাবু……। হয়তো এখনো লোক জ'মে আছে। সর্বনাশ। কালই সন্ধ্যায় তো রাখাল গিয়েছিল ওদের বাড়িতে, ওর ছোট ছেলেটির জন্মদিনে। পিন্টুকে নিয়ে। পিন্টু দশে পা দিলেও রাখালের তো অন্য কোন সন্তান নেই, ঐ একটিই মেয়ে, তাই পিন্টুরই নিমন্ত্রণ ছিল। এবং ওরা দুজনে কত খেলা করল, ও আরো পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়েও এসেছিল। জন্মদিন-টন্মদিন আর আজকাল কে তত পালন করতে পারে—সুষমার জীবন, উৎসবের জীবন হারিয়ে গেছে, হয়তো চিরকালের জন্যেই। এক ঐ যা বিয়েটা এখনো আছে, একটু সানাই-টানাই, খাওয়া-দাওয়া, সামিয়ানা। কিন্তু তা-ই বা আর থাকবে কতদিন, কে জানে। তবে ছেলেটির পাঁচ বছর পূর্ণ হ'ল, তাই মন্টুর স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল অন্তত একবার একটু কিছু আয়োজন করতে। ওদের তো আবার বড় সাধের ছেলে ওটি, ঐ একটিমাত্র সন্তান ওদেরও। হঠাৎ মন্টুর স্ত্রীর মুখখানা চোখে ভেসে উঠল। বালাই ষাট, এসব কী ভাবছে সে? হ'তেই পারে না।

কিন্তু দুর্ঘটনা যখন ঘটে, তা যে ঘটে ঠিক এইভাবেই, একেবারে অজ্ঞাতে, অপ্রত্যাশিত ভাবে। তার বাবা যখন গাড়ি চাপা পড়েন, কেউ কি আগে থেকে ভাবতেও পেরেছিল এমত একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটা সম্ভব? ইস্কুল থেকে ফিরছিল সেদিন রাখাল—কিছু জানে না, কিছু শোনে নি। বাড়ির দরজায় দেখে মা পাগলের মত মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হ'য়ে আছে। উঃ, কতদিন আগেকার কথা—তবু ভাবলে গা এখনো শিউরে উঠে।

যদি এমনি ক'রেই তার কিছু একদিন হয় তো পিণ্টু, প্রতিমা···। উঃ।

তবে ছুটে বাইরে গিয়ে কী দেখবে সে, কী হয়েছে? হাজার হলেও, তার সহকর্মী তো, ও তার বন্ধুও। যদি সত্যিই কিছু হ'য়ে থাকে···। কিন্তু নিজেই যাবে, এই বাইরে, এই রোদ্দুরে? না, একটা পিওন পাঠালেই তার কর্তব্য করা হবে? কিন্তু এত কী কর্তব্যের জ্ঞান, কোনো মর্যাদাবোধের প্রশ্নই বা উঠবে কেন? মণ্টু-বাবু কি তার বন্ধু নয়? কিন্তু কেন এই খামাখা অশুভ চিন্তা মনে সংস্থান দেওয়া। মণ্টুর কিছুই হয় নি—হ'তে পারেই না, একেবারে অসম্ভব। তবু, শব্দ যখন হয়েছে, একটু দেখা তো দরকার।

'আপনার ঘড়িতে ঠিক ক'টা বাজল?' ব'লেই রাখালের দিকে চেয়ে বেশ একটু অপ্রস্তুতভাবে: 'মাপ করবেন, আপনাকে নিশ্চয়ই ভয়ানক বিরক্ত করছি। আসলে, আমার একটু···'

'না, না—আমাকে কিছুই বিরক্ত করছেন না।'

'আমার ঘড়িটা আবার সারাতে দিয়েছি কি না। এই কাছেই, এক দোকানে। হপ্তাখানেক হ'য়ে গেল। এখান হ'তে যাবার পথে এখুনি নিয়ে নেব।'

যেন এ-কথাটা বলার একটা প্রচণ্ড দরকার ছিল। যেন না জানালেই চলছিল না: আমারও ঘড়ি আছে, এত গরিব নই। কিন্তু লোকটির কথার এধরনের একটা অর্থ করারই বা প্রয়োজন কী? হয়তো এধরনের একটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা যে রাখালের মনে উদয় হয়েছে, তাতে তারই মনের নীচতা ধরা পড়ে। নীচ তো নীচ, আর পারা যাচ্ছে না, ঢের হয়েছে। নীচ হোক, মহান হোক, সে ছিল নিজের জায়গায়, একলা। কারুকে তার নীচতা বা মহত্ত্ব দেখাতে যায়নি সে যেচে—কারুর ঘরের শান্তি ভঙ্গ ক'রে সে জানতে চায়নি: অমুক বাবু আছেন কি? আর কি, এ-সম্পর্ক তো বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। যেন গায়ে প'ড়ে অপরিচিতের সঙ্গে প্রেম করা। কিন্তু লোকটারই বা কী দোষ দেওয়া যায়? আর লোকটা-লোকটা করাই

বা কেন। এখনো নামই জানে না। জিজ্ঞেস করলেই হয়, আপনার কী নাম, কোথায় থাকেন, কী করা হয়, কটি ছেলে-মেয়ে, ইত্যাদি।

'আজ্ঞে, আমার ঘড়িতে ঠিক ছুটো বেজে ছয়। ছয়ের একটু বেশীই বলতে পারেন।'

'অর্থাৎ প্রায় দশ মিনিট হ'তে চলল এসেছি।'

'তা হবে।'

'আমার এমন তাড়া…'

'ভদ্রলোক ভাবিয়ে তুললেন দেখছি। এখনো আসছেন না।'

'আমায় তো বিশেষ ক'রে বড্ড মুস্কিলে ফেললেন।'

'আমি ভাবছিলাম, কিছু হয়নি তো তাঁর?'

মুখে-চোখে ততটা না বোঝালেও রাখাল ভিতরে ভিতরে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে।'

'আজ্ঞে?'

'কিছুক্ষণ আগে একটা শব্দ শুনলাম কি না। কাছেই। হয়তো একটা এ্যাক্সিডেন্ট…'

'কী?' এবারে লোকটি সত্যিই চমকে উঠেছে। পত্রিকাটি এতক্ষণ হাতে ক'রে নিয়ে ছিল, তেমন পড়েছে বা একটু চোখ বুলিয়েছেও ব'লে মনে হয় না। কিন্তু এবার সেটি টেবিলের উপর তাড়াতাড়ি রেখে দিয়ে বলল: 'হ্যাঁ, আপনি একটা এ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছিলেন যেন। আমি অবশ্য কোনো শব্দই পাইনি। কী রকম শব্দ বলুন তো?'

'একটা হঠাৎ শব্দ আর চীৎকার। শব্দটা গাড়িরই মনে হ'ল।

'কিন্তু মন্টুবাবু…… না, না, তা' কী ক'রে হতে পারে? একটা কিছু হ'লে আপনারা নিশ্চয়ই খবর পেতেন।'

'আমিও তো সেই রকমই ভাবছিলাম। তবে…'

লোকটি বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। 'সত্যিই, হয়তো যদি কিছু হ'য়েই থাকে—কী সর্বনাশ।'

'না, তেমন কিছু সত্যিই হয়েছে ব'লে মনে হয় না। অন্তত আমার···না, না, না, তা হ'তেই পারে না। তবে জানেন, কিছুই অসম্ভব নয় এই সহরে।'

'না না, কিছুই অসম্ভব নয়।'

'বিশেষ ক'রে, এরকম করার তো কোনো কারণ দেখি না আপনাকে বলেছেন আসতে। বলেছেন ঘরেই থাকবেন। এদিকে বেরিয়ে পড়লেন। আমাকেও কিছু বলেন নি। ফেরার নামও নেই।'

'না, ঐ শব্দটা সত্যিই ভাবিয়ে তুলল তো।

'সত্যিই। তার আজকাল যে কী হ'তে পারে আর কী না হ'তে পারে, তা কে জানে। রাস্তায় বেরোনা মানেই প্রাণটি হাতে ক'রে বেরোনো। আপনাকে একটা ঘটনা বলি, এই দু-তিন দিন আগেকার কথা। আমার বাড়ির সামনে এক ভদ্রমহিলা থাকেন, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান! অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। স্বামী বাড়িতে নেই, আপিসে। মা একটি ছোট ছেলেকে পাঁউরুটি কিনতে পাঠিয়েছেন, রাস্তার ওপারের দোকান থেকে। দশ-বারো বছরের ছেলে—বহুবার দেখেছি বেরোতে, ইস্কুলে যেতে। তবে আলাপ তেমন কোনোদিন ছিল না—ঐ যা নজরে পড়া কখনো-সখনো। এ-সহরে কে আর কার খবর রাখে বলুন। পাশে বাসা ক'রেও লোকে লোককে চেনে না। তা ছাড়া, ওরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তো, একটু অন্য রকমের। এমনিতেও আলাপ হবার সুযোগ কখনো ঘটেনি। যাই হোক, ছেলেটি রুটি কিনতে গেছে, ফেরে না। পনের মিনিট বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা হ'তে চলল। মা স্বভাবতই বেশ একটু চঞ্চল বোধ ক'রতে আরম্ভ করেছেন। অথচ বাড়িতে অন্য কেউই নেই। অন্য ছেলেমেয়েগুলি ইস্কুল-কলেজে—এই ছেলেটির কেবল শরীরটা একটু খারাপ ছিল সেদিন, একটু সর্দি-কাশি, তাই মা বলেছিলেন তোর আর আজ ইস্কুল গিয়ে কাজ নেই। এদিকে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানেন?

ছেলেটি রাস্তার ওপারে গিয়ে রুটি ঠিকই কিনেছে, রাস্তা আবার পেরিয়ে প্রায় ফিরেও এসেছে বাড়ির ফুটপাথের কাছে, এমন সময় পাশ থেকে একটা ফিয়াট এসে ধাক্কা মারল তাকে, একেবারে কোমরে। সামান্য ধাক্কা—তবু মোটরের ধাক্কা তো। ছেলেটা ভয় পেয়ে রাস্তায় মাঝখানে দৌড়োতে গেছে, হঠাৎ উল্টো দিক থেকে এক দৈত্যকায় বাস এসে উপস্থিত, একেবারে দু হাত দূরে। তখন কী করবে ভেবে না পেয়ে…'

'উঃ, আর বলবেন না। কী সাংঘাতিক।

'সত্যিই, সাংঘাতিক। শুনুন কী হ'ল তারপর। একটা ধাক্কা তো আগেই খেয়েছে, তারপর সামনে বাস। ভড়কে গিয়ে আবার দৌড়োতে গেছে, এবারে উল্টো দিকে, বাড়ির দিকে মুখ ক'রে। তখন আবার সেই একই ফিয়াট—ভেবে দেখুন, সেই একই গাড়ি—এসে ধাক্কা মারল। এবারে পায়ে, ও জোরে। ছেলেটি ছিটকে গিয়ে পড়ল ফুটপাথের ওপর। হাতের রুটি কাগজে মোড়া, তাও পড়ল দশ হাত দূরে গিয়ে। পরে সেটাকে নাকি পাওয়া যায়, কালো জমাট রক্ত মাখা। তারপর কী হয় জানেনই তো এসব ব্যাপারে। লোকজন, চেঁচামেচি। লোকেরা তো গাড়ির ড্রাইভারটাকে ধ'রে এই মারে কি ঐ মারে—একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভার, সর্দারজী। সে-ব্যাটা যত মাপ চাইতে যায়, বলে তার দোষ নেই, লোকগুলো ততই ক্ষেপে ওঠে। তর্কাতর্কি, বাংলায়, হিন্দীতে, ইংরেজীতে পর্যন্ত। গালাগালি, বাপবাপান্ত। অথচ কারুরই খেয়াল নেই যে ছেলেটা এদিকে মরতে চলেছে। সব থেকে আগে যা করা দরকার, তা' ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা, একটা এ্যাম্বুলেন্স ডাকা। ভাগ্যে, ভিড়ের মধ্যে একটি ভদ্রলোক ছিলেন, যাঁর সেই কর্তব্যটির কথা মনে এসেছিল। এদিকে ছেলেটি যে কে, তা' কেউই চিনে উঠতে পারে নি। সবই ভিড়ের লোক তো। যখন অবশেষে ঐ একই ট্যাক্সি ক'রে ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত

হচ্ছে, তখন বাড়ির তলার এক দোকানদার তাকে চিনে ফেলে। ছুটে গিয়ে মাকে খবর দেয়। ভেবে দেখুন, মার কী অবস্থা। একেবারে বাড়ির দরজায় এই ব্যাপার।

'কী হ'ল শেষ পর্যন্ত ছেলেটির?'

'কপালের ভোগটি ছিল, তাই প্রাণে মরেনি। তবে যা হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত হয়তো মরাই ভালো ছিল। একটি পা কেটে বাদ দিতে হবে। এখনো হাসপাতালেই আছে। তবে প্রাণের ভয়টা কেটে গিয়েছে।'

'কার যে কখন কী ঘটতে পারে—ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। কী দরকার যে মানুষেব এত তাড়ার।'

'সত্যিই। তবে দেখুন, তাড়া নিয়েই জীবন, অন্তত এই কলকাতার জীবন। আপনার কি তাড়া নেই? আপনিও তো এসেছেন তাড়াতেই।'

'হ্যাঁ,' লোকটার যেন সম্বিত ফিরে এল। মণ্টুবাবুর কী হ'ল বুঝতে পারছি না। আপনি তো বেজায় ভয় পাইয়ে দিলেন মশাই।'

'না, ভয় তেমন নয়, তবে একটু ভাবনা তো বটেই। দেখতে হয়।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চুপ ক'রে ব'সে থাকা কি যায়?'

রাখাল প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েছিল। হঠাৎ কী মনে হল, টেবিলেব তলায় বেলটা টিপে দিল—ট্যা। কোনো সাড়া নেই কারুর।' বেটারা গেল কোথায়—কারুব পাত্তা নেই?' রাখাল এবার জোরে টিপল, প্রায় তিন সেকেণ্ড ধ'রে—ট্যাঁ। তবুও কেউ আসে না। তাই এবার অগত্যা গলারই শরণ নেওয়া, ও চেঁচিয়ে:

'শ্রীনিবাস!'

কোথায় শ্রীনিবাস? 'শ্রীনিবাস।'

'আজ্ঞে স্যার।' বাইরে থেকে শোনা গেল। এবং অচিরেই টেরি-কাটা তেল চকচকে-মাথা ছোকরা পিয়নের প্রবেশ।

'শ্রীনিবাস কোথায় ?'

'শ্রীনিবাস তো স্যার সেই, খাওয়ার ঘণ্টার আগেই বেরিয়েছে। এখনো ফেরেনি।'

'কোথায় গেছে, কে পাঠিয়েছে ?'

'আজ্ঞে স্যার, তা' তো জানি না।'

কোথায় যায় এরা ? মাসে মাসে মাইনে নেওয়া কেবল। খাসা আছে। তবে অনর্থক একটি আগন্তুকের সামনে রাগ দেখিয়ে লাভ কী ? তাতে রাখালের নিজের সম্মান কিছু বাড়বে না, এবং পিওনটাও হয়তো অপমানিত বোধ করবে। আর এই গোল্লায়-যাওয়া যুগে সকলেরই এমন একটা উদ্ধত আত্মমর্যাদার জ্ঞান যে বেফাঁস কোনো কথা না বলাই ভালো। তাই রাগটা যথাসম্ভব চেপে রাখাল প্রশ্ন করল: 'মণ্টুবাবুকে কি বেরোতে দেখেছ ?'

'না স্যার। আমি কেবল একটুখানির জন্যে বেরিয়েছিলুম স্যার। রসিকবাবু বললেন কিনা, একটা ডাব নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি। হয়তো ঠিক সেই সময়টাই বেরিয়েছিলেন। ডাব কিনতে গেছি, মোড়ের দোকানটায়, আর তখুনি কাণ্ডটা ঘটল।'

এঁ্যা, সত্যিই তবে কিছু ঘটেছে না কি ? 'কী কাণ্ড ?'

'উরিঃ বাবা, কী সাংঘাতিক !'

'কী হয়েছে কি ন্যাকামি না ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলো।'

হ্যাঁ, আর যেন তর সয় না। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। লোকটি ব'সে, একই ভঙ্গীতে, পায়ের ওপর পা তুলে। কিন্তু সেও যেন হঠাৎ সজাগ। অথচ শুনতে পর্যন্ত ভয় করছে।

'বলছি স্যার, একেবারে গোড়া থেকেই। বেলা তখন দুটো নাগাদ, দুটোর কিছু আগেই হবে। রসিকবাবু বললেন, কৃষ্ণধন একটা ডাব নিয়ে আয়। আমি বললুম, স্যার শ্রীনিবাস তো নেই, আমি গেলে কেউই থাকবে না। বললেন, তা' হোক, যাবি আর আসবি। আমি বললুম…'

'থাক, তুমি কী বললে তা শোনার কোনো দরকার নেই। এখন বলো তো দেখি তাড়াতাড়ি, কী হয়েছে, ব্যাপারটা কী, এক কথায়।'

'তাই তো বলতে যাচ্ছিলুম স্যার। শব্দ শোনেন নি, একটা প্রচণ্ড শব্দ, যেন···'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সব শুনেছি। তুমি দয়া ক'রে বলো ব্যাপারটা কী।'

'তাই তো বলছি স্যার। ডাব কিনতে গিয়েছি। দেখলুম, দোকানদারটা নেই, ছোট ছেলেটা রয়েছে। বলুম, কচি দেখে একটা ডাব দে দেখি, কাটতে পারবি তো? রসিকবাবুর আবার···'

'আবার রসিকবাবু, জাহান্নমে যান রসিকবাবু আর তাঁর ডাব।'

'স্যার, ডাব কিনতে গিয়েই তো দেখলুম।'

না, এ-ছেলেটাকে নিয়ে কোনো উপায় নেই। এই জন্যেই ছেলেটাকে কোনোদিন পছন্দ করে না রাখাল—একটা বাক্যবাগীশ। তায় আবার ম্যাট্রিক পাশ। আবার থিয়েটারও করে। আপিসের কর্মচারীরা মিলে কিছুদিন আগে 'চিতোর-বিজয়' অভিনয় করে, তাতে রাণা না কিসের একটা পার্ট নেয়।

'আচ্ছা, তোমার মতন ক'রেই বলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি বলো।'

'হ্যাঁ, ডাব। ছোট ছেলে তো, কাটতে পারে না, বাছতেও জানে না। রসিকবাবুর আবার কচি ডাব না হ'লে চলবে না। পেটের অসুখে ভুগছেন তো। ডাক্তার বলেছেন কচি ডাব খেতে, খাওয়ার পরে রোজ একটা। এদিকে আমারও সময় নেই, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, শ্রীনিবাস বেরিয়েছে। এই বারন্দাটার স্যার আমরা দুটি মাত্র পিওন, আর কত অফিসার। ঐ বারান্দাটায় চার চারটে লোক—মদন, পিনাকী, রামলাল, উদয় সিং। জরুরি কাজ নেই, ব'সে ব'সে শুধু ঝিমোচ্ছে। এদিকের জন্যে আমাদের অন্তত আরো একজন লোক চাই-ই স্যার। আপনি কিছু করতে পারেন। আমার হাতে একটি ছেলে আছে, আসলে আমারই ভাই, সামনের বার ইস্কুল ফাইনাল দেবে, বলেন তো নিয়ে আসি একদিন।'

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কাজ ক'রে তো সব উল্টে গেলে। সরকারী

চাকরী, মাসে মাসে ধরাবাঁধা মাইনে, নিরাপত্তা, চাকরী যাবার কোন ভয় নেই। এখন ভাইটাকেও ঢোকাতে চাও। আর দোষই বা দেয় কী ক'রে রাখাল। পড়াশুনো করা ছেলে সব, পিওনের চাকরী খুঁজছে। পেলে যে ব'র্তে যায়। যেন হাতের স্বর্গ। দিন দিন যা' অবস্থা হচ্ছে দেশের।

'তা দেখা যাবে। এখন বলো তো কী হ'ল। কিসের শব্দ, কী হয়েছে?'

'তখন আমি স্যার সবে ডাবটি হাতে করেছি, অনেক বাছাবাছির পর। ডাবটা কচি সন্দেহ নেই, তবে দেখতে একেবারে পুঁচকে। তাই ভাবছিলুম কত জল হবে। নইলে শুধু শুধু চার আনা পয়সা খরচ করার তো কোনো মানে হয় না। আর রসিকবাবুকে জানেন তো স্যার, বলবেন··'

'জানি, খুব জানি। এবার তাড়াতাড়ি বলো কী হয়েছে।' বেশ উত্তেজিত ভাবেই বললে রাখাল। সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

'কিন্তু সত্যি স্যার, একবার রসিকবাবুকে এরকম একটি ছোট ডাব এনে দিয়েছিলুম। গেলাসে ঢেলে দেখেন আধ গেলাসও ভরল না। তখন কী রাগ আমার ওপর। বলেন, তুই রাস্তায় খেয়ে নিয়েছিস। যত বলি খাই নি, তত রেগে যান, গালাগালি দেন। শেষে বললেন, খাব না, যা' ফেরত নিয়ে যা। কিন্তু কাটা ডাব, দোকানদার ফেরত নেবে কেন? সেও বলে আমি যে রাস্তায় খাইনি, এঁটো ক'রে দিইনি, তার কী প্রমাণ আছে? তখন স্যার, বিশ্বাস করুন, স্যার, পকেট থেকে চার আনা পয়সা গচ্চা দিয়ে আমাকেই ডাবটা খেতে হ'ল। সত্যি স্যার।'

'আমি কি বলছি মিথ্যে? হ্যাঁ, তারপর?'

'তারপর স্যার ডাবটি তখন সবে হাতে করেছি। রাস্তার দিকে তাকিয়েও ছিলুম না। এমন সময় ধু-উ-উ-স ধড়াস, ধা···স! ওরে বাবা, সে যে কী শব্দ স্যার, কী প্রচণ্ড শব্দ স্যার। কানে তালা ধ'রে যাবার জোগাড়। আমি তো স্যার প্রায় অজ্ঞান। আমার মাথায়

মনে হ'ল কে যেন একটা গদা বসিয়ে দিয়েছে, ভীমের গদা, জোরে। খানিকক্ষণের জন্যে তো আমি একেবারে হাঁ, কী হ'ল কিছুই বুঝতে পারলুম না। সর্ষে ফুল দেখছি চোখে।'

যেভাবে হাত পা নাড়ছে, চোখ ঘোরাচ্ছে, যেরকম কখনো আস্তে কখনো হঠাৎ জোরে কথা বলার ঢঙ, তাতে কারুরই বুঝতে দেরী হবে না যে ছেলেটি তার সময় ও প্রতিভা নষ্ট করছে পিওনের চাকরী ক'রে। আসল সংস্থান এর রঙ্গমঞ্চে।

'কী, তোমারই কি কিছু হ'ল না কি ?'

'না স্যার, আমার হবে কেন ? এই দেখুন।' ব'লে দুপা পিছিয়ে গেল, পরে দুটো হাতে সমকোণের ভঙ্গী ক'রে : 'মোড়ের দোকানটা চেনেন তো ? ডাবের দোকানটা ? একটা ঠেলাগাড়ি আসছিল, এই যে রাস্তাটা চ'লে গেছে সামনে দিয়ে, সেইটে ধ'রে। বোঝাই অজস্র বাঁধা কপিতে। বোধ হয় নিউ মার্কেটের দিকে যাচ্ছিল। অনেক বাঁধাকপি, অনেক অনেক। গাড়িটা ভেঙে পড়ছে। আর যে বেচারা ঠেলছে, তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন স্যার। একটা লোক তো, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আমি হ'লে তো বহু আগেই হার্টফেল ক'রে মরতাম।'

'বাঁচাতে তবে। এখন আমাদেরই হার্ট ফেল হবার দশা। তাড়াতাড়ি বলো, কী হ'ল ?'

'সে কি স্যার, বালাই ষাট।' বলে চোখ বুঁজে হাত দুটোকে প্রণামের ভঙ্গীতে কপালে ঠেকিয়ে : 'আপনারাই তো এখন আমাদের মা-বাপ স্যার, আপনারা হার্টফেল করলে যে আমরা একেবারে অনাথা হয়ে যাব।' যেন কেঁদে ফেলে।

শোনো কথা। হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। দুঃখ নয়, রাগে আপাদমস্তক জ্বলে যায়। বলে রাখাল : 'তারপর কী হ'ল, তাড়াতাড়ি বল।'

'তারপর স্যার,—ঐ যাঃ, কোন পর্যন্ত যেন এসেছিলুম ?'

'ডাবের দোকানে গেছ ডাব কিনতে।'

'না, না,' লোকটি বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ঠেলাওলাটা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।'

ঠিক শুনছে তো লোকটা।

'হ্যাঁ,' কৃষ্ণধন আবার আরম্ভ করল, 'ঠেলাওলাটা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। অত কপি তো, একেবারে পাহাড়—যেন হনুমানের গন্ধমাদন পাহাড় বহন করা। তার ওপর ঐ রোদ্দুর—রাস্তার পিচ গ'লে পাঁক হ'য়ে আছে, পা ফেলা যায় না। আর এবছরে এখনো বিষটির নাম গন্ধ নেই। এই হতচ্ছাড়া সহরে...'

'উঃ,' অসহায়ের মত রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল—যেন এখুনি তার সমস্ত শরীরটা এলিয়ে পড়বে মাটিতে, আর পারছে না। যেন এবার তার নিজেরই কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করছে। বলতে ইচ্ছা করছে হাত জোড় ক'রে ঃ এবার মুক্তি দাও, অনেক হ'ল। এবং অনেকটা সেই ভঙ্গীতেই বলল রাখাল 'কৃষ্ণধন, অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। কী হ'ল তারপর ?'

ইঙ্গিতটা যেন অবশেষে কৃষ্ণধন ধরতে পেরেছে ব'লে মনে হ'ল। নতুন ক'রে দম নিয়ে গলাটা শান্ত ক'রে সে তাই ধীরে ধীরে আরম্ভ করল।

'তারপর স্যার, উল্টো রাস্তা দিয়ে, ঐ যেটা কেটে বেরিয়ে গেছে অন্য দিকে, সেটা দিয়ে কোত্থেকে লাল রঙের একটা মেল ভ্যান এসে উপস্থিত। ধাঁ ক'রে। রাস্তার মোড়, একটু আস্তে চালা, অন্তত হর্ণ দে'। তা নয়, কিচ্ছু নয়, একেবারে হঠাৎ এসে হাজির—সোঁওঁ ক'রে। ঠেলাওয়ালাটাও পড়বি তো পড়, ততক্ষণে সে এই রাস্তাটা ধ'রে একবারে মেল ভ্যানটার সামনে। আর ঐ জায়গাটায় রাস্তাটা একটু ঢালু। তাই ওর গাড়ি একটু চেষ্টাতেই গড়গড়িয়ে নামছে, প্রাণপণে ঠেলতে হচ্ছে না। এদিকে মেল ভ্যান। তখন বেচারা করে কী ? থামতেও পারে না—থামতে গেলে নিজের গাড়ির চালে নিজেই পিষে মরবে। ওরে বাবা, কী সাংঘাতিক। বলতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে স্যার। মেল ভ্যানটা অবশ্য ব্রেক

কম্বল। লোকজন চেঁচাচ্ছে। কিন্তু সেসব ক'রে তার হবে কী? ঠেলাগাড়িটা দেশলাই-এর বাক্সের মত দুমড়ে ভেঙে পড়ল—বাঁধা-কপি চারিদিকে। কত লোক সেই সুযোগ দুটো ক'রে তুলেও নিয়ে গেল দেখলুম। ভেবে দেখুন, স্যার। তার লোকটা, সেই ঠেলাওয়ালাটা, ওরে বাবা রে··· ·। গাড়ির সামনের দিকটা ভেঙ্গে পড়েছে তারি ঘাড়ে—রাস্তার ওপর লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। গাড়ি সরিয়ে তাকে কেউ টেনে তুলতেই পারে না। হয়তো সবগুলো হাড়ই ভেঙে গেছে, হয়তো বাঁচবে না। হয়তো তখুনি ম'রে গেছে, একবারে সঙ্গে সঙ্গে। আর কী রক্ত তার কাপড়টায়, রাস্তার ওপরেও কী রক্ত।'

'উঃ, সত্যিই সাংঘাতিক। কিন্তু মন্টুবাবুর কী হ'ল? মন্টুবাবুকে কি দেখেছ সেখানে?'

'কই, না তো স্যার। হয়তো ছিলেন, অনেক লোক ছিল। খুব কম ক'রে···'

'তুমি তা হ'লে মন্টুবাবুকে সেখানে ছাখোনি? মন্টবাবুর তাহলে কিছু হয় নি এই দুর্ঘটনায়?'

'সে কী কথা স্যার, বালাই ষাট, আমাদের মন্টুবাবু···'

'তাহ'লে এতক্ষণ বলছিলে কী? তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম মন্টুবাবুর কথা, আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তুললে। তাই ভাবছিলাম···যাক গে এখন তুমি যেতে পার!'

'আজ্ঞে স্যার, আমি তো বলিনি বন্টুবাবুর কিছু হয়েছে। শুধু বলছিলুম, তিনি হয়তো ঠিক তখনই বেরিয়েছিলেন। তার মানে, আমি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই।'

'ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।'

'আচ্ছা স্যার।' নমস্কার ক'রে কৃষ্ণধনের প্রস্থান।

'উঃ।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল রাখাল। 'সত্যি', ব'লে লোকটিও একটু ঘুরে'বসল।

কিন্তু কী স্বস্তি রাখালের, লোকটিরই বা কী সেই 'সত্যি'?

মন্টুবাবুর কিছু হয় নি ত'হলে—বা রাখালের পক্ষে, ও লোকটিরও পক্ষে নিশ্চয়ই, ও হয়তো আরো একটু বিশেষ ক'রে, সান্ত্বনার কথা। ও স্বস্তি কৃষ্ণধনের হাত থেকে রেহাই পাওয়াতেও। কী এক চিড়িয়াখানায় বাস এখানে। এইটুকু কথা বলতে ছেলেটা এতক্ষণ নিল, যেন একটা ভেল্কিবাজি দেখিয়ে গেল, অনাবশ্যক, নিরর্থক। কিন্তু কোনটা আবশ্যক আর কোনটা অনাবশ্যক? এই চোখে-দেখার হাতে-ছোঁয়ার জগতে যেটা আমার, সেইটাই আবশ্যক—যেটা আমার নয়, যেটা দূরের, যেটা অপরিচয়ের, অদৃশ্যের, সেইটাই অনাবশ্যক। অথবা তাই কি? কে বলবে। মন্টুবাবুর কিছু হয় নি, স্বস্তি তাই—কিন্তু ঠেলাওয়ালাটার তো হয়েছে। হয়েছে তো হয়েছে। তাতে আমার কী, কার কী, যখন তাকে চিনি না, জানি না, হয়তো কোনোদিন জানব না চিনব না বা দেখব না? এবং যদিই বা তাকে জানার সুযোগ ঘটে একদিন তাকে দেখার ঘটে একদিন, একদিন তাকে দেখার সুযোগ ঘটে, হয়তো রাস্তা পেরোতে গিয়ে অথবা পথে চলতে গিয়ে, এক ঘর্মাক্ত দুপুরবেলায়, অগুনতি নামহীন ভিড়ের মিছিলের মধ্যে তার রাস্তার দিকে ঝুঁকে পড়া চোখ দুটিকে হঠাৎ দেখা অন্য মনস্কভাবে, তাতেই বা কী? কী হবে তাকে জেনে' তাকে দেখে? একটা ঠেলাওলা বই তো নয়। আর তাকে জানার বা দেখার প্রশ্ন উঠবে বা কেন? কারণ হয়তো লোকটা এতক্ষণে সত্যিই ম'রে গেছে, নিশ্চয়ই ম'রে গেছে—এত বড় দুর্ঘটনার পরে সে বাঁচবে কী ক'রে? সে যে রাস্তার ওপর দুমড়ে প'ড়ে গেছে, তার যে হাড়গোড় ভেঙ্গে গেছে, সে যে চিরকালের জন্যে মুছে গেছে এই পৃথিবীর প্রবাহমান প্রভাত প্রদোষ হ'তে। আর তো সে হাসবে না, কোনোদিন আর সে কথা বলবে না, সে আর বোঝা বইবে না। অতএব, কার কী?

তবু, তা সত্ত্বেও, যেন দুঃখ হয়, যেন একটা অপ্রকাশ্য অনির্দেশ্য বেদনায় বুকটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। কেন, কেন? জীবনের এই রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে দেবে কে? তবে কি সত্যিই সমস্ত মানুষই

অমৃতের সন্তান, মানুষ মাত্রেই মহামানব, তারা বাঁধা অদৃশ্য প্রেমের বন্ধনে, ও তাই এই দুঃখ, এই বেদনা? না আসলে এ দুঃখ নয়, বেদনা নয়—এ ভয়, নিছক নগ্ন ভয়, বা ভয়ের নামান্তর বা রূপান্তর? ভয়, ভেবে যদি এরকম কিছু একটা ঘটে কোনোদিন আমারই বা আমারই প্রিয়ের বা প্রিয়জনের? একি তবে এক শেষ স্বার্থ, বা স্বার্থপরতা মাত্র? অথবা ঠেলাওয়ালাটার জায়গায় মনে মনে নিজেকে বসিয়েই এই ভয় পাওয়া বা আঁতকে ওঠা, এই দুঃখ বা বেদনা পাওয়া? অথবা দুঃখ বা বেদনা পেলাম, সে-কথা মনে ক'রে এক নামহীন আনন্দ অনুভব করা, মনে মনে কৃতার্থ বোধ করতে চাওয়া এই ভাবনায় যে মানুষেরা অমৃতের সন্তান? স্বার্থই কি তবে এত চরম, এমন নির্মমভাবে পরম সে, সে-ই একমাত্র শেষ সব আরম্ভের? না আরো আছে, সত্যিই আছে মুক্তিদাতা একটি আকাশ স্বার্থহীনতার?

কিন্তু কেনই বা এত প্রশ্ন। হয়তো আসলে উত্তর নেই, কোথাও। হয়তো উত্তরটা ছিল একদিন, একটা তারিখহীন কোনো দিনে, একটা, বিশিষ্ট কোনো জায়গায়, ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। হয়তো সে অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিল প্রশ্নের, সব প্রশ্নের। কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। তাই কবে একদিন মনের দুঃখে হয়তো হঠাৎ সে পালিয়ে গেছে, দূরে, দূরের চেয়ে দূরে, সমস্ত ধরা-ছোঁওয়ার নাগালের বাইরে। আজ আকাশ তাকে খুঁজে মরছে, খুঁজে মরছে সবাই, খুঁজে মরছে রাখালও, রাখালের এই ঘর, তার এই মুহূর্ত। যদি অন্তত হো হো ক'রে প্রাণ খুলে হেসে উঠতে পারা যেত একবার, যদি অন্তত একবার। কারণ একটা প্রচণ্ড প্রহসনের ভূমিকা যেন গুমরে গুমরে উঠছে প্রতি মুহূর্তে, সকল নীরবতায়। অর্থ খুঁজছে সবাই, এই দেয়াল, ঐ দূরে রাস্তায় হঠাৎ স্তিমিত শব্দ অথচ অর্থ নেই। আসলে সব মিথ্যা, সব বাজে, কদাকার, নিরাকার, নিবিড় নিরর্থকতা। ও সবই সত্য। দূর ছাই। মরুকগে, যেমন ক'রে মরেছে (হয়তো) ঠেলাওয়ালাটা। আহা বেচারা।

· সূর্যের আলোটা কিছুক্ষণ আগে মেঝের যেখানটায় ছিল, এখন আর সেখানটায় নেই। স'রে গিয়েছে। অর্থাৎ, যেন বলতে চেয়ে, চলেছি, চলছি। দিন চলেছে। তাই জানাতেই যেন খড়খড়ির আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে এক টুকরো চলমান আলোর প্রবেশ এই ঘরে। ভাবলেই হ'ল, এ-ঘরও চলেছে, উড়ে চলেছে, আকাশে, যেমন ক'রে মাটিতে বাঁধা প'ড়েও উড়তে পেরেছে কোণার্কের মন্দিরের ঘোড়া। সত্যি, কী আশ্চর্য সৌন্দর্য মন্দিরটার! রাখাল গিয়েছিল একবার, বিবাহের সামান্য পরেই, ও তা আজ ইতিমধ্যেই যেন অনেকদিনের ব্যাপার হ'য়ে গেছে। তবু মন্দিরের স্মৃতিটা আজো এত জীবন্ত, যেন তা জ্বলছে, যেন তাকে এইমাত্র দেখলাম। আবার যাবে রাখাল আবার, আবার যাবে। কেন এ-ঘরের সে-সৌন্দর্য নেই, কেন এর গায়েও দুটো ঘোড়া লাগানো নেই—কেন এ এত অনড়, এত অচল, এত মূর্খ, এত অর্থহীন। আর লোকটা। কী দরকার ছিল তোর আসার। এসেছিস এসেছিস—যা হবার হ'য়ে গেছে, অন্তত যা এবার। আর কতক্ষণ থাকবি ব'সে? আর এসেছে তোর মন্টুবাবু। কিন্তু কতক্ষণই বা এসেছে লোকটা, এখনো তো আধ ঘণ্টাই হয় নি, বিশ মিনিটও হয় নি। অতএব? সম্ভাবনা এখনো আছে সবই হবার অর্থাৎ মন্টুবাবুর আসার ও তারপর অচিরেই লোকটির বিদায় হওয়ার। তা ছাড়া, লোকটি এখন বিদেয় হলেই বা কী, আর না হ'লেই বা কী।

'সত্যি, যা ভয় পেয়ে গিছলাম।'

চমকে উঠল রাখাল: 'হ্যাঁ। আর হতভাগাটা এমন ক'রে আরম্ভ করল যে আমার তো মনে হ'ল সত্যিই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘ'টে গেছে মন্টুবাবুর।'

'আমারো ঠিক তা-ই মনে হয়েছিল। যাক। তাহ'লে হয়তো আশা করা যেতে পারে, উনি সত্যিই ফিরে আসছেন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আশা না করার মত তো কিছু ঘটেনি এখনো।

আর ভেবে দেখুন, হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনি নিরাশ হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন, ভাবলেন, যাক, ভদ্রলোক আর এলেন না, আসবেন না। আর ধরুন, আপনার যাওয়ার দু' মুহূর্তের মধ্যে সত্যি সত্যিই উনি এসে হাজির হলেন। তখন?'

'সেই তো। একমাত্র সেই ভেবেই আমি এখনো উঠিনি। নইলে মন উঠব উঠব করছে অনেকক্ষণ। বড্ড তাড়া।'

কী তাড়া রে বাবা। দেখে তো মনে হয় না। থাকতে তো পারো ব'সে চুপ ক'রে বোমভোলার মত। এক-একবার মনে হয় রাখালের, দিক ব'লে মুখের ওপর ঃ রাখো তোমার ধাপ্পা, তাড়া না হাতি। তেমন-তেমন তাড়া থাকলে মানুষে কথাও বলে অন্য রকম ক'রে। রোদে ঘুরতে চাও না, অথচ অন্যত্র যাবার জায়গা নেই। তাই বেশ নিরিবিলি ছায়ায় ছায়ায় ফ্যানের তলায় দুপুরটি এখানে কাটিয়ে যাবার মতলব নিয়েই এসেছ। মণ্টুবাবুর সঙ্গে পরিচয় আছে, অজুহাত তাই। মণ্টুবাবু থাকলে ভালো, না থাকলেও ব'য়ে গেল—দুপুরটা তো কাটবে। আর যতক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকতে চাও বা পার, কেই বা ভাগাচ্ছে তোমায়? অবশ্য এক যদি রাখালের গালে হঠাৎ একটা থাপ্পড় না মেরে বস। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই-ঠিক ধরেছে রাখাল! কত ফিকির খুঁজে মরছে কত লোকে এই সহরে—কার মনে কী আছে, কে জানে। আসলে লোকটা এসেছে ঐ সময় কাটানোর ফন্দী নিয়ে, গরমটা এড়াতে। অবশ্য ফ্যানের হাওয়ায় ব'সে থাকার জন্যে যেতে পারত রেষ্টুরেণ্ট, বা তার চেয়ে ভালো একেবারে এয়ারকণ্ডিশান-করা কোনো সিনেমা হলে। কিন্তু হয়তো ট্যাঁকে পয়সা নেই। অগত্যা, তাই মণ্টুবাবু, এই ঘর। অথচ মণ্টুবাবু তো ঘরে নেই—কী অজুহাতে থাকবে ব'সে লোকটা? তাই যেন মণ্টুবাবুই আসতে বলেছিল, এখন বোঝাতে চাওয়া, ও মণ্টুবাবুর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেন কিছুতেই উঠতে পারছি না, এই ভান করা। ও তাই, নিজেকে আরামে চেয়ারে বসিয়ে রাখার

জন্যেই, তাড়ারও ভান করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফন্দীটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে রাখালের চোখে। কিন্তু এমনিভাবে আরেকজনকে বিরক্ত ক'রে কতক্ষণ ব'সে থাকা যায়? মানুষের কি চক্ষুলজ্জা নেই? অন্তত রাখাল তো এমন কাণ্ড কখনোই করতে পারত না। আত্মসম্মানের জ্ঞান তার প্রচণ্ড। হ্যাঁ, এত প্রচণ্ড যে কেউ তার প্রতি যদি কটাক্ষেও সামান্যতম অবহেলা বা বিরক্তির ভাব দেখায়, সে তা ধরতে পারবেই। ছেলেবেলা থেকেই অভিমানী ব'লে তার দুর্নাম—যারা তাকে বুঝতে পারেনি বা সেন্টিমেন্টাল ব'লে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাকে কেউ ঠিক তেমন পছন্দ করছে না, তাই আমি মানে মানে স'রে পড়ি বা সময় থাকতে চুপ করে যাই, এ-জ্ঞানটা বা বোধটা থাকার জন্যেই যদি লোকে আমাকে সেন্টিমেণ্টাল বলে তো আমার ভালোই হ'য়েই গেল। কারণ কোনটা ভালো, এই ধরনের সেন্টিমেণ্টাল হওয়া ভালো, না লোকের ঘাড়ে প'ড়ে লোককে তিতিবিরক্ত ক'রেও খাসা আছি মনে করা ভালো? ধর না কেন এই লোকটা, এই সামনের লোকটাই-পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি ব'সে আছে, রাখাল কি ওর মত কোনোদিন হ'তে পারবে, না হ'তে চাইবে? আর তা ছাড়া এ-প্রশ্ন করাই বা কেন? কোনো দুটো লোকই এ-পৃথিবীতে হুবহু এক রকমের নয় বা এক ভাবের নয়। রাখাল কেন নিজেকে ওর জায়গায় বসাতে যাবে, ওকেই বা কেন রাখালের মত হ'তে হবে?

না, প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছেঃ এই যে লোকটা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি বসে আছে, এটা কি একটা খুব ভালো ব্যাপার হচ্ছে? ভালো ব্যাপার বলতে রাখাল শুধু তার নিজের কথাই বলছে না, তার পক্ষে তো ব্যাপারটা একেবারেই ভালো হচ্ছে না, কিন্তু সে এ-ব্যাপারে তো কেউই নয়, এ-ব্যাপারটা ঘটা-না-ঘটায় তার কোনো হাতই ছিল না ও নেই, সে শুধু মাঝখান থেকে জড়িয়ে পড়েছে এইমাত্র। না, ব্যাপারটা কি ঐ লোকটার পক্ষেই

ভালো হচ্ছে? অন্য কাউকে আহাম্মকের মত ব্যবহার করতে দেখলে কখনো কখনো নিজেরি খারাপ লাগে। কথা তা-ই?

নাঃ, ঐ গরম এড়ানোর জন্যেই এসেছে, সন্দেহ নেই। যদি মণ্টুবাবু সত্যিই এসে পড়ে, তখন? মক্কেলের ফন্দীটি তো তখন ফেঁসে যাবে। খানিক্ষণ বাদেই উঠতে হবে! কারণ এত যে মণ্টুবাবু—মণ্টুবাবু, সেই মণ্টুবাবুর সঙ্গে দেখাই তো হ'য়ে গেল। অথবা, বলা যায় না, হয়তো মণ্টুবাবুর সঙ্গে সত্যিই লোকটার বেশ তেমন একটা দহরম মহরম আছে। দেখেই হয়তো মণ্টুবাবু ব'লে উঠবেঃ আরে, তুই যে। ব'স, ব'স। এখুনি উঠবি? না, তা' হতেই পারে না। আর খানিকক্ষণ ব'সে যা, আপিসের সময়টা কাটিয়ে এক সঙ্গে বেশ বাড়ি ফেরা যাবে—কী বলিস? কিন্তু লোকটা যা বলছে, তা যদি সত্যি হয় তো ওকে দেখে মণ্টুবাবুর বেশ একটা 'আরে, তুই যে' ব'লে বিস্ময় প্রকাশ করার তো তেমন কথা নয়—কারণ লোকটার মতে মণ্টুবাবুই তাকে এখন আসতে বলেছে। তাহ'লে হয়তো মণ্টুবাবু এলে ব্যাপারটা সত্যিই চুকে যায় অল্পক্ষণের মধ্যে, অর্থাৎ লোকটি কেটে পড়ে।

কিন্তু মণ্টুবাবু যদি না আসে? আর লোকটাও যদি সত্যিই গরম এড়াতেই এসে থাকে? তবে তো হ'য়েই গেল, সারা বিকেলটাই গেল, আর নড়ছে না, অন্তত যতক্ষণ গরমটা না পড়ছে। হয়তো বেলা যখন প'ড়ে আসবে, রোদের রঙটা একটু লালচে আভা নেবে, সন্ধ্যার আভাস জানিয়ে একটু হাওয়া জাগবে ফুরফুর ক'রে, ন'ড়ে উঠবে কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাতা, হয়তো তখন ধীরে সুস্থে কর্তা উঠে দাঁড়াবেন, বলবেন, 'আচ্ছা, চলি তবে। মণ্টুবাবু এলেন না দেখছি।' লোকটার আবার ভদ্রতার একটা ভানও তো আছে, তাই হয়তো বললেও বলতে পারে, 'খামাখা আপনার অনেকটা সময় নষ্ট ক'রে গেলাম, মাপ করবেন।'

হঠাৎ রাখালের বুকের ভিতরটা যেন কেমন ক'রে উঠল। মনে

হ'ল, না—না—না, এমন একটা সম্ভাবনাকে চুপচাপ মেনে নেওয়া কিছুতেই চলে না। বলল ঃ

'আমার মনে হচ্ছে, হয়তো সত্যিই ভদ্রলোকের আসতে বেশ একটু দেরী হ'তে পারে।'

'আমি তো মশাই মহা মুস্কিলে পড়লাম।'

'এই জন্যে বলছি যে, আসবার হ'লে ভদ্রলোক এতক্ষণে এসে পড়তেন। বিশেষ ক'রে আপনাকে যখন কথা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, ভদ্রলোক একেবারে ভুলে গিয়েছেন।'

'কী ?'

'যে আপনাকে আসতে বলেছিলেন।'

'তবে ? কী করি বলুন তো ?'

'আমার মনে হয় আপনি হয়তো অনর্থক আপনার সময় নষ্ট করছেন। এ-সময়টা হয়তো আপনি অন্য কোনোভাবে কাজে লাগাতে পারতেন। নিশ্চয়ই আপনার আরো অনেক কিছু করার আছে।'

'হ্যাঁ, তা'তো আছেই। অজস্র করার আছে। কিন্তু··· ওঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত যে কিছুই ক'রে উঠতে পারছি না। আর ব্যাপারটা কী জানেন ? উনি যে আমার আসার কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছেন, এমন ভাবতে পর্যন্ত যে আমার ভয় করছে। আমার যে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।'

ওরে বাবা, সে কি ? সর্বনাশ হ'য়ে যাবে ? ভাবসাব দেখে কিন্তু মনে হয় না যে লোকটা কেবল মিথ্যে মিথ্যে ভান ক'রে যাচ্ছে একটার পর একটা। তবে কার মনে কী আছে, ভগবানই জানেন।

'আপনার সর্বনাশ হ'য়ে যাবে ?'

'না, সর্বনাশ দেখুন একটা কথার কথা। মানুষের একমাত্র ছেলেও ম'রে যায়, তাতে কি তার সব নষ্ট হ'য়ে যায় ? তা নয়।

তবে মণ্টুবাবু যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তো আমি একটা ভয়ঙ্কর মুস্কিলে প'ড়ে যাব, এই আর কি।'

'তো কী করা যায় বলুন তো।'

'দেখি আরো একটুখানি। এতক্ষণই যখন রইলাম তো আরো দু'এক মিনিটে এমন কিছু এসে যাবে না। আর তা ছাড়া আপনি যা বলছিলেন, আমার বেরোনোর দু মিনিটের মধ্যেই যদি উনি এসে হাজির হন, তখন?'

বাঃ, আচ্ছা ঘ'ড়েল লোক তো তুমি বাবা। এখন আমার অস্ত্র আমারই ওপর প্রয়োগ করা। যেন তুমি যেতে চাও, আমি তোমাকে ধ'রে বেঁধে বসিয়ে রেখেছি। বাঃ! যেন পিত্তি জ্ব'লে যায় রাখালের।

'না, আমার খারাপ লাগছে কী ভেবে জানেন? হয়তো আমার কথা শুনে আপনি সত্যিই অপেক্ষা ক'রে গেলেন, একেবারে আপিসের ছুটি না হওয়া পর্যন্ত...'

'কী বলছেন? ততক্ষণ অপেক্ষা করতে আমি কিছুতেই পারব না।'

'যতক্ষণই অপেক্ষা করুন না কেন, আমার কথা শুনে তো তা' করছেন? আমিই তো আপনাকে আশা দিয়ে এক রকম জোর ক'রেই বসিয়ে রেখেছি, নয় কি? এখন, এত সত্ত্বেও ধরুন মণ্টুবাবু এলেন না, অনর্থক সারা বিকেলটা আপনি...'

'সারা বিকেলের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না মশাই, আপনি আমার কথা বুঝতেই পারছেন না। আমার হাতে সময় একেবারে নেই। আরো একটুখানি দেখি। তার মধ্যে ভদ্রলোক ফেরেন তো ভালোই, না ফেরেন তো আমিও চললাম।'

'ও।'

'অবশ্য, শুধু মণ্টুবাবুর সঙ্গে দেখা না ক'রেই যদি যেতে হয় তো আমার একটু খারাপ লাগবে, আসলে খুবই খারাপ

লাগবে, এমন কি আমরা বেশ একটু মুস্কিলে প'ড়ে যাব, এই আর কি।'

'আপনারা মুস্কিলে পড়ে যাবেন—অর্থাৎ, মন্টুবাবুরও মুস্কিল হবে আপনার সঙ্গে দেখা না হ'লে?'

'না না, এটা একটু জটিল ব্যাপার। মন্টুবাবু এই মুস্কিলের সঙ্গে জড়িত একটু অন্যভাবে। আমি আরেকজনের কথা বলছিলাম।'

বেশ রীতিমত রহস্যজনক ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে। যাক গে, পরের ব্যাপারে কৌতূহল না দেখানোই ভালো। লোকটিও যেন ধরতে পেরেছে রাখালের মনের কথাটা, তাই ব'লে উঠল:

'সে যাক। তো আমি আরো দু এক মিনিট দেখি, কী বলেন

'নিশ্চয়ই দেখবেন। সে কী কথা। আমার শুধু খারাপ লাগছে দেখে, আপনি অপেক্ষা করেই চলেছেন, অথচ ভদ্রলোকের পাত্তা নেই।'

'সেটা কি আপনার দোষ? আপনি কেন মিছিমিছি তা' ভেবে মন খারাপ করছেন?'

'না, মন ঠিক খারাপ করছি না, তবে—

'না-না-না-না-না, সে কী কথা? আমারই বরং খারাপ লাগা উচিত। খামখা আপনার কতটা সময় নষ্ট ক'রে দিচ্ছি দেখুন তো।'

এ যেন সৌজন্যের প্রতিযোগিতা দুজনের মধ্যে। এ-খেলা চালাতে রাখাল অন্তত প্রস্তুত নয়।

'আপনার গরম হচ্ছে না তো? পাখাটা একটু জোর ক'রে দেব?'

'কিছু দরকার নেই। বেশ আছি।'

হ্যাঁ, বেশ তো আছই, এবং বেশ তুমি থাকবেও। কী আর

হবে ? রাখালের মনে হ'ল, অনিবার্যকে গ্রহণ ক'রে নিতে পারার যে-ক্ষমতা, তারই মধ্যে আছে মহত্ত্বের ইঙ্গিত। এবার মহৎই হওয়া যাক। এ নিয়ে আর চিন্তা নয়, আর কষ্ট পাওয়া নয়, বিরক্ত হওয়া নয়। কী এক ক্লান্তির অস্পষ্ট সংগীত জাগছে নাড়ির ভিতরে। ঝিমঝিম চেতনা। যেন ঘুম পাচ্ছে। ছেড়ে দাও—যা' ধরতে পারার নয়, নাই বা ধরতে চাওয়া তাকে। ওদিকে বেলা ব'য়ে যায়, হুঙ্কার দিয়ে নয়, গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে নয় —নিঃশব্দে, তিলে তিলে। সময় একটি ধূর্ত বিড়ালের মত পা টিপে টিপে চ'লে যাচ্ছে। রোদের যে-ছোট্ট চঞ্চল টুকরোটা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছিল ঘরে, তাও কখন চোখের আড়ালে মেঝে ছেড়ে হঠাৎ দেয়াল ধরেছে। বেলা ব'য়ে যায়, জীবন ব'য়ে যায়। আজ সকালটা কী ভাবেই কাটল, আর দুপুরটাই বা কাটছে কেমন ক'রে। দুপুর ? দুপুর তো আবার কালকে আসবে। যাক গে।

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই আড়াইটে বেজে গেছে ?'

ঘড়িটার দিকে তাকাল রাখাল। 'আজ্ঞে না, আড়াইটে বাজতে এখনো দু' মিনিট।'

'ও।' খানিকটা যেন সান্ত্বনা পাওয়ার মত ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলল লোকটি। 'দেখি আরো দু মিনিট।'

লোকটার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ রাখালের নজরে পড়ল একটা ছোট্ট কালো কাটার দাগ—লোকটার নাকের উপর। দাগটা যেন মুখটায় পৌরুষের আভা ছিটিয়ে দিয়েছে। একে অল্প কালো গায়ের রঙ এমনিতেই, তার উপর ঐ ছোট্ট ঘন কৃষ্ণ দাগটি মুখখানাকে দিয়েছে যেন একটি বলিষ্ঠ সুষমা। আশ্চর্য, এতক্ষণ নজরেই পড়ে নি রাখালের—কারণ লোকটার দিকে সে ভালো ক'রে তাকায় নি পর্যন্ত। স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথাই ভাবছে।

হ্যাঁ, বেশ একটি ব্যক্তিত্ব আছে চেহারায়, মুখে। মুখটা যা' কেবল একটু বেশি লম্বা, এবং নাকটাও হয়তো আরো একটুখানি

তীক্ষ্ণ হ'লে দেখাত আরো ভালো। চোখ দুটি উজ্জ্বল, তবু ভাবুকের স্তিমিত জ্যোতিও ধরতে জানে তারা। হঠাৎ হঠাৎ যেন জেগে ওঠে। মাথার চুল হাল্কা—এদিকে ওদিকে বেশ কয়েকটি পাকা চুলও গজিয়েছে। টাক নেই, অন্তত এখনো টাক পড়ে নি। তবে কপালটা যেন একটু বেশি প্রশস্ত মনে হয়। হয়তো উপরের দিকটায় দু ধারেই খানিকটা চুল উঠে গেছে। এবং সারা শরীরে একটি রুক্ষতার ছাপ—কমনীয়তা যাকে বলে, তা, তেমন একটা নেই। হয়তো জীবন ভ'রে দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। ভালোই তো। আর দুঃখ দারিদ্র্য যা এ-সহরের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য, কটি প্রাণীই বা সেই গৌরব হ'তে বঞ্চিত। বঞ্চিত কি রাখাল? যাক গে, কেন আবার নিজের কথা!

না, এমন কিছু অসাধারণ নিশ্চয়ই নয়, একেবারেই নয়—তবে একটি বৈশিষ্ট্য আছে লোকটির চেহারায়, বেশ একটু ভালো ক'রে দেখলে তা কারুর নজরই এড়াবে না। সাধারণ হয়েও বিশেষ, তাই তো আদর্শ, নয় কি? পরনে মিলের ধুতি আর মোটা ঘি রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী। ছাতটা বোতাম দিয়ে বন্ধ করা কব্জির কাছেই। কেবল একটা হাতের দুটো বোতামের একটি নেই, কিম্বা তাড়াতাড়িতে লাগানো হয় নি সেটি। কিন্তু এই ধরণের মোটা ও মসৃণ পাঞ্জাবীর সঙ্গে যেন মিলের পাতলা ধুতি ঠিক খাপ খায় না। অবশ্য খাপ না খেল তো ব'য়েই গেল—জামাকাপড়ে সব সময় খাপ খাওয়ানোর ভাবনা ভাবতে গেলে কি চলে কারুর? বিশেষত, পুরুষমানুষের? ধব্‌ধবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়ে বেরোতে পারাটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার কলকাতায়—সেভাবে কাউকে বেরোতে দেখলেই মনে হয়, বাঃ, বেশ বাবুটি সেজে ফিটফাট হ'য়ে বেরিয়েছে তো। তার ওপর যদি ভাবতে হয়, মোটার সঙ্গে পাতলা মিলছে না, এ রঙের সঙ্গে ও-রঙ্‌ মিলছে না, তবেই তো হয়েছে। আর সে ভাবছেই বা কে?

পায়ে কালো পাম্‌সু (প্রসঙ্গত, এ-রঙ্‌টাও ঠিক মিলছে ব'লে মনে হচ্ছে না), সস্তা সস্তা দেখতে, তবে একেবারে নতুন, আন-করা, নিশ্চয়ই, সদ্য কিনে পায়ে প'রে এসেছে। কিন্তু পুরোনো জুতো-জোড়াটা রেখে এল কোথায় তবে? না কি আসার সময় দোকান পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে এসেছিল? যাঃ, তাও কি সম্ভব ভদ্রলোক হ'য়ে, আর এই রকম জামাকাপড় প'রে? কিন্তু কীই বা এমন জামাকাপড় পরেছে?—শুধু একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এই যা। না, হয়তো পুরোনো জুতোজোড়াটা ইচ্ছে ক'রেই দোকানে ফেলে এসেছে। কিম্বা জুতোটা কিনেছে সকালে, এখন নয়। কিনেছে আজকেই, অন্তত পরেছে আজকেই প্রথম, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই—কারণ এখনো প্রথম ধুলো তেমন লাগে নি, কোথাও এতটুকুও কোঁচকায় নি। যাক গে, ওর জুতো নিয়ে মাথা ব্যথা ক'রে কী হবে? মনে পড়ে গেল রাখালের, নিজেরও এক জোড়া জুতো তার চাই। প্রতিমা বলছিল, পিন্টুরও নাকি জুতো ছিঁড়ে গেছে। এ-মাসে আর হবে না। দিদির ছোট ছেলেটাকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হ'ল, তারপর আরো যেন কী কী···। যাক গে, জুতোর ব্যাপারটা দেখা যাবে সামনের মাসে।

তু' মিনিট কি এখনো হয় নি? কিন্তু লোকটা ভাবছে কী রাখালকে দেখে। এমন একটা অফিসার হয়তো কখনো সে দেখে নি। টেবিল ভর্তি ফাইল নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। সত্যিই, বড্ড বিসদৃশ হ'য়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। অনন্ত লোকটার যাবার মুহূর্ত অবশেষে যখন সত্যিই ঘনিয়ে এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে, তার আগেই ওকে কিছুটা কাজ দেখিয়ে দেওয়া যাক। সত্যিকারের কাজ না হয় নাই হ'ল, অন্তত কাজের একটু ভান দেখাতে দোষ কী? কিন্তু লোকটা যাবে কি সত্যিই, না এটাও আরো একটা ভাঁওতা? কতক্ষণ ধ'রেই তো শুনছে রাখাল—এই চললাম, আর পারছি না, ভয়ঙ্কর তাড়া, আর একটু দেখেই উঠব, ইত্যাদ

ইত্যাদি। কিন্তু উঠেছে কি? উল্টে ক্রমশই যেন আরো গ্যাঁট হ'য়ে বসছে। না, এ-বাছাধন বেলা সম্পূর্ণ না পড়া পর্যন্ত নড়ছেন না। নড়ুক আর নাই নড়ুক, এবার একটু কাজ করতেই হয় রাখালকে। এ-ভাবে নিষ্কর্মা হ'য়ে ব'সে থাকবে কতক্ষণ? লোকটা যে দেখছে। না দেখলেও বা দেখার ভান না করলেও নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছে অনেক কিছু। না, এবার রাখালের নিজেরই একটু লজ্জা লজ্জা করছে। অতএব···কিন্তু আজকে ঐ ফাইলগুলোর দিকে যেন তাকাতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। তবু তাকাতে হবে, অন্তত তাকাবার ভান করতে হবে। কিন্তু কেন, যদি নাই তাকায় রাখাল? যদি সে বলে: এই ছলনাটা নিজেকে নিজে আমি করব না, এই কলাটা নিজেকে নিজে আমি দেখাব না? আর এটা কি কলা দেখানো নয়? নয় যদি তো কলা দেখানো আর কাকে বলে? নিশ্চয়ই কলা দেখানো, আলবত কলা দেখানো। এটাকেই বলে নিজেকে নিজে কলা দেখানো। একটা হীন ব্যাপার, কাপুরুষোচিত। নিজেকে নিজের কাছে ছোট করা। আর এভাবে সারা জীবন মুখোশ প'রে থাকার দরকারটা কী। অন্যে কী ভাবছে তাই ভেবে ভয় পেয়ে কী লাভ? আরে বাবা, জীবনটা তো একটা বই নয়, একবার গেলে আর আসবে না। জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাস করে না রাখাল। আর ভেবে ছাখো, কী জিনিস জীবন, কী এক আশ্চর্য জিনিস। তবে? তবে সে কেন পলে পলে নড়তে চড়তে মুখোস পরবে, কেন নিজেকে নিজেই ছোট করবে, কেন সে হ'তে চাইবে না একেবারে নিজেরি মত? তাতে যদি অন্যে কিছু উল্টো পাল্টা ভাবে তো ভাবুক গে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মজাটা হচ্ছে এই যে হয়তো যে-অন্যের আমার সম্বন্ধে কিছু ভাবার ভাবনায় আমি সন্ত্রস্ত প্রতি মুহূর্তে, আমারি মতন যুদ্ধ করছে নিজেদের মুখোশের সঙ্গে। অতএব দরকারটা কী এ-সবের? সবাই যে যার মুখোশটা খুলে হ'য়ে যাক না কেন একেবারে যে-যার নিজেরই মত। এই মুহূর্তে

হ'য়ে যাক না রাখাল তার নিজেরই মত, বলুক না সে নিজেকে: না, এখন আমার ফাইল ঘাঁটতে যখন ইচ্ছে করছে না, তখন লোক দেখানোর জন্যে আমি সে-ফাইল ঘাঁটব না। এই প্রস্তাব যদি পৃথিবীর মনঃপূত না হয় তো পৃথিবী গোল্লায় যাক গে। কিন্তু পৃথিবী গোল্লায় গেলে পৃথিবীর অধিবাসী যে-রাখাল, সেও তো গোল্লায় যাবে। যদি যেতে হয় তো যাবে—গোল্লায়ও যেতে রাখাল প্রস্তুত, তবু নিজের কাছে নিজেকে ছোট করতে সে প্রস্তুত নয়। অন্তত আর নয়। অন্তত এই মুহূর্তে নয়। আর কোথাকার একটা কে, তার নেই ঠিক, সে কি ভাবছে না ভাবছে ভেবে আমি কেন অনর্থক নিজের কাছে নিজেকে খেলো হতে যাই? না না, রাখাল তা' পারবে না।

কিন্তু···মরুকগে। ক্ষতি কী কিছু কাজ করলে? এইভাবে বসে থাকতেও আর ভালো লাগছে না। আর দিনটা যখন নষ্ট হয়েছেই—মনের সে-ভাব তো আর এমনিতেই ফিরবে না আজ। অতএব···না, কিছু কাজ করাই যাক। আর তা' ছাড়া মাইনে পাওয়া চাকরী, এবং কাজ করার জন্যেই মাইনেটা পাওয়া এবং আপিসের ছুটি হ'তেও এখনো দেরী আছে। ঠিক অনুপ্রেরণা আসছে না? হ্যাঃ, এ-কাজের জন্যে আবার অনুপ্রেরণা। রাখালের মনে পড়ল মালার্মের কথা—সেই বিখ্যাত ফরাসী কবি, যিনি কবিতা লেখার জন্যেই কখনো অনুপ্রেরণার পথ চেয়ে ব'সে থাকেন নি। চেয়েছিলেন এমন সাধনা করতে যাতে অনুপ্রেরণাই হবে তাঁর দাস, তাকে ইচ্ছামত তিনি যখন-তখন আনতে পারবেন—লিখবেন যা খুসী, যখন খুসী। আসল কথা হচ্ছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। রাখালও না হ'তে চেয়েছে কবি, লিখতে চেয়েছে কবিতা? নাঃ, ফাইলগুলো এবার ধরা যাক—অন্তনঃ Most Immediate ট্রে-টা।

'আমাকে এবার উঠতেই হ'ল, বুঝলেন?'

'আজ্ঞে?' রাখাল যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

'আমি এবার উঠি। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আপনারও অজস্র সময় নষ্ট করলাম।'

বেশ একটু গদগদ হ'য়েই বললে রাখাল: 'আমাদের আবার সময়। আপিসের ব্যাপার মশাই, এরকম সময় তো আমাদের হরদমই নষ্ট হচ্ছে।'

'আচ্ছা, আপনাদের আপিসের সৌরেন সেন ঠিক কোন ঘরটাতে বসেন?'

'সৌরেন সেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে, ওনার ঘরটা ওপরে।'

'হ্যাঁ, তা' জানি। কিন্তু ঠিক কোনখানটা?'

'ওটা হবে আপনার···এই···'

'আচ্ছা থাক, আমি ওপরে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে নেব। আমার আর একটি অনুরোধ আছে।'

'বলুন।'

'মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যদি মণ্টুবাবু এসে পড়েন তো দয়া করে কি তাঁকে বলবেন যে আমি সৌরেনবাবুর ঘরে আছি?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি না আসেন? যদি ধরুন, তাঁর আসতে আসতে দশ মিনিট বা পনের মিনিট হ'য়ে গেল?'

'হুঁ, তবে···আচ্ছা দাঁড়ান, আরেকটা বন্দোবস্ত করা যাক। আপনাকে নিশ্চয়ই অযথা বিরক্ত করছি।'

'কিচ্ছু না।'

'ওপরে আমার খুব বেশিক্ষণ লাগবে ব'লে মনে হয় না। বলা যায় না, হয়তো মণ্টুবাবু সৌরেনবাবুর ঘরে ব'সেই অপেক্ষা করছেন। কিম্বা সৌরেন বাবু হয়তো জানতে পারেন, কোথায় আছেন মণ্টু-

বাবু। তা যদি হয় তো গণ্ডগোল চুকেই গেল। আর তা' যদি না হয় এখন থেকে ঠিক আরো দশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করব সৌরেনবাবুর কাছে। তার মধ্যে যদি আসেন…'

'…তো আমি মণ্টুবাবুকে খবরটা দিয়ে দেব।' ব'লেই হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিল রাখাল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই, এ আর শক্ত কী। আপনি আপনার নামটা লিখে রেখে যান।'

'রাখাল কাগজের ছোট প্যাডটা এগিয়ে দিল। লোকটি নাম লেখা শেষ হ'লে হাত যোড় ক'রে বললেঃ 'আচ্ছা চলি তবে। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

'সে কী কথা। ধন্যবাদ পাওয়ার মত করলাম কী বলুন? আচ্ছা নমস্কার।'

লোকটি বেরিয়ে গেল। এই প্রথম তাকে আপাদমস্তক দেখতে পেল রাখাল। হ্যাঁ, মাঝারি গোছের লম্বা বলা চলে। যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত গেল, এবং সেইটেই বড় কথা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাখাল।

প্যাডটাকে যথা স্থানে সরিয়ে রাখতে গিয়ে নামটার ওপর পড়ল। পরিষ্কার হাতে লেখাঃ জয়দ্রথ খাঁ। ভারী অস্বাভাবিক নাম তো। আর, নামটা যেন একটু চেনা-চেনা ঠেকছে—কোথায় যেন এ-নাম শুনেছে আগে রাখাল। কিন্তু, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। এত শিথিল তার স্মৃতিশক্তি। তবু দেখা যাক। মাথা নিচু ক'রে চুলের মধ্যে আঙুল বোলাতে আরম্ভ করল। হঠাৎ সে যেন ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। পরক্ষণেই মনে হ'ল, যাঃ, তাও কি সম্ভব, তা হ'লে তো চিনতেই পারতাম। অন্তত খানিকক্ষণের মধ্যে একটা প্রশ্ন তো জাগতই মনে। আর লোকটি ব'সেও ছিল ঘরে বেশ কিছুক্ষণ। আবার মনে হ'ল, কিন্তু জয়দ্রথ খাঁ, এ-নাম তো বাবা এ-জগতে দুটো লোকের হওয়া মুস্কিল। আর তাকে দেখেছেও

বহুকাল আগে—তাই এ্যাদ্দিন বাদে দেখা হওয়াতে দুজনের কেউই যদি কাউকে না চিনতে পেরে থাকে তো তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে ? তবে কি ভদ্রলোক সে-ই ? হয়তো। তবে কি উঠবে রাখাল, গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করবে ? পরক্ষণেই মনে হ'ল : কী দরকার—বেশ তো আছি ব'সে। সঙ্গে সঙ্গে অখুনি আবার মনে হ'ল : সে কী কথা, ছি ছি ছি, যদি সত্যিই সে-ই হয় তো একটু খোঁজ নেব না ?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাখাল। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরোল। প্রশস্ত বাহির দালানে গরমের আমেজ—আসন্ন অপরাহ্নের আভা ইতিমধ্যেই গেটের কাছে শিরীষ গাছটায়। এক জায়গায় অপিসের বাড়িরই কার্ণিসের একটা কোণ তার ভাঙাচোরা ছায়া ফেলেছে—ছায়াটার কতকটা তলার দিকে দেয়ালে, কতকটা যেন কেটে বেরিয়ে গিয়ে বঙ্কিম ভঙ্গীতে ধরা পড়ে গেছে আঙিনায় ক্যান্টিনের ছাদের ঢেউ খেলানো চালাটার ওপর। কিন্তু লোকটা গেল কোথায় ?

সিঁড়ির কাছে এসে ডান দিকে বেঁকতেই রাখাল তাকে দেখতে পেল। ওপরে উঠছে। রাখাল তাড়াতাড়িতে যেন একটু হাঁপিয়ে পড়েছে ডাকল : 'শুনুন।'

কে শুনছে ? লোকটা উঠেই চলেছে, হন হন ক'রে। দেখে মনে হয়, সত্যিই তাড়া আছে। রাখালও এতক্ষণে সিঁড়িতে পা দিয়েছে। এবার সে যথাসম্ভব চেঁচিয়েই ডাকল, ঘাড়টা উঁচু ক'রে :

'ও মশাই, শুনছেন ?'

তিন ॥ জোদ্দা

ভদ্রলোকের নাম তা' হ'লে রাখাল চক্রবর্তী, এবং বসেন মণ্টুবাবুরই ঘরে। ভালো, বসুনগে। অথচ আশ্চর্য, জোদ্দা কেন নাম শোনেনি এত দিন? মণ্টুবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লেই তো খালি আপিসের গল্প। এ-আপিস যেন ভূতে-পাওয়া আপিস, এখানে কাজ করলে যেন লোকের অন্য কিছু ভাবার ক্ষমতাই থাকে না। 'খালি আপিস আর আপিস। আপিসে এই হ'ল আর আপিসে ওই হ'ল। অমুকে এই বললেন, আর অমুকে ওই বললেন। আরে বাবা, আপিস ছাড়াও একটা প্রকাণ্ড পৃথিবী আছে বাইরে, যেখানে বহুলোকে বাস করে। এবং সেই সব অগুনতি লোক কোনোদিন কোনো আপিসে কাজ করবে না। তাদের কাছেও সর্বক্ষণ তোমার ঐ আপিসের কথা বলতে হবে? তোমার আপিসে কী হ'ল, তা শুনে তো তাদের জীবনটা ধন্য হ'য়ে যাবে। না, তবু তাদের শোনাতে হবে, কানটি ধ'রে শোনাতে হবে। হয়তো ঠিক ততটা কান ধ'রে শোনানো নয়, তবু শোনানো তো বটেই। যাকে এসব শোনাচ্ছি, তার তো ভারী ব'য়েই গেল-তা না জেনেই শোনানো, ঘ্যান ঘ্যান ক'রে শুনিয়ে চলা।

এই যেমন 'ভাই, বললে বিশ্বাসই করবেন না। সালা শুয়োরের বাচ্চা। বলে কিনা, কার্পেট না নিলে কি ছাড়বে? উঠতেই দেবে না। বেশী সৎ হবার চেষ্টা করলে হয়তো মেরেই বসবে। তাই কাশমিরী কার্পেটটা ঘাড়ে ক'রে নিয়েই আসতে হ'ল। ন্যাকামি করবার জায়গা পাওনি।'

এরকম আরো কত ঘটনা। এ-ঘটনাটা মনে পড়ল জোদ্দার বিশেষ ক'রে কারণ এই তো সেদিনই চোখ পাকিয়ে ও নানা রকম

হাত-মুখের ভঙ্গী ক'রে মণ্টুবাবু এই গল্পটি করছিলেন। রবিবার, সেদিন জোদ্দার ইস্কুল বন্ধ। মণ্টুবাবু যেমন প্রায়ই কলকাতা হ'তে বাবা-মাকে দেখতে আসেন ছুটিছাটায়, সেবারও এসেছেন। বেলা তিনটে হ'তেই গজাননের চায়ের দোকানে। সমস্ত সিউড়িতলা ঝিমোচ্ছে তখন। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ছোট সহরটা লুপ্ত। ঝিমোচ্ছিল গজাননও। এই গজা, গজা, উনুন ধরা'—তাকে ঠেলেঠুলে ঘুম থেকে তুলে মণ্টুবাবুর প্রবেশ। জোদ্দাও ছিল দলে, অবশ্যই। আর না থেকেই বা করবে কী? তাকেও তো ঘুম থেকে টেনে তুলে এনেছেন মণ্টুবাবু। এবং শিবনাথ মুখার্জী ওরফে ফোটনও ছিল। এবং ঘুম থেকে উঠে আসতে হ'লেও বড় একটা খেদ নিয়ে তারা কেউই আসে নি। কারণ হোক না আপিসের গল্প অথবা এটা-ওটা নিয়ে বাজে-বাজে তর্ক, মণ্টুবাবুর মত একটি লোকের সঙ্গ মাঝে মাঝে বেশ ভালোই লাগে—তা যেন এই অর্থহীন নিষ্কর্মা ছোট সহরের বিষণ্ণতা ও বিলুপ্তি হ'তে জেগে উঠতে সাহায্য করে। এই যেমন, যাদের কাঁচকলাভাতে খেয়ে দিন কাটে, হঠাৎ এক-আধদিন লংকামরিচ মেশানো পাঁপর পেলে তাদের যেমন মুখ বদলায়। এই আর কি।

'আমি ঘরে ঢুকেই ধরেছি, বুঝলেন?' বেঞ্চির ওপরে পা দুটো তুলে গ্যাঁট হ'য়ে বসলেন মণ্টুবাবু। 'বাপু ভাঙা-তোরঙ্গ ছেঁড়া-কাঁথার জীবন তোমার। তোমার ঘরে এমন ঝকঝকে কাশ্মিরী কার্পেটটি এলো কেমন ক'রে, হ্যাঃ?'

'সে কি দাদা, একেবারে কাশ্মিরী কার্পেট?' ফোটন একটু ফোড়ন দিল।

'নয়তো কি মিথ্যে বলছি নাকি? একেবারে সত্যিকারের কাশ্মিরী কার্পেট। শ্রীনগর থেকে আনা। তাতে কত লাল-নীল আঁকা টাকা, কত পাখি-টাখি, লতা-পাতা। একি আমাদের বিয়ে বাড়ির সতরঞ্চি পেয়েছ?'

'বাঃ, আপনি তো দাদা ধরেছেন ঠিক?' ফোটনের উক্তি।

'শোনো কথা। আরে বাবা, আমি ধরব না? আমার কাছে বাছাধন তুমি লুকোতো যাবে, তুমি আমার চোখে ধুলো দেবে? এ কি যে-সে মাল পেয়েছ? আমি কি একটা গোবরগণেশ নাকি? আর আমরা যেন ইনস্‌পেক্টরের চাকরী কোনোদিন করিনি, মা'র পেট থেকে প'ড়েই অফিসার হয়েছি। কী বলেন দাদা?'

'সত্যিই তো', আবার ফোড়ন কাটল ফোটন।

'বাপু, ঘুঘু চরিয়ে বেড়াতে হয়। পুঁতে দিলে গাছ হ'য়ে বেরোব। সেই আমার কাছে এসেছ তুমি ধাপ্পা দিতে। আমি ধরতে পারব না কাশ্মিরী কার্পেট, কোনটা কী আমি তা' চিনব না—এ্যাঁ, কী বলেন?'

'ও, লোকটা তাহ'লে তদন্ত করতে গিয়ে ঘুষ নিয়ে এসেছে?' ফোটন ফোড়ন দিয়েই চলেছে।

'আবার কী? ঘুষ নিয়েছে, বেশ করেছে। সকলেই নেয়। আমরা কি নিইনি একদিন?'

'তা হ'লে আর নেন না?' ফোটনের প্রশ্ন।

'থাক না, অত কথায় দরকারটা কী? শুধু এইটুকু ব'লে রাখি: এ-আপিসে সব সালা শূয়োরের বাচ্চা।'

ইত্যাদি, ইত্যাদি। মণ্টুবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লেই খালি আপিস আর আপিস, এবং কথায় কথায় কেবল বাপবাপান্ত। অবশ্য ভদ্রলোকের ঐ একটু মুখ-খারাপের অভ্যাস থাকা সত্বেও মানুষ হিসেবে তিনি যথার্থ সজ্জন ব্যক্তি—খাসা মানুষ। তাই স্বভাবত একটু নিরিবিলি চুপচাপ মেজাজের হ'য়েও জোদ্দার তাঁকে মন্দ লাগে না। এমন কি, ভালোই লাগে। তবে খালি ঐ আপিসের গল্প একটু শুনতেই হয়—কী আর করা যাবে?

এবং ঐ সব সময় আপিস নিয়ে বকর-বকর করা, ওটা হয়তো সব আপিসের কর্মচারীরাই ক'রে থাকে। এবং এটা এমন একটা

অদ্ভুত মনোবৃত্তি যা জোদ্দা কোনোদিন বুঝতে পারবে না, সেটাও সত্য। কারণ সে তো আপিসে কাজ করে নি কোনোদিন, এবং করবেও না কোনোদিন ভবিষ্যতে। ইস্কুল-মাষ্টারী তাকে সেই দুর্ভাগ্য হ'তে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত করেছে। অবশ্য দুর্ভাগ্য একটা কথার কথা। অনেকে তো আপিসের চাকরিকেই মহান সৌভাগ্য ব'লে মনে করে। এবং তারা হয়তো ঠিকই করে। কারণ উন্নতির সুযোগ তো আছে সেখানে, অন্তত আশাটা তো আছে। ঢোকার সময় না হয় ঢুকলাম কেরাণী হ'য়েই—তার মানে এই নয় যে সারা জীবন কেরাণীগিরি ক'রেই কাটবে, চাকরি হ'তে অবসর নেওয়ার সময় হয়তো একটা আণ্ডার সেক্রেটারী কিম্বা অন্তত একটা সুপারিণ্টেণ্ডেট টুপারিণ্টেণ্ডেট গোছের কিছু হ'তে পারার আশা। তো রাখা চলে। একেবারে নেহাত কপালমন্দ না হ'লে অথবা তার ছোটকাকার মত একেবারে নেহাত্ অপদার্থ বা অকর্মন্য না হ'লে সারা জীবন কাজ করার পর একশোবিশ টাকা মাইনের চাকরি হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম, এ-রকম কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। তার ছোটকাকার ক্ষেত্রে অবশ্য ঘটেছে, তবে তার ছোটকাকাটিও একটি অতি বিশিষ্ট জীব। আর তা ছাড়া জোদ্দা কি নিজেই তার কর্মজীবনের প্রারম্ভে আপিসের চাকরিতে ঢুকতে চায় নি? সেও তো এককালে কত হাঁটাহাঁটি করেছে, কত জায়গায় কত দরখাস্ত করেছে। কোনো জায়গায় কিছু হ'ল না বলেই তো শেষে এই ইস্কুলের চাকরিটা নেওয়া।

হ্যাঁ, আর সেই বিদেশী কোম্পানির চাকরিটা, যেটা সে পেয়ে প্রায় গিয়েছিল বললেই হয়, কিন্তু এমনি কপাল মন্দ যে একেবারে শেষ মুহূর্তে সেটা হাত থেকে ফসকে গেল। সেই চাকরিটার কথা ভাবলে এখনো জোদ্দার বুকটায় মোচড় দিয়ে উঠে। তার জীবনটাই যেত পাল্টে। হাতে আসত কাঁচা পয়সা। কলকাতার অনেক ভাগ্যবান ছেলে-ছোকরার মত সেও ঘুরতে পারত কোট

প্যাণ্ট প'রে, ট্যাক্সি হাঁকিয়ে। বলা যায় না, এতদিন হয়তো একটা গাড়িই কিনে ফেলত। যাক সে, সে ভেবে আর লাভ কী। তবে বুকটায় মোচড় দেয়। অবশ্য এখন আগের চেয়ে অনেক কম। স'য়ে গেছে। অন্য ধরণের জীবন-যাত্রায় সে এখন নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এতটা মানিয়ে নিয়েছে যে এখন মনে হয় বর্তমানের এই জীবন ধারাটাই যেন চেয়েছিল। বলা যায় না হয়তো সত্যিই এই রকমই একটা জীবন সে নিজের অজান্তে চেয়ে এসেছিল গোড়া হ'তেই। চেয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, যা পেয়েছে তার জন্যে সে বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ। তবে ঐ বিদেশী কোম্পানির চাকরিটার জন্যে কি সে এককালে ঘোরাঘুরি করে নি? খুব করেছে, লালায়িত হ'য়েই করেছে।

যাক গে। কিন্তু সরকারী আপিসে কোথাও একটা কিছু মিললেও সে ব'র্তে যেত! অন্তত সেই সময়টায়। তাও হয় নি। হ'ত অবশ্য নিশ্চয়ই, যদি সে অপেক্ষা করতে পারত, যদি আরো কিছুদিন ধৈর্য ধ'রে তার দৌড়োদৌড়ি করার সামর্থ্য থাকত। অথবা যদি তার কারুর সঙ্গে জানাশোনা থাকত, কোনো আপিসের কোনো হেড ক্লার্ক-টার্ক হ'ত তার অন্তত দূরসম্পর্কীয় কোনো জ্ঞাতি-ভাই-টাই। একটা কেরাণীর চাকরি কোথাও-না-কোথাও জুটে কি তার যেত না? নিশ্চয়ই যেত। কিন্তু সে-গুড়ে বালি প্রথম হ'তেই, কোথাও কোনো জানা-শোনা জোদ্দার ছিল না। আর, অপেক্ষা করতেও সে পারেনি, কারণ বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। বিধবা মা ও দশ বছরের ছোট বোনটির ভার পড়ল তার ওপর। মাত্র উনিশ বছর বয়স তখন তার। ভাগ্যে বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে পেরেছিল সেই বছরেই, বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই। তবে এরকম ঘটনা আর বাঙালী পরিবারে নতুন কী? নিত্যই হচ্ছে। এবং ইস্কুলের চাকরিটা মিলেও ছিল ঝট ক'রে, বি-এ পরীক্ষার ফল বেরোনোর দু-তিন মাসের মধ্যেই। চাকরিটায় অসুবিধে

অবশ্য অনেক ছিল, প্রথম হ'তেই। যেমন, মফঃস্বলের ইস্কুল, কলকাতায় কাজে-অকাজে খুশীমত আসা-যাওয়া করা মুস্কিল, ইত্যাদি! তবে এ-ধরণের অসুবিধে সময়ের সঙ্গে স'য়ে যায়, জোদ্দারও স'য়ে গেছে। তার আর কোনো অভিযোগ নেই, না চাকরির বিরুদ্ধে, না তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু ঐ ভাগ্য নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠল কিনা, যে ইস্কুল-মাস্টারি তাকে আপিসে চাকরি করার দুর্ভাগ্য হ'তে বঞ্চিত করেছে—তাই কথায় মনে পড়ল, তার নিজের ভাগ্যটাও এমন কিছু উজ্জ্বল নয়, বরং আপিসে যারা ঢোকে তাদের তুলনায় তার সেই ভাগ্যটা হয়তো বেশ একটু নিষ্প্রভই ঠেকা উচিত। কারণ এই চাকরিতে বড় জোর কদ্দূর সে ওঠার ভরসা রাখে? হেডমাস্টার পর্যন্ত? হয়তো—কিন্তু তা কপালে যদি থাকে তো তবেই, নইলে নয়, আপনা থেকে নয়। ভাগ্যে মাস্টারি করতে করতে সে প্রাইভেট-এ এম-এ পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে পেরেছিল। সুতরাং একদিন হেডমাস্টার হওয়ার আশা যে নেই, এমন নয়! কিন্তু সেই তার মই-এর সর্বোচ্চ ধাপ। হেডমাস্টারের পদের ওপর আর কিছু পাওয়ার আশা সে কোনো দিনই করতে পারে না। এবং হেডমাস্টারের পদটা পেয়েই যায় অবশেষে একদিন, তাতেই বা তার ভাগ্যটা এমন কী খুলবে? কত টাকাই বা মাইনে হবে তার? অবশ্য চেষ্টা চরিত্র করে অন্য কোনো ভালো ইস্কুলে একটু বেশি মাইনের চাকরি নিয়ে চ'লে যাওয়াও যায়। কিন্তু তাতেই বা কী? মাইনেতে কত টাকারই বা এদিক-ওদিক হবে?

অবশ্য এ-ধরণের যুক্তি একেবারেই গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়, কারণ মাইনেটা নিশ্চয়ই সব নয় কারুর জীবনে, সেটা নিশ্চয়ই কারুর ভাগ্য নয়। আসল ভাগ্য হ'ল জীবনে আমি সুখী অথবা ভাগ্যবান, এই কথা মনে করতে পারা। বেশি মাইনের চাকরি অনেক দেখেছে জোদ্দা, তাদের ক'জন নিজেদের সুখী

মনে করে? একজনও নয়। সবাই ছুটছে, আরো চাই, আরো প্রতিপত্তি চাই—মুহূর্তের জন্যে নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। এ যেন জীবনব্যাপী এক ঘোড়দৌড়। সেই ছোটার দুর্ভাগ্য হ'তে জোদ্দার এই অতি অল্প মাইনের ইস্কুলমাস্টারি তাকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত ক'রে ধন্য করেছে। তার তা ছাড়া অল্প মাইনে সত্ত্বেও চাকরিটায় খানিকটা তৃপ্তি পাওয়ার নানান কারণও আছে। এই যেমন, ইস্কুলটা গত বছরে স্কুল ফাইন্যালে তিন তিনটে স্কলারশিপ পেয়েছে। এ-রকম কাণ্ড আগে ঘটেনি। এতে শিক্ষকরা গৌরব বোধ করবে না? এ তো তাদেরই সম্মিলিত চেষ্টার ফল। অর্থকষ্ট অবশ্য আছে একটু, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা কিছু খারাপ নয়, বরং একদিক দিয়ে সেটা একটু থাকাই যেন বাঞ্ছনীয়। এদেশে অর্থকষ্টের বোধ হ'তে যারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত, তাদের চেয়ে মহাপাতক আর কি কেউ আছে? দুঃখের একটা গৌরব আছে, এবং যে-দেশে প্রায় শতকরা একশোজনই দুঃখী, সেখানে সেই প্রকাণ্ড দুঃখের একটুখানির আমিও অংশীদার, এ-কথা ভাবতে পারার একটা সার্থক সান্ত্বনার ভাব আছে। অর্থকষ্টের বোধ মানুষকে মানুষ হ'তে সাহায্য করে, আর সেই বোধের সম্পূর্ণ অভাব প্রায় সব ক্ষেত্রেই মানুষকে অমানুষ ক'রে তোলে। অন্তত সে রকমই জোদ্দার মনে হয়েছে বহু বার, তার দুঃখাকুল জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতায়।

যাক্ গে, কীই বা সুখ আর কীই বা দুঃখ? জীবনের পথে চলতে চলতে সবই মুছে যায়। কিন্তু এই রাখাল চক্রবর্তীটি কে? মণ্টুবাবুর সঙ্গে আলাপ তো জোদ্দার খুব কম দিনের নয়। তাঁর মুখে আপিস সম্বন্ধে এত গল্পগুজবের মধ্যেও এই রাখাল চক্রবর্তীর নামটি ওঠেনি কেন একটিবারও, কোনো আলোচনাতেই? এই কী সম্ভব? জোদ্দার মনে হ'ল, এটা একটা ভাববার মতো কথা হয়তো। এমন কি তার কোন একটা সন্দেহ পর্যন্ত হ'ল:

বলা যায় না, হয়তো ব্যাপারটি বেশ রহস্যময়। রহস্যময় না হ'লেও অন্তত বেশ একটু ধোঁকা লাগানো। কারণ মণ্টুবাবু এমন দিলদরিয়া মাই-ডিয়ার লোক, কত ধরণের কত যে কথা উনি সব সময় বক বক ক'রে ব'কেই চলেন, তার যেন ইয়ত্তা নেই। ভদ্রলোকের পেটে কোনো কথা থাকে ব'লে মনে হয় না। এবং এ-ধরণের আড্ডা-আলোচনায় মণ্টুবাবুর মুখ থেকে কত নামই না শুনেছে জোদ্দা। এই যেমন সৌরেন সেন তার সঙ্গে চোখে দেখার আলাপটা তো ঘটল মাত্র গতকাল, কিন্তু তার কত আগে থেকে এই সৌরেন সেনের নাম শুনে আসছে জোদ্দা। ভদ্রলোক যেন ঘরের লোক হয়ে গেছেন। আর শুধু সৌরেন সেনই বা কেন, অবিনাশবাবু, চপলাকান্ত বাবু, পঞ্চানন বাঁড়ুয্যে, এদের কারুর সঙ্গেই তো এখনো চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি রে বাবা। অথচ তাঁরা সকলেই তো এই আপিসের লোক, এবং তাদের সম্বন্ধে এতদিন ধরে এত গল্প শুনেছে জোদ্দা যে এখন যেন দেখা হলেই ব'লে দিতে পারবে: এই পান-চিবোনা ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক হচ্ছেন পঞ্চানন বাঁড়ুয্যে, অথবা ঐ যে ভদ্রলোক হঠাৎ হেসে উঠলেন হো হো ক'রে, মাথায় টাক, হাতে নস্যির কৌটো, উনি চপলাকান্তবাবু না হ'য়েই যান না। কিন্তু রাখাল চক্রবর্তী, এ-নামটা শোনেনি কেন একবারও? আর ভদ্রলোক বসেন কিনা একেবারে মণ্টুবাবুরই ঘরে? না হয়তো নামটা উঠেছে কোনো প্রসঙ্গে, কিন্তু জোদ্দাই কান দেয় নি? অথবা এমনও তো হতে পারে যে ভদ্রলোক হয়তো সবে বদলি হ'য়ে এসেছেন? কিম্বা, মণ্টুবাবুর সঙ্গে এই এক ঘরে বসার ঘটনাটির সূত্রপাত অতি অল্পদিন থেকেই?

হঠাৎ জোদ্দার মনে হল, এদের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই তো? হয়তো মণ্টুবাবু লোকটাকে পছন্দ করে না, আর লোকটাও মণ্টুবাবুর সঙ্গ তেমন প্রীতিদায়ক ব'লে মনে করে না। তাই

হয়তো মণ্টুবাবুর মুখে কোনোদিনই লোকটার নাম শোনে নি। এবং সেই কারণেই হয়তো এরা দুজনে এক ঘরে আর বসতে চায় না, হয়তো এরা বিভিন্ন ঘরে বসার জন্যে এর মধ্যেই আবেদন ঠুকে দিয়েছে। এবং হয়তো সেই কারণেই কোনো জরুরী কাজের অছিলায় ভদ্রলোক মণ্টুবাবুকে বাইরে পাঠিয়ে এখন নিজে একলা ঘরে ব'সে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। হ'তে তো পারে, সবই হ'তে পারে। আর এখন ভাঁওতা দেওয়া, বোকা সাজা: কই, মণ্টুবাবু কোথায় গেছেন জানি না তো, এই একটু বসুন না, এসে পড়লেন ব'লে, আপনাকে কি সত্যিই বলেছিলেন এই সময় আসতে?

আরে আরে, জোদ্দার হ'ল কী? মাথাটা কি খারাপ হ'য়ে গেছে? এ-সব কী ভাবছে সে? এ-রকম ভাবনা তার মাথার মধ্যে ঢুকল কেমন ক'রে? সে কি পাগল হ'য়ে গেল? না পাগল হ'তে চলেছে? ছি ছি ছি, একটা কৃতজ্ঞতাবোধ পর্যন্ত নেই? মণ্টুবাবু যদি বাইরে গিয়ে থাকে, সেটা কি ঐ ভদ্রলোকের দোষ? তিনি তার কী করবেন? আর তিনি এ-সব ব্যাপারের জানেনই বা কী? কী কথা হয়েছে তার সঙ্গে মণ্টুবাবুর, তার এই সব একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার ও ঝামেলা, এ-সবের তিনি কী জানাবেন? ভদ্রলোক এমন আপ্যায়িত ক'রে ঘরে বসালেন, এটা ওটা পড়তে দিতে চাইলেন, এ-গল্প সে-গল্প ক'রে সময় কাটাতে চাইলেন, আর তার বদলে কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা, সে কি না তাঁর সম্বন্ধে এই সমস্ত যত উদ্ভট খারাপ কথা ভাবছে? আর তুমি কী করলে, শ্রীমান জয়দ্রথ খাঁ, ওরফে জোদ্দা? তুমি গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে লোকটার মহামূল্য সময় দিব্যি নষ্ট ক'রে গেলে। লোকটাকে একটা ফাইল পর্যন্ত ছুঁতে দিলে না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন, হয়তো কেউ সামনে ব'সে থাকলে কাজ করতে পারেন না মনোযোগ দিয়ে। এ-রকম অনেকে আছে—

সবাই তো আর জোদ্দার মত নয়। জোদ্দা যখন পরীক্ষার খাতা দেখে, কত লোকে এসে বিরক্ত করে, কিন্তু তাতে তার কিছুই যায় আসে না। অঙ্কের খাতা পর্যন্ত গল্প শুনতে শুনতে দিব্যি দেখে যায়, কোথাও ঠিক নম্বরটি বসাতে একবারও ভুল হয় না। আর ভদ্রলোকের এই কাজ আর জোদ্দার কাজও আলাদা। এ তো আর ইস্কুলের খাতা দেখা নয়। এ আরো অনেক বড় ব্যাপার, এবং প্রায় ক্ষেত্রেই আরো অনেক দরকারী ব্যাপার। নিশ্চয়ই ঐ আর্জেণ্ট মার্কা ফাইলগুলোর মধ্যে অন্তত কোনোটা-কোনোটা বেশ গুরুত্বওলা ফাইল ছিল। কত রকম ব্যাপার নিয়ে এঁদের ঘাঁটতে হয়, কত চিন্তা করতে হয়, কত সিদ্ধান্তে আসতে হয়। এ-সব সম্বন্ধে গল্প তো অনেক শুনেছে জোদ্দা মণ্টুবাবুর কাছে। আর ভদ্রলোক সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজে, তাঁর মহামূল্য সময় নষ্ট ক'রে এই যে জোদ্দা এতক্ষণ ঘরটায় ব'সে রইল, তাকে যে ভদ্রলোক এতক্ষণ ধ'রে তাঁর ঘরে অনর্থক ব'সে থাকতে দিলেন, না-না-না-না-না, ছি-ছি-ছি-ছি-ছি, ভদ্রলোক তার মনের কথা জানতে পারলে তার সম্বন্ধে ভাববেন কী? ভাববেন একটা নেমকহারাম, একটা অসভ্য মানব সমাজে বাস করার একটা অযোগ্য জীব।

মণ্টুবাবু বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন কিছু ব'লে যান নি—তাই স্বভাবতই ভদ্রলোক জানেন না কোথায় মণ্টুবাবু গিয়ে থাকতে পারেন বা কটা নাগাদ তিনি ফিরতে পারেন। এই তো ব্যাপার, এর বেশি তো আর কিছু নয়। তবে এ-সব শত্রুতার প্রসঙ্গ মনে আসে কী ক'রে? আর শত্রুই যদি হত এই দুটো লোক, তাহলে মণ্টুবাবুর মুখে এ-সম্বন্ধে কিছু না শুনে থাকার উপায় কি ছিল? মাইডিয়ার লোক বটে, কিন্তু কী মুখখানি মণ্টুবাবুর। একেবারে মধু-ঝরা। যাকে পছন্দ করেন না, তাকে পেলেই যেন ছিঁড়ে খান। অন্তত আড়ালে তো তার গুষ্টি সুদ্ধ তিনি ওপড়াবেনই বসে ব'সে। 'শালা, শূয়োরের বাচ্চা, আমায় বলে কিনা—', ইত্যাদি। আপিসের

সেই কে এক অবিনাশ পোদ্দার, সে না কি কবে কী করতে গিয়েছিল মণ্টুবাবুর, তার গল্প তো আজও শোনে সিউড়িতলায়। অথচ সিউড়িতলায় কে-ই বা সেই অবিনাশ পোদ্দারকে চোখে দেখেছে? না, রাখাল চক্রবর্তী সঙ্গে মণ্টুবাবুর কোনো শত্রুতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সে-রকম তুচ্ছতম কোনো মনকষাকষিও যদি থাকত, তবে এতদিন ঐ রাখাল চক্রবর্তীর চোদ্দ পুরুষ বহুবার উদ্ধার হ'য়ে যেতেন গজাননের রেষ্টুরেণ্টে।

আর ঐ যে কোনো অছিলায় মণ্টুবাবুকে একটু বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা, সেটাও একটা কী অসম্ভব আজগুবি ভাবনা। এ-রকম কাণ্ড কি কেউ কখনো শুনেছে? এ কি কখনো হয়, না হ'তে পারে? কথা নেই বার্তা নেই, একটা অফিসার আরেকটা অফিসারকে খামাখা বাইরে পাঠিয়ে দেবে? আর এই রোদ্দুরে, এই নারকীয় প্যাচপেচে ঘামে, গুমট ভ্যাপ্সা দুপুরে? এই জঘন্য গরমে হাতে কাজ থাকলেও লোকে সেটা ফেলে রাখতে চায়, অন্তত যতক্ষণ পারে—এ তো আর ঘরের গুমট থেকে হাওয়া খাওয়ার জন্যে বাইরে যাওয়া নয়। আর তা ছাড়া লোকটার সে-রকম কোনো উদ্ভট অভিসন্ধি যদি থেকেও থাকে—না হয় ধ'রেই নেওয়া গেল যে লোকটার সে-রকম কোনো অভিসন্ধি সত্যিই ছিল—তো মণ্টুবাবু তার কথায় কান দিতে যাবে কেন? মণ্টুবাবু কি যে সে লোক, না সিউড়িতলার পেঁচো পাগলা? পেঁচো সকলের বেগার খেটে বেড়ায়, কারণ সে পেঁচো, কারণ সে আধপাগলা, কারণ তার কাজ নেই, কম্ম নেই, পয়সা নেই, কিচ্ছু নেই। আর তার একটা চোখও কানা। কিন্তু সে পেঁচো, আর এ মণ্টুবাবু। যাও না একবার মাথায় হাত বুলোতে মণ্টুবাবুর, দেখবে তোমার হাতের দশাটা কী হয়। গালাগালির চোটে তিনি তোমার পেট খারাপ করিয়ে ছাড়বেন। আর লোকটা কি মণ্টুবাবুর মনিব যে সে যা খুসী আবোলতাবোল বললেই যোড়হাতে মণ্টুবাবুর তা তখনি

শুনতে হবে? এবং না শুনলে তাঁর চাকরী চ'লে যাওয়ার ভয় থাকবে? মনিবের প্রসঙ্গই যদি ওঠে তো এ-আপিসে রাখাল চক্রবর্তী যত বড় মনিব, মণ্টুবাবুও তত বড় মনিব। তবে?

তবে মণ্টুবাবুর মুখটা সত্যিই খুবই খারাপ, হৃদয়টা যাই হোক। এবং মণ্টুবাবুকে যারা মাত্র ওপর-ওপর চেনে, তারা ঐ মুখখানা দেখেই ঘাবড়ে যায়, হৃদয়টা খুঁজে বার করার কষ্ট নেয় না। কেনই বা নেবে, কী যায় আসে? কিন্তু একবার সেই হৃদয়টার একটু আভাস পেলে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা পালটে যায়। তবে সেটা তো আর একদিনে হয় না, সময় লাগে। তাঁকে চিনতে জোদ্দারও কি কিছু কম সময় লেগেছে? প্রথম প্রথম যখন তাঁর কথায় কথায় 'সালা' আর 'শূয়োরের বাচ্চা' আর 'গুখেগোর ব্যাটা' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে যেত, তখন কতবার জোদ্দারও তো মনে হয়েছে এই অসভ্য অপদার্থ লোকটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কী ক'রে। এই ধরণের কথাবার্তা শোনার অভ্যাস জোদ্দার বড় একটা ছিল না আগে, এবং গোড়ার দিকে সে নিশ্চয়ই খুবই অস্বস্তি বোধ করত। এখনো যে এই ধরনের গালাগালি শুনতে সে সম্পূর্ণ ধাতস্থ হ'য়ে উঠেছে, তা নয়। তবে ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের অন্য কতকগুলো দিকেরও সন্ধান সে পেয়েছে। এবং তাঁর মনে হয়েছে যে এমন কোনো কোনো লোক আছে যাদের অষ্টপ্রহর গালাগালি না দিতে পারলে যেন ভাত হজম হয় না। যেমন, এমন বহু লোক আছে যারা খাবারের সময় পাঁচ দশটা কাঁচা লঙ্কা চিবোবেই। মুখখারাপটা তাই অনেক সময় নেহাতই একটা ধাতের বা অভ্যাসের ব্যাপার, তার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। এবং মণ্টুবাবুকে দিয়ে যদি বিচার করা যায় তো বলতেই হবে যে যারা সাধারণত অত্যন্ত বেশি মুখখারাপ করে, হৃদয়ে-হৃদয়ে তারা সকলেই নিষ্পাপ, ও তারা সকলেই ভালো লোক। কারণ মণ্টুবাবু আসলে একজন যথার্থ ভালো লোক।

কিন্তু হ্যাঁ, মুখটি খারাপ, খুবই খারাপ। তাই হয়তো হ'তেও পারে যে ভদ্রলোক এখনো ঠিক চিনে ওঠবার অবকাশ পাননি মণ্টুবাবুকে, এবং তাই হয়তো তিনি তাকে পছন্দ করেন না। বিশেষ ক'রে তিনি যদি এসে থাকেন কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবার হ'তে, তাঁর বাবা বা খুড়ো বা জ্যাঠা কোনো আই-সি-এস-টাই-সি-এস, এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা হ'য়ে থাকে বড় বড় ইস্কুল-কলেজে। তবে তো কথাই নেই। ঐ সব অনর্গল 'সালা' আর 'শূয়োরের বাচ্চা' আর 'হারামী' শুনলেই তো তাঁর পিলে চমকে যাবে। বলা যায় না, হয়তো তাঁকেই একদিন মণ্টুবাবু কিছু একটা ব'লে বসেছেন একেবারে সামনাসামনি। হ'তে কি পারে না? সবই হ'তে পারে! মণ্টুবাবু কি কাউকে ছেড়ে কথা কন? তবে সে-রকম হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু কম। সামনাসামনি একজন সমানপদস্থ সহকর্মীকে তিনি কতকগুলো বাজে অভিবাদনে অসম্মানিত করবেন, এমন আহাম্মক মণ্টুবাবু নন। অন্তত এ-ধরনের কোনো ঘটনা জোদ্দার চোখে তো পড়ে নি আজ পর্যন্ত। আর রাখাল চক্রবর্তী যদি বড় ঘর থেকেই এসে থাকে, তার মানেও এ নয় যে সে খারাপ কথা শুনতে কিছুতেই অভ্যস্ত নয়। অনেক সময় ঐ ধরনের বড় ঘরের ছেলেরাই চরম বখাটে হয়। তারা যে ধরনের খারাপ কথা বলতে পারে বা খারাপ কাণ্ড করতে পারে, চুনো-পুঁটি আড্ডাবাজদের কীর্তি তার ধারে কাছেও ঘেঁষে না। তা ছাড়া অত কথার দরকারই বা কী? মণ্টুবাবু নিজেই কি আসেন নি জমিদার পরিবার হতে: অতএব?

মরুক গে, এ-সব কী আবোলতাবোল ভাবছে জোদ্দা? এর কোনো সার্থকতা নেই, এর কোনো দরকার নেই, এবং এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো সত্য নেই, কোনো ভিত্তি নেই। এ এক দুঃস্থ মনের স্বগতোক্তি, এক নীরব প্রলাপ। কারণ না-হয় ধ'রেই নেওয়া গেল যে রাখাল চক্রবর্তী মণ্টুবাবুকে পছন্দ করে না, হয় তাঁর মিষ্টভাষণের জন্যে, নয় তাঁর ব্যবহারের জন্যে, নয়তো কোনো একটা

অজ্ঞাত ঘটনার জন্যে। তাই সে তাঁকে আজ দুপুরে খানিকক্ষণের জন্যে ঘর থেকে তাড়াতে চাইল কোনো একটা অছিলা দেখিয়ে। কিন্তু তাঁর হাত থেকে এই ধরনের মাত্র খানিকক্ষণের জন্যে রেহাই পাওয়ায় ভদ্রলোকের লাভটা কী, যখন দুজনকে এক সঙ্গে বসতেই হবে দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস? তবে কি লোকটা চায় না যে মণ্টুবাবুর সঙ্গে জোদ্দার দেখা হয়, এবং তাই তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে ঠিক সময়টি বুঝে? কিন্তু তাও বা কী ক'রে হয়? জোদ্দা তার কী করেছে, তার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে? জোদ্দা কস্মীন কালেও কারুর কিছু করে নি, সে কারুর কোনো পাকা ধানে মই দেয় নি—তার কোন শত্রু নেই, অন্তত তার জানতে তো নেই। আর এই অচেনা অপরিচিত লোকটা আজ হঠাৎ তার শত্রুতা করতে চাইবে, তার শত্রু হ'তে চাইবে? কী অসম্ভব কথা। এমনও যদি হয় যে লোকটা কারুর ভালো সহ্য করতে পারে না বা কারুর কিছু ভালো হয়, তা দুচোখ দিয়ে দেখতে পারে না, ও তাই সে প্রাণপণে ঠেকাতে চেয়েছে জোদ্দার সঙ্গে মণ্টুবাবুর এই অতি জরুরী সাক্ষাৎটি, তো স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে: লোকটা জানল কী ক'রে? সে কী জানে জোদ্দার? এবং কেনই বা সে জানতে চাইবে? আর তা ছাড়া, যা সবচেয়ে বড় কথা, তা' হচ্ছে মণ্টুবাবুকে ভাগাবার লোকটা কে? তাঁকে ভাগাতে চাইলেই কি তিনি ভাগবেন? না, মণ্টুবাবু যদি বেরিয়ে থাকেন তো নিজে থেকেই বেরিয়েছেন, লোকটার কথায় নয়। এবং লোকটাকে যেটুকু দেখেছে জোদ্দা, তাতে কিছুতেই মনে হয় না যে তার কোনো দুরভিসন্ধি আছে। বরং তার ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সজ্জন।

কিন্তু মণ্টুবাবু নিজে থেকে বেরিয়ে গেলেন? এমন কাণ্ডটা তিনি কী ক'রে করতে পারলেন? রাগে গা জ্ব'লে যায়। রাগের চেয়ে যা বড় কথা তা হচ্ছে, এখন জোদ্দা করবে কী? এ কী

সমস্যায় ফেললেন তাকে মণ্টুবাবু? ছি-ছি-ছি, ভদ্রলোকের একটা কথার দাম নেই? আর এত বড় একটা কথা, এত বড় একটা কারণ। সমস্ত জীবনটাই এখন উল্টে-পাল্টে যেতে পারে। ভদ্রলোক কি তাঁর কথার গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি? এত খেলো লোকটা? বুঝতে পারেননি যে তাঁর সেই কথার ওপর কত বড় নির্ভর করবে জোদ্দা? আর ইচ্ছেই যদি না ছিল তো সোজাসুজি বললেই পারতেন: 'না ভাই, এর থেকে আমাকে বাদ দিন, আমার অন্য জরুরী কাজ আছে।' ব্যস, ল্যাটা চুকে যেত, জোদ্দা অন্য কাউকে খুঁজে নিত। লোকের অভাব কি এই কলকাতায়, না সিউড়িতলায়? সে তো তাঁর পায়ে প'ড়ে নাছোড়বান্দা হয় নি। আর সব ব্যাপারেই জোদ্দার এক স্বাভাবিক কুণ্ঠা, জোরজবরদস্তি করা তার প্রকৃতিতেই নয়। বিশেষ ক'রে এই রকম এক ব্যাপারে। সে যদি সব খুলে বলতে গিয়ে থাকে মণ্টুবাবুর কাছে, বা সৌরেন সেনের কাছে, বা অন্য কারুর কাছে, তো তা তার স্পষ্টবাদিতার দৌড় দেখানোর জন্যে নয়, তার বেপরোয়া ভাব বা মনের সাহস দেখানোর জন্যে নয়। ঢাক পিটোনো তার পেশা নয়। তবু সে এঁদের কাছে গিয়েছে, বলেছে, কারণ তখনি-তখনি অন্য কোনো উপায়ের কথা তার মাথায় ঠিক আসে নি। আর বলতে তো হতই কাউকে না কাউকে, নইলে কাজ হাঁসিল হবে কেমন ক'রে? এবং বলতেই যখন হবে কাউকে, তখন মণ্টুবাবুকে কেন নয়? মণ্টুবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় খুব অল্প দিনের নয়, ও তাঁর সঙ্গে তার বেশ একটু মাখামাখিও হ'য়ে গেছে। তাই। আর সৌরেন সেন? সৌরেন সেনকে সে বলতে যায় নি। সৌরেন সেনকে বলতে গেলে সে চেনেই না, যদিও তার গল্প বহু শুনেছে মণ্টুবাবুর কাছে। কিন্তু মণ্টুবাবু নিজেই যে পরামর্শ দিলেন, বললেন সৌরেন সেন নাকি বন্ধু লোক, খুব মাই-ডিয়ার লোক, এবং ভালো লোক। আর তা ছাড়া যখন জোদ্দা

ব্যাপারটাকে যদ্দুর সম্ভব তার পরিচিত গোষ্ঠীর জানাজানি-কানাকানির বাইরে রাখতে চায়, তো সৌরেন সেন নয় কেন? অন্তত মণ্টুবাবু তো বলেছিলেন এই রকমই। এবং শুনে জোদ্দার তেমন খারাপও লাগে নি। তাই সে তক্ষণি রাজী হ'য়ে যায়, এবং গতকাল সন্ধ্যায় মণ্টুবাবার সঙ্গে গিয়ে হাজির হয় সৌরেন সেনের কালীঘাটের বাড়িতে। কথাবার্তা বললেন মণ্টুবাবুই, জোদ্দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া, সব যথাসম্ভব খুলে পরিষ্কার ক'রে বলা। এবং সৌরেন সেনও অমায়িক লোক, সঙ্গে সঙ্গে রাজী। 'এই বুড়ো বয়সেও আপনার এত কুণ্ঠা কিসের, মশাই?'—মণ্টুবাবু প্রশ্ন করেন জোদ্দাকে। 'আপনি কি মেয়ে, না এক ষোড়শী-সপ্তদশী? ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, না; আপনাদের দেখে পটলিরা গেরুয়া পরে না কেন?

পটলিটা আবার কে?—না থাকতে পেরে একদিন জিজ্ঞেস ক'রে বসে জোদ্দা। কারণ ঐ পটলির প্রসঙ্গ বহুবার শুনেছে সে মণ্টুবাবুর মুখে। 'সে কি মশাই, পটলিকে চিনলেন না, তো জীবনে করলেন কী? খালি অঙ্কের খাতা দেখলেন? ছ্যা ছ্যা, আপনারা মশাই জীবনটায় ঘেন্না ধরিয়ে দিলেন। পটলি কে জানেন? সে হচ্ছে 'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।' আরো বলব? সব মেয়ে হ'ল পটলি—বিশেষ ক'রে সব শালী যারা সবে চোদ্দ পেরিয়েছে। তারা দেখবেন হঠাৎ রাতারাতি কী রকম পটলি ব'নে যায়। বুকে দুটি ছোট ছোট ঢিবি, তা দেখিয়ে দেখিয়ে শাড়ির তলায় নাচিয়ে নাচিয়ে বেড়ানো, চোখে হঠাৎ-হঠাৎ একটু উদাস দৃষ্টি, পটলচেরা চোখ, সব শালীরই যেন তখন হ'য়ে যায় পটলচেরা চোখ, তাই পটলি। কী যেন সেই বলেছিলেন কালিদাস, 'শ্রেণীভারাদলসগমনা' না কী? ঐ দেখুন দেখুন, ঐ একটা পটলি যাচ্ছে।'—ব'লে মণ্টুবাবু আঙুল দিয়ে দেখালেন গজাননের রেষ্টুরেণ্ট থেকে খানিকটা দূরে একটি মেয়ের দিকে।

হ্যাঁ, একটু খানি কুণ্ঠা, সব ব্যাপারেই একটু ইতস্ততের ভাব, বিশেষ ক'রে যখন মুখ ফুটে বলার কথা ওঠে, একটু লজ্জা, তা' জোদ্দার স্বভাবের মধ্যেই আছে। কী আর করা যাবে। সব লোক তো আর একরকম হয় না। তাই ব্যাপারটা যাতে আগে থাকতে জানাজানি না হ'য়ে যায়, সে-সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সাবধান হয়েছে। তার সে-সতর্কতাকে একটু বাড়াবাড়িই বলা চলতে পারে। কারণ এত কী ভয় রে বাবা। জানাজানি হবে না? হ'য়ে যাক না ব্যাপারটা একবার, তখন সবাই জানবে। তবু, যতক্ষণ জিনিসটা না হচ্ছে, ততক্ষণ সে-সম্বন্ধে কেউ কিছু জানুক বা তা নিয়ে কানাকানি করুক, এটা জোদ্দার খুব মনঃপূত কখনো হয় নি। তাই এত লোকের সঙ্গে তো পরিচয় জোদ্দার, সিউড়িতলায় এত লোক, এত সহকর্মী শিক্ষক, ছাত্র, পাড়াপড়শী, হাটে-বাজারে দৈনন্দিন এত লোককেই তো বলতে হয় 'কী খবর? ভালো?—কিন্তু তাদের কে কী জেনেছে? একেবারে কিচ্ছু না। এতদূরে চমৎকার সাফল্যের সঙ্গে বইয়ে এনেছে সে ব্যাপারটাকে, আর আজ শেষ মুহূর্তে তীরে এসে তরী ডুববে? এ কী করলেন মণ্টুবাবু?

যদি না হয়, যদি কেঁচে যায় ব্যাপারটা? না—না, এত বড় সর্বনাশকে সে মাথা পেতে মেনে নিতে পারবে কেমন করে? এর চেয়ে, যে বজ্র ছিল ভালো। দালানটা দিয়ে হন হন ক'রে চলতে গিয়ে হঠাৎ জোদ্দার মনে হ'ল, সে যেন সর্ষে ফুল দেখছে চোখে। তার পা কাঁপছে। এদিকে ওকে সে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। ও দাঁড়িয়েই আছে, হয়তো খটখটে রোদ্দুরে। ও তো কিছু জানে না। ও আশা ক'রে আছে। সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপছে জোদ্দার চোখে। এ কী হ'ল? যদি না হয়? নিজের ওপর কেমন একটা রাগও হ'তে লাগল জোদ্দার। এ-ভাবে তাড়াহুড়ো ক'রে শেষ মুহূর্তে সব করতে যাওয়া হয়তো ঠিক উচিত হয় নি তার। যা হয়তো উচিত ছিল করা, তা' অনেক আগে

থেকে সব বন্দোবস্ত ক'রে রাখা, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে। বলা উচিত ছিল বহু আগেই দুটি একটি অতি বিশ্বস্ত লোককে, যাদের ওপর ওরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারত। আর ওর পরামর্শ নেওয়াটাও হয়তো জোদ্দার উচিত ছিল, নিশ্চয়ই উচিত ছিল। কই, ওর কী মতামত, তা তো জোদ্দা একবারও জিজ্ঞেস ক'রে দেখে নি। যেন ব্যাপারটা জোদ্দার একলারই, ও কেউই নয়। আরও এতবড় বিশ্বাস করে জোদ্দাকে, এমন নিশ্চিন্তে নির্ভর করে তার ওপর। এখন ওকে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে জোদ্দা, ওর কাছে ফিরে গিয়ে সে কী বলবে? বলবে কি, 'ওদের কাউকেই পেলাম না, ওরা নেই। অতএব, কিছুই হবে না।' কোন মুখে সে এ-কথা বলবে? এর চেয়ে যে তার মরণও ভালো। আর সে বাঁচবে কার জন্যেই বা, নিজের জন্যে? সেই নিজের জীবনটাই তো গেল। আর কী থাকবে সেই জীবনে? শুধু একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা। শুধু ছাত্র ঠেঙিয়ে মাসান্তে গোটা কয়েক টাকা রোজগার করা, ও তাই দিয়ে বছরের পর বছর শরীটাকে কোনো রকমে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিছুদিন আগে পর্যন্ত না হয় সংসারের বেশ খানিকটা ঝক্কি ছিল, তার একটা দায়িত্ব ছিল। নিজের জন্যে না হোক, অন্তত পরের জন্যে তার বেঁচে থাকার একটা প্রচণ্ড দরকার ছিল। কিন্তু এখন? সংসারের ঝক্কি যা কিছু ছিল, তা সব ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছে। আর কে আছে তার? শুধু সে নিজে। ঠিক এমন একটি সময়ে বিধাতা তাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আশীর্বাদ করলেন। তার জীবন হঠাৎ যেন একটা মহান অর্থ পেতে চলল। কিন্তু তা যে হ'য়ে হ'য়েও হ'ল না বলে মনে হচ্ছে—হয়তো ফ'সকে গেল। আর তা যদি সত্যিই ফ'সকে যায়, ও তাকে ফিরে যেতে হয় আবার সেই শূন্যতায়, তো তবু তাকে বেঁচে চলতে হবে? এবং এত সত্ত্বেও যদি তাকে এভাবে বেঁচে চলতে হয় তো আরেকজন কি দূর থেকে তাকে প্রতিমুহূর্তে ধিক্কার

দেবে না, তাকে ঘৃণা করবে না, তাকে মনে মনে বলবে না অমানুষ, অপদার্থ, একটা ভীরু, কাপুরুষ, একটা অকৃতার্থ অন্তঃসারহীন মানুষ? বলবে সে, নিশ্চয়ই বলবে। কেন সে বলবে না? জোদ্দা যদি প্রথম হ'তেই আরো একটু সাহসী হত, কয়েকজনকে খুলে বলতে পারত ব্যাপারটা সম্বন্ধে, অন্যভাবে বুদ্ধি ক'রে এগোত, তো হয়তো সবই ঠিক হ'য়ে যেত। কারণ হয়তো সত্যিই তীরে এসে তরী ডুবল এখন, হয়তো সত্যিই শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। এতদিন ধ'রে এত আশা করা, এত কল্পনা আঁটা—মুহূর্তের মধ্যে সব ফাঁক। যেমন ফাঁক এই অপদার্থ দালানটা, এই নিরর্থক নিষ্ঠুর খটখটে রোদ্দুরটা, এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরটা। এ কী হ'ল, এ কী করলেন মণ্টু-বাবু? আর সৌরেন সেনও যদি না থাকে? বলা যায় না, হয়তো সেও বেরিয়েছে। হয়তো ওরা দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে প'ড়েছে, জোদ্দাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, অথবা শুধুই একটু ঠাট্টা করতে জোদ্দাকে। কিন্তু কী অমানুষিক, পৈশাচিক, কী প্রচণ্ড বদরুচির হবে সেই ঠাট্টা! আর সৌরেন সেন যদি নাও বেরিয়ে থাকে, সে যদি তার কথামত এখন ঘরেই ব'সে থাকে জোদ্দার অপেক্ষা ক'রে, তাইতেই বা কী? একজনকে দিয়ে তো আর হবে না।

কিন্তু না না না, এ যে হ'তে পারে না—এ-কথা জোদ্দা বিশ্বাস করবে কী ক'রে? মণ্টুবাবু নির্ভরযোগ্য লোক নন, এমন কথা তার কোনোদিন মনে হয় নি। ভদ্রলোক আমুদে প্রকৃতির, হেসেই আছেন, ক্রমাগত ঠাট্টাই ক'রে চলেছেন, কিন্তু সেটা তো তাঁর বাইরের রূপ। ভেতরে ভেতরে মানুষটা অত্যন্ত সহৃদয়, পরের জন্যে সর্বদা সমবেদনশীল। তাঁর সেই ভিতরকার যথার্থ রূপটির আভাস বহুবার কি পায় নি জোদ্দা ইতিমধ্যেই? তবে? আর তা-ই যদি হয় তো তিনি কেন জোদ্দাকে আজ এমন একটা ছলনা করবেন, বিশেষ ক'রে তার জীবনের এই প্রচণ্ড মুহূর্তে? এবং ছলনা করারই ইচ্ছে

যদি তাঁর ছিল প্রথম থেকে, তো তিনি কেন নিজে ট্রাম খরচা দিয়ে জোদ্দাকে কাল নিয়ে গেলেন সৌরেন সেনের বাড়ি? শুধু কি তাই? প্রধানত জোদ্দারই কারণে গত শনিবারই তিনি সিউড়িতলা পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ রাখলেন। অবশ্য প্রতি শনিবারেই যে তিনি সিউড়িতলা রওনা হন, তা' নয়। এই তো কিছুদিন আগেই বলছিলেন, কলকাতায় একটা সংসার আছে, যেটা তাঁর নিজের সংসার—সেটা ফেলে তো আর সর্বদা তিনি দৌড়োতে পারেন না বাবা-মাকে দেখতে। আর প্রতিবার সপরিবারে যাওয়াটাও সম্ভব হয় না। কিন্তু জোদ্দা জানে, এই শনিবার তাঁর যাওয়ার কথা ছিল পাকাপাকি, এবং তিনি যান নি শুধু জোদ্দারই কারণে। বলেছিলেন, 'সামনের শনিবার বেশ সকলে আরামসে যাওয়া যাবে, কী বলেন? আপনারাও থাকবেন, দলটা ভারী হবে।'

তাই মনে হয়, হয়তো কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে কোথাও—শুধু জোদ্দাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যেই মণ্টুবাবু ইচ্ছে ক'রে এই সময়টায় উধাও হ'য়ে যান নি। আর আশ্চর্য, রাখাল চক্রবর্তী যা' বলল, তাতে মনে হয় ভদ্রলোক সারাদিনই ঘরে ছিলেন, বেরিয়ে গেছেন মাত্র একটু আগে। তবে কি তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি যে ব্যাপারটা আজকেই? বুঝতে কি কিছু ভুল ক'রে বসেছেন? জোদ্দার বুকটা ছাঁত ক'রে উঠল। কী কথা ঠিক হয়েছিল?

চোখে পড়ল গতকালের সাঙ্গুভেলী রেষ্টুরেণ্ট, টালিগঞ্জের ব্রিজটার কাছে। ভেতরে লোক গিজ গিজ করছে, এমনিতেই আলো-বাতাস আসবার উপায় কম, তার ওপর সিগারেটের ধোঁওয়ার কল্যাণে দু'হাত দূরের মানুষকেও কেমন এক অশরীর প্রেতআত্মার মত ঠেকে। জমাট ঘামের গন্ধে ছোট ঘরটা ভরপুর। আর লোকের কী অজস্র অনর্গল, অনর্থক বকর-বকর। জোদ্দা পাঁচ মিনিট আগে থেকে এসে ব'সে আছে। একলাই এসেছে, ওকে

আনে নি। কারণ এই গরমে কেন ওকে খামাখা টানাহিঁচড়া করা? মণ্টুবাবু পৌঁছোলেন ঠিক সময়ে। মাত্র দুদিন আগে জোদ্দা তাঁকে সব বলেছে। শুনে তো ভদ্রলোক চমকে উঠেছিলেন। সে কি খাঁ সাহেব? বিনা মেঘে বজ্রঘাত। কী আক্কেল মশাই আপনার, আগে বলতে কী হয়েছিল? এখন আমার সিউড়িতলা যাওয়াটা কেঁচিয়ে দিলেন তো? দেখি, বাবাকে একটা তার পাঠাতে হয় এখুনি।'

রেষ্টুরেণ্টে ব'সে একথা-সেকথা হ'ল, আজকের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা পাকাপাকি ক'রে নিল জোদ্দা।

'হ্যাঁ, ঐ দুটো নাগাদই আসবেন—আমি ঘরেই থাকি,' মণ্টুবাবু বললেন। 'আর তেমন তেমন তাড়া থাকলে আগেও আসতে পারেন। কেন, দুটো হ'লে কি খুব দেরী হ'য়ে যাবে না কি?'

'না না, একেবারে ঠিক হবে। কিন্তু এলেই আপনাকে পাব তো?'

'দেখুন কথা। আমাকে আবার না পাবাব কী আছে? বলে না, ভগবান দশচক্রে ভূত হয়েছিলেন, আব আমায় আপনাব কল্যাণে অবশেষে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল। আপনার হাত থেকে রেহাই কি পাব মশাই? আপনি তো ছাড়বার পাত্র নন।'

'এ দেখুন আপনি কী বলছেন। এ তো কাঠগড়া নয়, এ ··

'জানি রে বাবা, জানি, ঐ একই হ'ল।'

'কিন্তু কাল। ভুলবেন না যেন।'

'আচ্ছা জ্বালালেন তো খাঁ সাহেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল। অর্থাৎ আগামী কল্য সোমবার।'

অতএব? দিনের বা তারিখের বা সময়ের কোনো ভুল হ'তে পারে না। ভদ্রলোক বেরিয়েছেন খুব ভালো ক'রে জেনেই যে জোদ্দাকে তিনি আসতে বলেছেন দুটো নাগাদ, এবং তাকে বেরোতে

হবে জোদ্দার সঙ্গে তখুনি তখুনি। এ-রহস্যের একমাত্র ব্যাখ্যা হ'তে পারে এই যে ভদ্রলোক না বেরিয়ে পারেন নি—কারণটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত জরুরী, এবং যেখানে গেছেন, সেখানে তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে আটকা পড়ে গেছেন। কিন্তু তাই যদি হবে তো তিনি জানাবেন না কেন রাখাল চক্রবর্তীকে? তিনি কি তাহলে ফোন ক'রে তাঁর সহকর্মীকে বলতেন না যে রাখালবাবু, আমি একটু আটকা প'ড়ে গেছি এখানে—জয়দ্রথ খাঁ ব'লে একটি লোক আসবে আমার কাছে, সে এলে দয়া ক'রে তাঁকে খানিকক্ষণ বসতে বলবেন? না, যেখানে গেছেন সেখানে ফোন করার সুবিধে নেই? ফোন করার সুবিধা যদি নাও থাকে তো অন্তত আশে পাশের কোনো জায়গা বা দোকান হ'তে কি ফোন করতে পারতেন না? আর তিনি জানেন ভালো ক'রেই যে তাঁর দেখা না পেয়ে জোদ্দা কী রকম বিচলিত হবে। অথবা, হয়তো এমন হয়েছে যে রাস্তায় তিনি কোনো গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছেন, সে তাঁকে জবরদস্তি ক'রে কোথাও ধ'রে নিয়ে গেছে? যাঃ, তিনি কি ছেলেমানুষ যে তাঁকে কাবুলি-ওয়ালায় ধরবে? তাহলে তাঁর জন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না তো?

হঠাৎ জোদ্দার মনে হ'ল, রাখাল চক্রবর্তী কেন অত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ্যাকসিডেন্টের কথা পাড়ছিল? লোকটার মতলবটা কী? ও কি জানে আগে থেকেই যে মন্টুবাবুর কিছু একটা হয়েছে, ও তাই খবরটা চাপতে চায় জোদ্দার কাছে, ও সেইজন্যেই নানান অছিলায় এ্যাক্সিডেন্টের প্রসঙ্গ পেড়ে জোদ্দার মনটাকে তৈরি ক'রে রাখতে চায়? এত কী এ্যাক্সিডেন্টের কথা রে বাবা। কোথায় কোন্ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের একবার কী হয়েছিল, তা জেনে জোদ্দার কি চারটে হাত পা বেরোবে? অবশ্য ঐ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেটার জন্যে কষ্ট নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু এ-ধরনের ব্যাপার তো কলকাতা সহরে নিত্যই হচ্ছে। সে-সব গল্প অমন বিস্তারিত ক'রে জোদ্দাকে শোনানো কেন? একটা লোককে চেনে না, জানে না, তাকে

কোনদিন দেখেনি, এসেছে আরেকজনের কাছে—এবং সেই অপর লোকটির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি তাকে খামাখা কতকগুলো ভয়াবহ এ্যাক্সিডেন্টের গল্প শুনিয়ে ভড়কে দেবে? এ কী অন্যায় কথা। জোদ্দা যেন এখানে এসেছে সময় কাটাতে, এই ধরনের কতকগুলো গল্প না শুনলে যেন তার চলছিল না। যেন তার জীবনটা একেবারে ফুলের ওপর বিছানো, দুঃখ কাকে বলে তা তো সে কখনো জানে নি—দুর্ঘটনা ব'লে যে একটা শব্দ থাকতে পারে অভিধানে, তাও যেন তার কখনো মনে হয় নি। এবং তাই যেন সে এখানে এসেছে তার জ্ঞানবৃদ্ধি করার জন্যে। আর কলকাতার মতন জায়গায় এ্যাক্সিডেন্ট হবে না? বলে সিউড়িতলা, যেটা প্রায় একটা ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর, যেখানে বাজারের সামনের বড় রাস্তাটাতেই দিনে সবসুদ্ধ ক'টা গাড়ি চলে তা আঙুলে গুণে বলা যায়, সেখানেও তো এ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই তো মাস দুয়েক আগেই সিউড়িতলায় একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে। একজন মোটর সাইকেল চ'ড়ে ফট-ফট্ করতে করতে জোরে মোড় বেঁকতে গেছে, আর ওদিকের রাস্তা থেকে একটা পেল্লায় লরী এসে তাকে ধাক্কা মারল। লোকটার মাথা গুঁড়িয়ে ছাতু হ'য়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কোথায় এ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না আজকাল। আর কলকাতায় হবে না?

হঠাৎ আর একটা ভাবনা মাথায় এল জোদ্দার। লোকটা একটা পত্রিকা পড়তে দিয়েছিল না? কী যেন একটা সিনেমার পত্রিকা? জোদ্দা অবশ্য ভালো ক'রে পড়ে নি, তেমন চোখও বোলায় নি, শুধু একটু উল্টে-পাল্টে দেখেছিল মাত্র। পড়ার মতন মন তখন জোদ্দার ছিল না, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল মন্টুবাবুর—চোখ চলছিল বার বার দরজার দিকে, কান দুটি খাড়া পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে। মনের অস্থিরতাটাকে প্রাণপণে চেপে একটা বাহ্যিক নির্বিকার ভাব আনবার চেষ্টা করছিল মুখে। কিন্তু এখন যেন মনে পড়ছে, ঐ

পত্রিকাটায় কিসের একটা ছবি তার নজরে পড়েছিল, হয়তো একটা এ্যাক্সিডেণ্টের ছবিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই একটা এ্যাক্সিডেণ্টেই ছবি। দুটো মোটর গাড়ি গায়ে-গা-লাগানো, থামা অবস্থায়, এবং একটা লোক রাস্তার ওপর আস্তিন গুটিয়ে আরেকটা লোকের সঙ্গে তেড়ে কথা বলছে। তখন তত খেয়াল করে নি জোদ্দা কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে এখন একটু ভালো করে ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, ছবিটা নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা সংক্রান্ত। ধাক্কা লেগেছিল। হয়তো দুটো গাড়িতে, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ঐ দুটো গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে—তাই ভুলটা যে-গাড়ির চালকের, তাকে অন্য গাড়ির চালক রাস্তায় নেমে ধমকাতে সুরু করেছে। পাশে ম'রে-ট'রে কেউ পড়েছিল না তো? হয়তো ছিল, কিন্তু জোদ্দার এখন ঠিক স্মরণে আসছে না। ছবিটা আরো ভালো ক'রে তার দেখা উচিত ছিল। সত্যি, বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। নিজের ভাবনায় তখন সে এত মশগুল যে ছবিটা যেন সে দেখেও ত্যাখেনি। চোখ পড়েছে, কিন্তু মন পড়েনি। তবে যাই হোক, কেউ ম'রে প'ড়ে থাকুক আর নাই থাকুক, ছবিটা যে একটা মোটর দুর্ঘটনার ছবি, সে-বিষয়ে জোদ্দার এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ছবিটা কোনো একটা সিনেমার ঘটনা—হয় কোনো চলতি বই-এরই বিজ্ঞাপন, নয় তো হয়তো কোনো আসন্ন মুক্তি-প্রতিক্ষারত ছায়াছবির একটা শুটিং-এর ফটো। সিনেমা-টিনেমা জোদ্দা বড় একটা দেখে না, খুব কদাচিৎই দেখে—পত্রিকাটায় তার মন না দিতে পারার হয়তো সেটাও একটা কারণ।

কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটা কি খুব অর্থপূর্ণ নয়? তুমি কেন জোদ্দাকে এমন একটি পত্রিকা পড়তে দিলে? পড়তেই যদি কিছু দিতে চেয়ে থাকে তো খবরের কাগজ কী দোষ করেছিল? এই ধরনের কোনো উপলক্ষে—যখন একটা আগন্তুক ঘরে এসে ঢোকে, অন্য কারুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকে, তখন লোকে সাধারণত খবরের কাগজ-টাগজই পড়তে দেয়। অথবা

কিছুই দেয় না পড়তে। পড়তে দেওয়ার দরকারটা কী? আর এত বড় একটা আপিস তোমার, এত বড় একটা অফিসার তুমি, তোমার ঘরে একটা খবরের কাগজ নেই? নিশ্চয়ই আছে—একটা কেন, দশটা খবরের কাগজ আছে। কিন্তু তা তো তুমি পড়তে দিলে না। তুমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, মনে মনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করার পর, অনেক ফন্দী এঁটে ও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে একটা সিনেমার পত্রিকা বার ক'রে এনে হাতে তুলে দিলে। এবং কেমন পত্রিকা সেটি? যে-পত্রিকাটিতে একটি দুর্ঘটনার ছবি আছে। একটি কেন, হয়তো তাতে বহু ছবি আছে দুর্ঘটনার—আরো ভয়ঙ্কর সব ছবি। বলা যায় না, হয়তো সমস্ত পত্রিকাটাই দুর্ঘটনা সংক্রান্ত—ওটা হয়তো একটা বিশেষ সংখ্যা, দুর্ঘটনাবিষয়ক যত ছবি সম্প্রতি হয়েছে বা হচ্ছে, তারি ওপর লেখা-হয়তো, নয়, নিশ্চয়ই এটা দুর্ঘটনার ওপর একটা বিশেষ সংখ্যা।

হ্যাঁ রাখাল চক্রবর্তী, এতক্ষণে তোমার ফন্দীটি যেন আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে। তবে কি জোদ্দা ফিরে যাবে ঘরটায়, সোজাসুজি লোকটাকে জিজ্ঞেস ক'রে বসবে? কারণ কতক্ষণ এভাবে ওকে ধাপ্পা দিতে পারবে লোকটা? জোদ্দা যাবে লোকটার কাছে ফিরে, গিয়ে জিজ্ঞেস করবে: 'আপনি দয়া ক'রে বলুন, কোথায় মণ্টুবাবু গিয়েছেন, কখন ফিরবেন তিনি, তাঁর কী হয়েছে?'

ও যদি বলে, 'জানি না'—যেমন ও আগেই বলেছে এবং আবার নিশ্চয়ই বলবে, কারণ কম ধুরন্ধর লোক কি ও?—তো জোদ্দা বলবে: 'আপনি জানেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আমি জানি, আপনি জানেন। নইলে শুধু শুধু কি আপনি আমাকে এত এ্যাক্সিডেণ্টের গল্প বললেন, শুধু শুধুই কি ঐ পত্রিকাটা আমায় পড়তে দিলেন? আপনি কি মনে করছেন যে আমি এত বড় একটা বোকা, গাধা, অন্ধ? এ-সবের কী অর্থ, আমি তা' বুঝতে পারি না? আর আপনি না জানলে জানবে কে? আপনি ওর সঙ্গে এক ঘরে

বসেন, লোকটা হঠাৎ আপিসের কাজের সময় বেরিয়ে গেল এবং বাইরে রয়েছে এতক্ষণ ধ'রে, আর যাবার আগে আপনাকে কিছু বলে গেল না? এত বড় একটা অবিশ্বাস্য কথা আপনি আমায় বুঝিয়ে দেবেন, আর তাই শুনে ভালো ছেলের মত কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রে আমি গুটি গুটি ক'রে চ'লে যাব, এ কি কখনো হয়? আর আমি এখানে আসি নি। আমার যে প্রচণ্ড দরকার, আমাকে যেতে গেলে যে মণ্টুবাবুকে সঙ্গে ক'রে যেতে হবে। আর মণ্টুবাবু নিজেই তা অত্যন্ত ভালো ক'রে জানেন। এবং তিনি অতীব সজ্জন ব্যক্তি, ও আমি তাঁর বন্ধু। আমার এমন একটা সময়ে তিনি আমাকে কিছুতেই নিরাশ করবেন না। নিরাশ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি নিজেই আমাকে কথা দিয়েছেন। এবং আমি জানি যে তাঁর কথার দাম আছে! এমন একটা লোক এমন একটা কথা দিয়ে ঠিক সমটায় হঠাৎ বেরিয়ে চ'লে যাবে আর আপনি যে-ঘরে ব'সে আছেন, ওর সহকর্মী ও বন্ধু, সেই আপনাকে একটা কথাও সে ব'লে যাবে না, এত বড় একটা অসম্ভব ঘটনা কি ঘটে, না তাকে সম্ভব ব'লে আপনি বিশ্বাস করতে চান? আসলে লোকটার কিছু হয়েছে, এবং আপনি তা জানেন, কেবল আমাকে বলতে চান না। কিন্তু আপনার অমন স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলি? ঐ এ্যাক্সিডেণ্টের গল্প আর পত্রিকার ব্যাপারটা? দেখছেন না, আমি যে ধ'রে ফেলেছি, আমার আর বুঝতে বাকী নেই? এখন আমায় ব'লে ফেলুন, পরিষ্কার ক'রে। তাঁর তেমন খারাপই যদি কিছু ঘ'টে থাকে তো সেটা না জানার থেকে আমার জানাই ভালো। আসলে আমি এটাও জানি যে আপনি জানেন যে আমি আসব। কারণ মণ্টুবাবু সে-কথা আপনাকে ব'লে গেছেন। কিন্তু আপনি যেটা জানেন না—মণ্টুবাবু সেটা আপনাকে নিশ্চয়ই ব'লে যান নি—তা হচ্ছে, কোন দরকারে আমি এসেছি মণ্টুবাবুর কাছে, কোন্ কারণে মণ্টুবাবু আমাকে এখন আসতে বলেছিলেন। তাই হয়তো

আপনার পক্ষে বোঝা ঠিক সম্ভব হচ্ছে না, কেন মণ্টুবাবুর সম্বন্ধে সত্যি খবরটা জানতে আমার এত আগ্রহ। আমি যে সন্দেহে আর তুলতে পারছি না। ব'লে ফেলুন।'

তা সত্ত্বেও যদি না বলে, তা সত্ত্বেও যদি লোকটার মুখ না খোলানো যায়? তো জোদ্দা তার পায়ে পড়বে। হয়েছে কী? কাকুতি-মিনতি করবে। বলবেঃ 'আমার এমন বিপদ। আমার সমস্ত জীবন এর ওপর নির্ভর করছে। দয়া ক'রে বলুন।' এততেও লোকটার হৃদয় গলবে না, এত বড় পাষাণ নাকি?

কিন্তু কেন সে একটা অচেনা-অজানা লোকের পায়ে পড়তে যাবে, যা কখনো করে নি তাই করবে? সে না মানুষ? কিন্তু এদিকে যে জোদ্দার জীবন সংকট, পায়ে না পড়লে লোকটা যদি না বলে? পায়ে পড়তে দোষ কী? না—না—না, পায়ে-ফায়ে পড়তে সে পারবে না, কারুর পায়ে যে কখনো পড়ে নি। তার মাথা উঁচু রাখতেই হবে। তবে কি বাবের মত গিয়ে ভয় দেখাবে, বলবেঃ যদি না বলেন তো···?' কিন্তু ভয় দেখানো-টেখানোও তার ধাতে পোষায় না, ঝগড়া-ঝাটি কথা-কাটাকাটি সে কখনো পছন্দ করে না। কারুর সঙ্গে মারধোরটোর সে জীবনে করে নি। আর আজ করবে? এতটা নিচে সে নিজেকে নামাতে যাবে হঠাৎ? তার সঙ্গে যে মন্দ ব্যবহার কেউ কখনো করে নি, তা নয়—কিন্তু প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার সে নিজে কখনো করে নি, অন্তত তার মনে তো পড়ে না। একবার মনে আছে, ছেলেবেলায়, ফকির ব'লে একটা মুসলমান ছেলে থাকত পাড়ায়। তাদেরই সমবয়সী। ছেলেটার বেশ কতকগুলো সাঙ্গপাঙ্গও ছিল—সবাই মুসলমান। এবং ছেলেটা তার দলবল নিয়ে খালি লোকের অত্যাচার ক'রে বেড়াত। গালাগাল দিত, মারধোর করত, অন্য ছেলের ঘুঁড়ি জোচ্চুরি ক'রে কেটে কেড়ে নিত, ইত্যাদি। একদিন জোদ্দা হঠাৎ সেই ফকিরের সামনে প'ড়ে যায়। কথা নেই বার্তা

নেই, শয়তানটা এসে তার কান মুলে দিলে, আর তার ঠোঁটের ওপর থুক ক'রে থুথু ফেলে বললেঃ 'উল্লুক, তোর জাত খেলাম! যা, তোর বাপকে গিয়ে বলগে যা।' রাগে-ঘৃণায় জোদ্দার সমস্ত শরীরটা রি রি ক'রে উঠেছিল। তারপর হ'তে সে দূর থেকে কখনো ফকিরকে দেখতে পেলে তক্ষুনি অন্য রাস্তা নিত। ভয়ে নয়, কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণায়। এমন একটা কাণ্ড ঘ'টে গেছে একদিন, সেটা সে যেন ভুলে যেতে পারলে বাঁচে। কারুর গায়ে হাত তোলা বা কাউকে মারা বা কাউকে অসভ্য গালাগালি দেওয়া, এসবকে সে চিরকাল পাশবিক ব'লে ভেবে এসেছে। এসব যারা করে, তারা নিজেদের অপমান করে। এবং একটা মানুষ নিজেকে এইভাবে অপমান করছে, তা' যেন আর একটা যথার্থ মানুষ চোখ দিয়ে দেখতে পারে না। জোদ্দার তো অন্তত এই রকমই মনে হয়েছে। ছেলেবেলায় ইস্কুলে থাকতেও মনে পড়ে মাস্টারদের হাতে সে কত কিল-চড় গাঁট্টা খেয়েছে। কতবার তাকে কান ধ'রে এক-পা তুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে হয়েছে। সেসব ভাবলে আজো তার দুঃখ হয়, কেমন একটা করুণা জাগে! সে-দুঃখ বা সে-করুণা ততটা তার নিজের ওপর নয়, যতটা সেই সব মাস্টারদের ওপর। তাইতো আজ সে যখন নিজেই মাস্টার হয়েছে, কোনো ছেলের গায়ে সে হাত তোলে না। ধমকায়, কিন্তু শারীরিক অত্যাচার কখনো করে না। ঝগড়াঝাটি বা চেঁচামেচি বা মারামারির গন্ধ যেখানে, সেখান হ'তে সে মাইলখানেক দূরে থাকতে চায়। এমন অনেক লোক আছে যারা রাস্তায় ভিড় জমতে দেখলেই কাছে গিয়ে উঁকি মারার কৌতুহলটি ছাড়তে পারে না। তারপর গিয়ে যদি দ্যাখে যে সেখানে একটা তর্কাতর্কি লেগেছে বা একটা লোক আর একটা লোককে মারধোর করার উপক্রম করছে তো তাদের কী আনন্দ! সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে ওঠে; ধরো শালাকে, মারো শালাকে।' কেউ বা চুপ ক'রে

দাঁড়িয়ে ত্যাখে অধীর আগ্রহ নিয়ে, কেউ বা কোনো চক্ষু লজ্জার ধার না ধেরে সরাসরিই হেঁকে ওঠে: 'মারুন না দাদা, অত দাঁড়িয়ে দেখছেন কী? শালাকে টেনে মারুন না একটা থাপ্পড়।' কেউ কাউকে থাপ্পড় মারবে, তাতে আর এক এজনের কী পৈশাচিক, কী অনাবশ্যক আনন্দ—তার হৃদয়টা যেন ধেই-ধেই ক'রে নাচতে থাকে। মানুষ কখনো-কখনো কী রকম অমানুষ হতে পরে, কী ঘৃণিত কদর্য ব্যবহারে সে আনন্দ পায়। না—না, এ-সব জোদ্দার কোনোদিন পোষায় নি, আজো পোষাবে না।

আর তা ছাড়াও, রাখাল চক্রবর্তীকে গিয়ে যে সে ভয় দেখাবে, তার কি সে-শক্তি আছে? এটা না রাখাল চক্রবর্তীরই আপিস? এটা একটা সরকারী আপিস, ভারত সরকারের আপিস, আর এই আপিসে রাখাল চক্রবর্তী একজন অফিসার। পিওন নয়, কেরাণী নয়, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নয়, অফিসার। তার অধীনে কত লোকে কাজ করছে, সেই সব লোকের ভবিষ্যত তার ওপর নির্ভর করছে, তারা তাই মিষ্ট কথায় তার মন যুগিয়ে চলছে সর্বক্ষণ। সে একবার ঘণ্টা টিপলে দুটো-তিনটে পিওন ছুটে আসে সঙ্গে সঙ্গে। আর তুমি কে শ্রীমান জয়দ্রথ খাঁ, ওরফে জোদ্দা? কোন্ সরকারী আপিসে তুমি কাজ কর, কোথাকার অফিসার তুমি? তুমি একটা অল্প পরিচিত ছোট্ট সহরের এক নগণ্য ইস্কুল-মাস্টার, একটা সম্পূর্ণ বাইরের লোক, এসেছ এই আপিসে নিজের কিছু স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। আর এতবড় আস্পর্দ্ধা হবে তোমার যে তুমি ভয় দেখাতে যাবে এখানকার একটা অফিসারকে? বলিহারি কল্পনা। এ কি তোমার মামার বাড়ির আব্দার পেয়েছ না কি? আর এমন আস্পর্দ্ধাটার ফলটা কী হবে, তাও তো ভালো ক'রে জানা আছে আগে থেকেই। ঢোকার সময় গেটের কাছে গুর্খা দরোগাটাকে তো দেখে এসেছে জোদ্দা, কোমরে যার চামড়ার খাপে ছোড়া ছুরি ঝুলছে, হাতে যার বন্দুক, এবং যার কাছাকাছিই তো জোদ্দা

ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে এল। সেই দরোয়ানটির ডাক পড়বে। আর তখন প্রস্তুত থাকতে হবে একটি অপূর্ব অর্দ্ধচন্দ্রের, ও কিছু সুভাষিত আপ্যায়নের। বলা যায় না, কপালে থাকলে হয়তো পশ্চাৎদেশে একটি লাথিরও দক্ষিণা মিলতে পারে। দরোয়ানটার বুট দুটো কি দেখেছে জোদ্দা? মনে পড়ছে না। কিন্তু তা সহজেই অনুমান ক'রে নেওয়া চলে। ছবিটা মনে মনে কল্পনা ক'রে শিউরে উঠল জোদ্দা। অতএব? একজন অফিসারকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই এক প্রচণ্ড শিক্ষা পেয়ে ফিরে যাবে, এবং এ অপমান সে জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। যে শারীরিক বলপ্রয়োগকে সে জীবনে এত ভয় করেছে, ভয়ের চেয়ে বেশি ঘৃণা ক'রে এসেছে, তার নিজেরই কপালে নাচবে আজ তা-ই। এবং যদি সে সত্যিই রাখাল চক্রবর্তীকে ভয় দেখাতে গিয়ে এই ধরনের কোনো ব্যবহার পায় তো সে কি দোষ দিতে পারবে এই আপিসের কাউকে, না রাখাল চক্রবর্তীকে? তা সে পারবে না। দোষী তাকে অন্যেরাই শুধু করবে না, নিজেকেও সে নিজে দোষী করবে, নিজের বিবেকের কাছেই সে দোষী থাকবে নিজে।

শুধু কি তাই? এর ফল আরো বিষম হ'তে পারে। একজন এত বড় অফিসারকে এইভাবে অপমান করার জন্যে এরা হয়তো তাকে পুলিসের হাতে দিয়ে দেবে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দেবে—তা ওরা অতি সহজেই করতে পারে। এটা সরকারী আপিস, আর এরা সব বড় বড় চাকরে, বড় বড় অফিসার। এদের মানসম্ভ্রম কত, এদের ক্ষমতা কত। আর এটা শুধু যে-কোনো একটা সরকারী আপিসই নয়, একেবারে ইনকামট্যাক্স আপিস। কত ফন্দী-ফিকির যে এই আপিসের লোকদের জানা থাকে, তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? ঐ যে মণ্টুবাবু বলেন: 'আমরা মশাই অষ্টপ্রহর হয়কে নয় করছি আর নয়কে হয় করছি—না পারি এমন

কাজ নেই।’ আর একটা অফিসারকে হঠাৎ আপিসের মধ্যে অপমান ক’রে বসলে ফন্দী-ফিকিরের দরকারটাই বা কী? সোজাসুজিই তাকে অভিযুক্ত ক’রে দেবে। এবং পুলিসের হাতে একবার পড়লে সটাং জেল—এর দরজায় গিয়ে হাজির হ’তে হবে—আর কিছু না হোক, কিছু জরিমানা তো দিতে হবেই। তার মানে অন্তত একটা ছোটখাটো মোকদ্দমা তো বটেই। খাসা, নিজের কাছে নিজের সম্মানটা বাড়বে তখন প্রচুর। আর মণ্টুবাবুই বা ভাববেন কী? ভাববেন, লোকটা আচ্ছা উন্মাদ তো, এ কী কাণ্ড ক’রে বসল? এবং ব্যাপারটা মণ্টুবাবুকেও অত্যন্ত অপ্রস্তুত ক’রে তুলবে নিশ্চয়ই। কারণ সে তো তাঁরই বন্ধু, এবং তিনিই তাকে আসতে বলেছিলেন। তাঁকে নিয়ে আপিসের লোকেরা নিশ্চয়ই খুব হাসিঠাট্টা করবে, বলবে: ‘সে কি মশাই, এ কী রকম বন্ধু আপনার, এ-ধরনের বন্ধু আপনার আরো আছে না কি?’

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, ও কী ভাববে? তখন ওর কাছে মুখ দেখাবার আর কি কোনো উপায় থাকবে? ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে ও কি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে না? বলা যায় না, শেষকালে ও-ও হয়তো জোদ্দাকে করুণা করতে শিখবে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই শিখবে। জোদ্দা ওর কাছে হ’য়ে দাঁড়াবে একটা হাসির পাত্র। জোদ্দার কথা যখনি ওর মনে পরে, ও খিল খিল ক’রে হেসে উঠবে, ভাববে সত্যিই কী অপদার্থ একটা জীব। এবং জোদ্দার সেই অপমানের ভাবটা কিছু কমবে না যদি তাকে এরা নাও দেয় পুলিসের হাতে, যদি শুধুই ওরি চোখের সামনে দারোয়ানটা কেবল একটু বুট-এর গুঁতো মেরে জোদ্দাকে ভাগিয়ে দেয়। না-না, এ-সব ভয়-ফয় দেখাতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। খামাখা ডেকে একটা কেলেঙ্কারি আনতে যাওয়া কেন? এ-রকম একটা কাণ্ড ক’রে বসলে এখনো যেটুকু আশা আছে, তাও মুহূর্তের মধ্যে উবে যাবে। তখন মণ্টুবাবু আসুন আর নাই আসুন,

ব্যাপারটার কোনোই ইতর বিশেষ হবে না। ইতর বিশেষ কি, ব্যাপারটার সঙ্গে সঙ্গেই ইতি ঘটবে। আর কিছু আশা করারই থাকবে না। কারণ সত্যি বলতে গেলে এখনো আশা আছে, খুবই আছে, এখনো সবই ঘটতে পারে। বলা যায় না, মণ্টুবাবুও হয়তো এসে পড়তে পারেন, খুবই পারেন। তিনি বা তাঁর হ'য়ে অন্য কেউ এখনো তো নিশ্চিত কোনো খবর পাঠাননি যে তিনি আসতে পারবেন না। অন্তত সে-রকম কোনো খবর তো জোদ্দার কানে এখনো পৌঁছোয়নি। তবে সে আশা করতে ছাড়বে কেন? এবং কেনই বা তবে সে ইতিমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসবে যাতে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত আশা নিঃসন্দেহে ও নিঃশেষে নির্মূল হ'য়ে যাবে?

রাখাল চক্রবর্তীর ঘরের দিকে প্রায় ফিরতে চলেছিল জোদ্দা, এসব ভেবে একটু থমকে দাঁড়াল। দূরে ত্যাখে দালানের অপর প্রান্তে একটা পিওন নির্বিকার চিত্তে বেঞ্চির ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে, যেন তোয়াক্কাই করে না। সেখানটায় অন্য দিকের দালানটাও এসে মিলেছে, তাই রৌদ্রালোকের ভয় নেই। এমন মানসিক শান্তিতে কেউ থাকতে পারে দেখে জোদ্দার কেমন একটু হিংসে হ'ল। কিন্তু ও তো সমানেই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, জোদ্দা করছে কী?

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল জোদ্দার মাথায়, এবং অন্তত সেই মুহূর্তের জন্যে সে একটু তাৎক্ষণিকের আরাম বোধ করল। না, রাখাল চক্রবর্তীকে ভয় সে দেখাবে না, তার কাছে ক'কিচয় কাঁদতেও সে যাবে না। সে নেবে একটি নতুন পন্থা, এগোবে একেবারে ভিন্ন ভাবে। ফিরে যাবে রাখাল চক্রবর্তীর ঘরে, গিয়ে বলবেঃ 'মশাই, আমি জেনে ফেলেছি। খবরটা শুনলাম এইমাত্র। শুনলাম, আপনার কাছেও খবর এসে গেছে আগেই। এখন দয়া ক'রে বলুন, কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মণ্টুবাবুকে?'

তাতে যদি লোকটা খুব একটা বিস্ময়ের ভাব দেখায়, চমকে উঠে যেন আকাশ থেকে পড়ার মত ভান করে বলেঃ 'সে কী মশাই। এ সব কী আবোল-তাবোল বলছেন আপনি? হাসপাতাল-ফাসপাতালের কথা তো আমি কিছুই জানি না। কেন, কী হয়েছে মণ্টুবাবুর?'

তো জোদ্দা বলবেঃ 'আপনি বৃথাই লুকোবার চেষ্টা করছেন। দেখছেন না, আমি জেনে ফেলেছি? সবাই জেনে ফেলেছে। এ-আপিসে সবাই এই নিয়ে কথা বলছে। এক ভদ্রলোক এক হাসপাতালে ফোন করছেন, তারও দুয়েকটা কথা কানে ভেসে এল। সুতরাং, দেখতেই পাচ্ছেন। মণ্টুবাবুর একটা মোটর দুর্ঘটনা হয়েছে, ও তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা জানি। কিন্তু যা' জানি না, তা' হচ্ছে কত প্রচণ্ড সেই দুর্ঘটনা, এবং তাঁকে কোন্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? না-না-না, আপনি ভাববেন না, আমাকে স্পষ্টই বলতে পারেন, আমি সব শুনতেই প্রস্তুত আছি। আর যদি এমনও হ'য়ে থাকে যে তাঁর সামান্য কিছু চোট লেগেছে মাত্র, তাঁকে কিছু ফার্স্ট-এড-টেড দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে, তো সেটাও জানার দরকার। কারণ তা' হ'লে আমার সমস্ত আশা নির্মূল হয়নি, আমি এখনো অপেক্ষা করতে পারি। বলা যায় না, উনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে হয়তো এখুনি ফিরে আসবেন। ভগবান করুন তাই যেন হয়। আর যদি সত্যিই তাঁর এমন কিছু ঘটে থাকে, খুব একটা খারাপ কিছু হ'য়ে থাকে, তাহ'লেও বলুন। তবে আমাকে এখুনি অন্য পন্থা দেখতে হয়, অন্য কোনো সমাধান খুঁজে বার করতে হয়। এবং পরে সময় ক'রে মণ্টুবাবুকেও দেখতে যাব নিশ্চয়ই।'

তখন? তখন লোকটা যাবে কোথায়? আর না ব'লে কি পারবে? সুড়সুড় ক'রে সমস্ত কাহিনীটি তখন বেরিয়ে আসবে। বাঃ, খাসা ফন্দী। যাওয়া যাক লোকটার ঘরে।

আবার যেন হঠাৎ কে জোদ্দার পা টেনে ধরল। তার মনে হ'ল, এমন একটা কাণ্ড যদি সত্যিই ঘ'টে থাকে তো কেন লোকটা সে-খবরটা জোদ্দার কাছ থেকে লুকোতে যাবে? আর যদি এ ধরণের কোনো কাণ্ড না ঘ'টে থাকে—বলা তো যায় না, হয়তো সত্যিই কিছুই ঘটেনি, ভগবান করুন তাই যেন হয়—তখন? তখন রাখাল চক্রবর্তী জোদ্দার মুখে এসব কথা শুনে ভাববে কী? ভাববে একটা বদ্ধ পাগল। তাকে হয়তো এখুনি পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। অথবা বলা যায় না, লোকটা হয়তো শুনে ভড়কেই যাবে, বলবে ঃ 'সে কি। তাই নাকি। কী সর্বনাশ। কে আপনাকে এ-খবর দিলে?' তখন ধূর্তের শিরোমণি শ্রীমান্ জয়দ্রথ খাঁ নিজের জালে নিজেই আটকা পড়বে। সত্যিই তো, এখবর কে তাকে দিলে? রাখাল চক্রবর্তীর এ-প্রশ্নের কী উত্তর সে দেবে? কার দোহাই সে পাড়বে? ঐ পিওনটার, যাকে এখুনি ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বেঞ্চির ওপর শুয়ে থাকতে দেখল? কিন্তু এমন একটা মিথ্যে কথা বললে তো পিওনটা তাকে তূলো ধুনে ছেড়ে দেবে। ওরে বাবা, আবার সেই শারীরিক বল-প্রয়োগের ভয়। না হয় ধরা গেল, সে রাখাল চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে চুপ ক'রেই রইল। তখন রাখাল চক্রবর্তী কি হুড়মুড় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে না, বলবে না ঃ 'চলুন তো, বাইরে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি কে কী জানে বা দেখেছে?' কেউ কিছুই জানে না, এবং কেউ কিছুই দ্যাখেও নি। কিন্তু তখন সকলেই সকলকে বিশ্বাস করবে। কথা এক মুখ থেকে আরেক মুখে ছুটবে। মুহূর্তের মধ্যে সারা আপিসময় খবর র'টে যাবে যে মণ্টুবাবুর একটা প্রচণ্ড এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাঁর জীবনের ভরসা কম। কেউ হয়তো আরো একটু বাড়িয়ে ব'লে ফেলবে ঃ 'জীবনের ভরসা কম মানে? তিনি কি এখনো আছেন? সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছেন।

এত বড় একটা এ্যাক্সিডেন্টের পরে কোনো মানুষকে কি কখনো বাঁচতে শোনা গেছে ?'

এই সব হবে জোদ্দারই কারণে। এই সম্পূর্ণ অমূলক হুল্লোড় সে-ই পড়িয়ে দেবে। এবং যখন সত্যিই কিছুই হয় নি আসলে। তারপরে একবার যখন খবরটা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে, তখন এ-আপিসের লোকেরা কি তাকে আস্ত রাখবে ? তখনই বা তার সম্মানটা থাকবে কোথায় ? আর ও-ই বা কী ভাববে ? ওর কাছে জোদ্দা সে-ক্ষেত্রেও মুখ দেখাতে পারবে না। এবং ধরা যাক, যখন এমন একটা হুল্লোড় চলছে আপিসে, সবাই ছুটোছুটি করছে, হা-হুতাশ করছে মণ্টুবাবুর জন্যে, তাঁকে সবাই মৃত ব'লে ধ'রে নিয়েছে, সেই সময় মণ্টুবাবু ধীরে সুস্থে পান চিবোতে চিবোতে এসে হাজির হলেন। তখন ?

তিনি তো কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। জোদ্দাকে বলবেন : 'সে কি মশাই, এ সব কী রটিয়েছেন আপনি ? আমাকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে এত কী আপনার মাথাব্যথা ! আমি মশাই কোথায় আপনার একটা উপকার করতে চলেছিলাম, আর তার বদলে আপনি আমায় এই দিলেন ? এখন দেখুন তো, এরা এই দিনদুপুরে আমাকে দেখে যেন ভূত দেখার মত আঁতকে উঠছে ?'

না-না-না-না-না, হুট করে একটা কিছু ক'রে বসার আগে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখার দরকার। কোত্থেকে এল এই এ্যাক্সিডেন্টের ধারণা তার মাথায় ? লোকটার এ্যাক্সিডেন্টের গল্প করা, আর ঐ পত্রিকাটা। এখন একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ভেবে দেখতে গিয়ে জোদ্দার মনে হল যে পত্রিকাটা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত নয়, একেবারেই নয়। ওটা হয়তো দুর্ঘটনার কোনো ছবিই নয়। আর গল্পগুলো ? তার কারণ ঐ এ্যাক্সিডেন্টটের শব্দটা। কারণ ঘরে বসে থাকতে থাকতে শব্দ যে একটা হয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য এটাও সত্য, শব্দটা জোদ্দার কানে আসে নি।

কিন্তু তাতে কি হয়েছে ? তার মানে কী শব্দটা হয়নি ? আবার এমনও হ'তে পারে, শব্দটা তার কানে ঠিকই এসেছিল, কিন্তু সে মনোযোগ দিয়ে শোনে নি, কারণ তার মন তখন অন্যত্র ছিল। তবে ?

আর রখাল চক্রবর্তীই বা মিথ্যে মিথ্যে বানিয়ে বলতে যাবে কেন ? তা ছাড়া, ঐ ফাজিল পিওনটাও ঘটনাটা স্বচক্ষে ঘটতে দেখেছে বললে। অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। না, তাহলে এসব জোদ্দার মিথ্যে ভাবনা মাত্র, রাখাল চক্রবর্তী কিছুই জানে না মণ্টুবাবুর কোনো দুর্ঘটনা সম্বন্ধে।

তখনি আবার মনে হ'ল : কিন্তু রাখাল চক্রবর্তী জানে না ব'লেই যে মণ্টুবাবুর সত্যিই কিছু হয় নি, তার কি কোনো প্রমাণ আছে ? এই পৈশাচিক সহরে সর্বত্রই তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পথচারীদের দুর্ঘটনার আমন্ত্রণ জানিয়ে প'ড়ে আছে রাস্তার সব পথ। এ-সহরটা তো খাওয়াতে জানে না, শুধু গিলে খেতে জানে। তাই, হয়তো মণ্টুবাবুর সত্যিই কিছু হয়েছে কোথাও, এরা এখানে এখনো কোনো খবর পায় নি।

না-না-না, এমন অশুভ চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও পাপ। মণ্টুবাবুর কিছু হয় নি, হ'তেই পারে না। কত লক্ষ লক্ষ লোক এ-সহরে বাস করছে, নিত্য পথ হাঁটছে, তাদের মধ্যে কটা লোকের এ্যাক্সিডেণ্ট হয় ? এসব কথা আর ভাববে না জোদ্দা, ভদ্রলোক হয়তো ফেরার পথেই, হয়তো ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন আপিসের কাছাকাছিই, হয়তো বলা যায় না উনি ঢুকছেন এই মুহূর্তেই গেটের মধ্যে দিয়ে। তবে কি জোদ্দা ফিরে যাবে ঘরটায়, দেখবে তিনি এলেন কিনা ? কিন্তু কী দরকার ? রাখাল চক্রবর্তী তো এমনিতেই সৌরেন সেনের ঘরে ফোন ক'রে দেবে। আর সৌরেন সেনও নিশ্চয়ই ঘরে আছেন। তাঁকে যে থাকতেই হবে। নইলে জোদ্দার চলবে কী ক'রে ? তা ছাড়া, ভদ্রলোক জোদ্দাকে এমন একটা কথা

দিয়ে সেকথার কেন খেলাপ করবেন? জোদ্দা তাঁর কী করেছে?

জোদ্দা তাঁর কিছুই করে নি, জোদ্দা কারুর কিছুই করে নি, এবং জোদ্দারও হয়তো কেউ-ই কিছু করে নি। কিন্তু কেউ যদি কিছু ক'রে থাকে জোদ্দার, যদি সারা জীবন ধ'রে ক'রে এসে থাকে, তো সে তার নিজেরি অদৃষ্ট। নয় কি? নইলে শুধু শুধুই কি একটা সামান্যতম বাধা আজ তাকে এই রকম আবোল-তাবোল ভাবনায় পাগল ক'রে তুলতে পারে? পাগল ছাড়া আর কী? কোনো ধীর স্থির সুস্থচিত্তের মানুষ কি এরকম ভাবতে পারে? এই যে এসব ভাবছে ও এতক্ষণ ধ'রে, তা যদি একবার জানাজানি হয়ে যায় তো লোকে তাকে কী বলবে? বলবে যে সে একটা সাধারণ মানুষ, তার মাথার ঠিক আছে? আর ঐ যে সামান্যতম বাধা, তা হয়তো কোনো বাধাই নয়। কারণ হয়েছে কী?—মন্টুবাবুর ঘরে থাকার কথা ছিল, তিনি একটু বেরিয়েছেন। এখনো ফেরেন নি। এই তো? আর সেই এইটুকুতেই এতটা ভড়কে গেল জোদ্দা, ভাবতে আরম্ভ করল, ঐ যাঃ, বুঝি ফ'সকে গেল?

কিন্তু যারা তাকে এত সহজে পাগল বলতে উদ্যত হবে আজ, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে অতীতটাকে? তারা কি জানে যে সারা জীবন ধ'রে জিনিস শুধু ফসকেই গেছে তার হাত থেকে, ও সেইজন্যেই আজ তার হঠাৎ এত ভয়, এত ভাবনা? ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়। হ্যাঁ, ভয়ানক সত্যি কথা সেটা। অবশ্য বলবার মত এমন কিছু ঘটনাবহুল জীবন তার নয়—উল্টে, অতি সাধারণ, অতি নগণ্য সে-জীবন—ও ফ'স্‌কে যাবার মত জিনিস আসেনি তার সারা জীবন ধরে। কিন্তু যেটুকু এসেছে, তা' ফসকে গেছে। ও সেইটেই বড় কথা। জীবনটা আজো প'ড়ে আছে প্রশস্ত প্রান্তর, অমার্জিত, অকৃতার্থ। তাতে তবু কখনো

হঠাৎ কোথাও-কোথাও দুয়েকটি চারা জেগেছিল ফুলের শপথ ও অভীপ্সা নিয়ে। কিন্তু কুঁড়ি যখন ধরে-ধরে, ঠিক তখনি তারা গেল কোথায়? কোন্ ঝড়ের শেয়াল তাদের বার বার উপড়ে নিয়ে গেল, তাদের রক্ত চুষে খেল? সে কি তার অদৃষ্ট নয়? সে জন্য আর কাকে সে দোষ দেবে আজ, নিজেকে, না মণ্টুবাবুকে? মণ্টুবাবু তো নিমিত্ত মাত্র, দোষ সেই পোড়া অদৃষ্টেরই।

বহুকাল পরে আবার জোদ্দার মনে পড়ছে আজ সুরভিকে। তাকে সে কোনোদিন ভোলে নি। কিন্তু বছর তো পেরিয়ে গেছে অনেক, তাই তার স্মৃতিটা আর বিছের মত কামড়ায় না। তবু আজ তা' হঠাৎ যেন আবার প্রচণ্ডভাবে কামড়ে ধরল। সে স্মৃতি যেন জাগল আজ সম্পূর্ণ এক নতুন অর্থ নিয়ে। কারণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন ঘটতে চলেছে আবার। জোদ্দা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুরভির চোখ দুটি, সময়ের যবনিকা ভেদ ক'রে তারা যেন আজ তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাসছে মিট মিট ক'রে। অতি অর্থপূর্ণ সেই হাসিটি। সেই চোখ দুটি যেন জ্ব'লে এসেছে জোদ্দার জীবনের আকাশে, নৈরাশ্যের ধ্রুবতারার মত। আজো জ্বলছে, এই দিন-দুপুরে আবার হঠাৎ দপ দপ ক'রে জ্বলতে আরম্ভ করেছে—হয়তো তাতে স্মরণ করিয়ে দিতে তার নিয়তির নিশ্চিত অনিবার্য পথ।

সেই চোখের প্রসঙ্গে জোদ্দার মনে পড়ল, একদিন সে সুরভিকে বলে: 'লাহিড়ী মশাই, এত ঘন ক'রে কাজল পর কেন?'

ওলা ছিল লাহিড়ী। সে-ই প্রথম জোদ্দা তাকে আদর ক'রে ডাকে লাহিড়ী মশাই ব'লে।

'বাঃ, কাজল তো সবাই পরে।' সুরভি উত্তর দেয়।

'তুমি যেন একটু বেশি পর, বড্ড বেশি পর। তোমাকে দেখতেই পাই না।'

'দেখতে পাও না? এই তো আমি, বা রে।'

'মানে তোমার চোখ দুটোকে।'

'আমার চোখ দুটো যে আসলে ভীষণ ছোট। এত ঘন ক'রে কাজল যদি না পরি তো তোমার কী মনে হবে জানো? মনে হবে, বুঝি আমার চোখই নেই।'

সেইদিনই প্রথম জোদ্দাকে তার 'তুমি' সম্বোধন করা। আপনি থেকে হঠাৎ তুমি, এক জগত থেকে যেন আরেক জগতে। সে-সন্ধ্যার কথা ভাবলে মনের কোন্ গহন কোণে আজো কেমন চিনচিন ক'রে ওঠে। দিনের শেষ নৌকো চ'লে গেছে গঙ্গায়—নদী পড়ে আছে গাঢ় তামার পাতের মত। ওপারে দূরে একটা-দুটো ক'রে আলো জ্ব'লে উঠছে, বুড়ো শিবতলার বট গাছটা আর চোখে পড়ছে না।

এই গঙ্গা কতবার সাঁতরে পেরিয়ে গেছে জোদ্দা—কখনো একাই, কখনো কোনো সমবয়সীর সঙ্গে। প্রশস্তে নিশ্চয়ই প্রায় মাইল খানেক হবে—কিন্তু গরমকালে দুটো জায়গায় চড়া পড়ে তো, তাই সুবিধে হয়। নদীটা সিউড়িতলায় একটা বড্ড বড় সান্ত্বনা—তা' যেন সারাটা দিন ধ'রে মনটাকে মাতিয়ে রাখে। সকালে চান করতে যাওয়া, সন্ধ্যায় ঘাটে এসে বসা। নদী তো নয়, ঘরের লোক—এত আপনার, এত পরিচিত। তবু সেই বিশেষ সন্ধ্যাটিতে জোদ্দার মনে হয়েছিল, এ সেই নদী নয় যা সে সাঁতরে পেরিয়ে গেছে বহুবার, এ-তামার পাতকে সে আগে দেখে নি। এ যেন নেমে এসেছে আকাশ হ'তে, তাকে আশীর্বাদ করতে, তাকে অন্য জীবন দিতে।

'উঠি, কাকীমা ভাববেন।' অস্ফুট গলায় বলেছিল সুরভি।

কাকীমা? কিসের কাকীমা? এ-জগতে কোনো কাকীমা নেই—কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু দুটি প্রাণী আছে। ঘাট শূন্য তখন, ওরা ঘাটে বসেও ছিল না। দুটো ঘাটের মাঝামাঝি একটা জায়গায়

দাঁড়িয়ে ছিল—জল হ'তে বেশ কিছুটা দূরে, আবার পথের ধারেও নয়, যাতে কারুর নজরে পড়ার ভয় না থাকে।

হঠাৎ কী রক্ত চাপল জোদ্দার মাথায়, কী সংগীত শুনল সে শিরায়, একটু তোত্‌লে ব'লে বসল: 'কিছু মনে কোরো না।' ও ব'লেই সুরভিকে আঁকড়ে ধরল। তাকে তাড়াতাড়ি একটা চুমু খেয়ে বসল—তারপর একটু থেমে আবার একটা, আরো একটা, আরো একটা। কতগুলো চুমু সে খেয়েছিল সেই সন্ধ্যায়, মনেই নেই। হয়তো দশটা, বারোটা, কি বিশটা। সুরভি আপত্তি করে নি, কোনো কথা বলেনি, কেবল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল।

নিশ্চয়ই খুব লজ্জা করছিল—ছোট মেয়ে তো। জোদ্দারই বা বয়স কত তখন? বাইশ, কি বড় জোর তেইশ। মাত্র দু তিন বছর হ'ল সিউড়িতলায় এসেছে ইস্কুলের চাকরিটা নিয়ে, বাবা মারা গেছেন। বাড়িতে বিধবা মা আর মালতী, সংসার চলে কি চলে না, তারপর বাবা দেনাও ক'রে গিয়েছিলেন কম নয়। এদিকে মালতীটাকেও ইস্কুলে পড়াতে হবে। থাকে একটা ছোট একতলা বাড়ি ভাড়া ক'রে সহরের ভেতর দিকে। লাহিড়ীদের কথা শুনেছে, ঐ যাদের বিরাট বাগানওলা বাড়িটা গঙ্গার ওপরেই। সহরে বড় লোক বলতে ঐ এক ওরাই, তাই ওদের কেউই তেমন একটা চেনে না। হ্যাঁ, আর ছিল মণ্টুবাবুদের বাড়িটাও, মস্ত জমির ওপর—কিন্তু সেটা অন্য দিকে, প্রায় নারাণপুরের কাছে। কারণ নারাণপুরেরই তো জমিদার ওঁরা। অবশ্য মণ্টুবাবুর সঙ্গে আলাপ তখনো হয় নি। তা' অনেক পরের কথা।

লাহিড়ীদের একটা কারখানা ছিল, লোহা-লক্কড়ের না কিসের, বাড়িটা হ'তে বেশ খানিকটা দূরে, গঙ্গার ওপরেই—ও তাদের পয়সা নাকি তাতেই। সে-কারখানায় যে কী তৈরী হ'ত, তা জোদ্দা কখনো জানে নি, আজো জানে না। তবে মনে আছে, কালী পূজো উপলক্ষে বাড়িতে তুবড়ি তৈরী করার জন্যে পাড়ার ছেলেরা

সেখান হ'তে লোহার চুর চুরি ক'রে আনত। কারখানার চেহারাটা ভালো ক'রে মনে পড়ে না আজ, যদিও আজও সেটা আছে ভাঙা-চোরা অবস্থায়—কিন্তু আর সেখানে কোনো কাজ হয় না। কে জানে, আজ কোন্ উপায়ে লাহিড়ীরা পয়সা করছে। কিন্তু পয়সা করছে নিশ্চয়ই, কারণ বাড়িটা তো ঠিকই সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তো তাই মনে হয়। সে-বাড়িটায় কে বাস করে আজ, তাও জোদ্দা জানে না। জানতে চায়ও না। একদিন সেই বাড়ির অধিবাসীদের কেন যে জানতে হয়েছিল তাও আজ বুঝতে পারে না। এই চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া জীবনে কেন আবার অত দূরে পিছন ফিরে তাকানো? সময়ের ধুলোতে ধূসর সেই স্মৃতি, ধুলো ঝেড়ে তাকে আজ জাগানো কেন?

কিন্তু কেনই বা তা শুধু স্মৃতিই র'য়ে গেল, সত্য হল না? হ'তে তো পারত। নতুন এক নিষ্ফল আক্রোশে ও বেদনায় জোদ্দা যেন ছটফট ক'রে উঠল। তবু সুরভির দোষটা কোথায়? তখন সে একটা পুঁচকে মেয়ে বই তো নয়! দোষ জোদ্দার কপালের। তা যদি হ'ত, যদি সে পেত সুরভিকে, তো এই দুর্দশায় আজ কি তাকে পড়তে হত? এই মণ্টুবাবু, এই সৌরেন সেন, এই রাখাল চক্রবর্তী আর তার এ্যাক্সিডেণ্টের গল্প, এই সব ঝামেলার কোনো ধার সে ধারতে যেত? বেঁচে যেত আজকের সমস্ত বিড়ম্বনা হ'তে। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে···হায় হায় হায়, নিজেকে যেন করুণা করতে সাধ যায়।

যাই হোক, যা হবার নয়, তা হয় নি। আর ছেলে বয়সে এমন একটা প্রেমঘটিত ব্যাপার কার না হ'য়ে থাকে? লোকে সে-সব কথা সময়ে ভুলে যায়, তার কোনো আঁচড় থাকে না পরের জীবনের ওপর। কিন্তু জোদ্দা তো নিজের সঙ্গে অন্য কাউকে তুলনা করছে না—এবং সে-তুলনা সম্ভবও নয়। কারণ তার জীবন অতি নগণ্য হ'লেও তা অতি স্বতন্ত্র—কারণ তা অতি রিক্ত, এত

রিক্ত জীবন খুব কম লোকেরই হয়। সে তো মোওয়া চাইতে যায় নি, তাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে তার চোখের সামনে মোওয়টাকে নাচানো হয়েছে। লোভ যদি না সে সম্বরণ করতে পেরে থাকে তো সেটা কি তার দোষ? আর যে-মুহূর্তে সে হাত তুলে খপ ক'রে ধরতে গেল, মোওয়া উধাও। বলিহারি। তাই তো ভাগ্যের এই ভেল্কিবাজিটা, গায়ে প'ড়ে এই প্রচণ্ড প্রবঞ্চনাটা তার বুকে বিঁধেছে এত ভীষণ ক'রে। কারণ সে তো চিরকাল জেনে এসেছিল যে সে গরীব, তার বাড়িতে ছেঁড়া কাঁথা আর মাতুর, তার বিধবা মা তুটো থানে বছর চালান। সে তো কখনো লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে যায় নি লাহিড়ীদের ঐশ্বর্যের দিকে। সেই সাদা মার্বেল পাথরের মেঝে, সেই ফুলদানি, দেয়ালে-টাঙানো প্রকাণ্ড সিংওলা হরিণের সেই মাথা, সেসব তো তার জগতের জিনিস নয়। কতদিন ধ'রে তো সে গেছে লাহিড়ীদের বাড়িতে, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা—যখন সুরভির সঙ্গে আলাপ তার হয় নি, সুরভি আসে নি সিঁড়িতলায় তার নামও জোদ্দা শোনে নি, কোনো এক সুরভির সঙ্গে যে তার আলাপ হ'তে পারে একদিন, এমন অদ্ভুত কল্পনাও সে কখনো করে নি। তাই সে রোজই সন্ধ্যায় দেখে এসেছে—কিম্বা হয়তো দেখেও ভ্যাখে নি—সেই সব মার্বেল পাথর আর ফুলদানি আর হরিণের মাথা সম্পূর্ণ এক নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, ঠিক যেমন ক'রে কোনো পথচারীর কখনো কখনো নজরে প'ড়ে যায় একটা ঝকঝকে প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চ'লে যেতে। সেই হঠাৎ দেখা মোটর গাড়ির সঙ্গে পথচারীর জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই, তাই সে তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু সুরভি জোদ্দার জীবনে এল যেদিন থেকে, সব যেন কেমন উল্টে পাল্টে গেল। যেন হঠাৎ মনে হ'তে লাগল, আশা হয়তো সেও করতে পারে, হয়তো এই ছেঁড়া-কাঁথা মাতুরের জীবনটা আর বেশিদিন নয়। এমন কি ধীরে ধীরে ঐ মার্বেল পাথরের সঙ্গে কেমন এক ধরণের আত্মীয়তাও যেন সে

অনুভব করতে আরম্ভ করল। তারা যেন জড়িত সুরভির সঙ্গে, তার মধুর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ যেন তারা, এবং যেহেতু জোদ্দা নিজেই জড়িত সুরভির সঙ্গে, যেন তারও অধিকার আছে সুরভির যা কিছু আপন তাকে আপন ক'রে নিতে চাওয়ার। এক কথায়, তার এতদিনের অপরিচিত সেই জগতটাকে তেমন একটা বিরুদ্ধ জগত ব'লে জোদ্দার আর মনে হ'তে লাগল না। কারণ সেই জগতেরই একজন মানুষকে তো সে আপন ক'রে নিতে পেরেছে। আর মানুষটাকেই যখন সে আপন ক'রে নিতে পারল, তখন সেই মানুষটার যেসব আসবাব-পত্র ইত্যাদি, যে-বাহ্যিক জগতটা সেই মানুষটাকে ঘিরে, তাকে সে আপন করতে পারবে না? অন্তত এই রকমই তো মনে হয়েছিল একদিন জোদ্দার। সত্যি, কত বড় গাধা সে। বলা যায় না, হয়তো আজও একটা প্রচণ্ডতর গাধা সে বনতে চলেছে।

হঠাৎ জোদ্দার মনে হল, যদি সুরভির সঙ্গে তার একেবারেই দেখা না হত তো হয়তো আজকে ভয়টা সে কম পেত। কারণ জীবনের অন্তত একটা শিক্ষা তো কম হত তাহ'লে। ব্যর্থতার বোধটা তাহলে হয়তো এত সাংঘাতিক ভাবে তাকে পিষে ফেলত না আজ। সত্যি, কেন দেখা হয়েছিল সুরভির সঙ্গে? না হ'লেও তো পারত।

সেদিনটা আজো স্পষ্ট মনে পড়ছে। রোজই যেমন যায়, সেদিনও সন্ধ্যেবেলা গেছে লাহিড়ীবাড়িতে, সন্টুকে পড়াতে। সন্টুই তো ছেলেটার নাম? ভালো ক'রে মনে পড়ছে না। কথা তো আজকের নয়। আজ সে-ছেলে নিশ্চয়ই অনেক বড় হ'য়ে উঠেছে হয়তো তার বিয়েও হ'য়ে গেছে এতদিনে, খুব ঘটা ক'রে, খুব বড় ঘরে, খুব সুন্দর মেয়ে দেখে। হয়তো সে আজ কোথাও একটা মস্ত বড় চাকরী নিয়ে আছে, কিম্বা বাড়ির ব্যবসাতেই ঢুকেছে। সে অবশ্য থাকে না আর সিউড়িতলায়, অন্তত জোদ্দা

তো তাকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর দেখে নি। আজ যদি সে দেখে তার পুরোনো মাস্টারমশাইকে, চিনতেই পারবে না। কেনই বা চিনবে? জোদ্দাই কি তাকে চিনতে পারবে?

যাই হোক, সেদিনও গেছে সন্টুকে পড়াতে। লাহিড়ী-বাড়িতে হঠাৎ এই পড়ানোটা পেয়ে বড্ড সুবিধে হয় সেই সময়টাতে। সংসার তো চলছিল না? সবে ঢুকেছে তখন ইস্কুলে, কতই বা মাইনে পায়? আর বাড়িতে কী পাহাড় প্রমাণ দায়িত্ব ঘাড়ের ওপর। শুধু কি মা আর বোন, বাড়ি ভাড়া, হ্যানো-ত্যানো আর দৈনন্দিনের সংসার চালানোর খরচ ইত্যাদি? মাসে মাসে বাবার রেখে-যাওয়া দেনারও কিছুটা ক'রে শোধ দিতে হয়। মন প'ড়ে আছে সর্বক্ষণ শুধু ঊর্দ্ধশ্বাসে সামান্য কিছু পয়সা রোজগারের দিকে। সন্টুকে পড়ানোর কাজটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে মাসান্তের উপায় বেড়ে গেল আরো দশ টাকা। আর তখনকার দিনের দশ টাকা, তার মূল্য কত। মনে আছে, মা সত্যনারায়ণের পূজো পর্যন্ত দিয়েছিলেন একবার। আর সেই লাহিড়ীমশাই—সত্যিকারের লাহিড়ীমশাই, তার সুরভি নয়—ভদ্রলোকে কী বদলেই গেলেন পরে। প্রথম যেদিন আসেন তাদের বাড়িতে, তাদের সেই কুঁড়েতে, কী ভদ্র ব্যবহার তাঁর। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে যেই দরজা খুলল জোদ্দা, নজরে পড়ল তাঁর অভিজাত চেহারাটি, সেই কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, টেরিকাটা কাঁচা-পাকা চুল। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।

ঢুকেই বললেন, জয়দ্রথবাবু বাড়ি আছেন কি?'

'আজ্ঞে আমিই জয়দ্রথ। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'আমাকে হয়তো ঠিক চিনবেন না। আমার নাম প্রসন্ন লাহিড়ী। ঐ গঙ্গার ধারের বাড়িটা আমার।'

'বিলক্ষণ। আপনার কথা খুব শুনেছি। আসুন, আসুন।

এ কী ভাগ্য আমার। কোথায় যে আপনাকে বসতে দেব জানি না।'

'কারণ বসতে দেবার জায়গা সত্যিই ছিল না। ভদ্রলোক ব'লে চললেন :

'থাক, থাক—বসতে দেবার দরকার নেই। আমি এসেছি ছোট্ট একটু কাজে। আমাকে কখনো দেখেন নি, কারণ আমি বড় একটা বেরোই না সচরাচর। তবে আপনার কথা অনেক শুনেছি—আপসি এখানে আসা থেকে আপনার নামযশ শুনছি। সকলেই আপনার শিক্ষকতার প্রশংসা করে। ছাত্ররাও নাকি খুব সন্তুষ্ট। এখন যেজন্যে এসেছি ব'লে ফেলি। আমার একটি ছেলে আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জানি—সে তো আমাদের ইস্কুলেই পড়ে।'

'হ্যাঁ, ঐ ছেলেটাকে নিয়ে একটু মুস্কিল হয়েছে। জানেন তো, ওটি আমাদের একমাত্র ছেলে। অবশ্য মেয়েও আছে একটি ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়—কিন্তু ছেলে বলতে ঐ একটিই। আর একমাত্র ছেলে হ'লে যা হয়, বড্ড আদুরে, কেবল খেলা আর খেলা, আর এটা-ওটা আবদার—লেখাপড়ার দিকে একটুকুও ঝোঁক নেই। অথচ দেখুন, দশে পা দিয়েছে, তেমন ছোটটি তো আর নেই, এখন লোখাপড়ার দিকে যদি মন না দেয় তো কবে দেবে? ওর মা তো ওকে কিছুতে শাসন করতে পারবে না—আমিও পারি না। কখনো কখনো যদি ধমকাতেই হয়, তখন এত জোরে ধমকে ফেলি যে পরে ওর মা'র হাঁড়িমুখ সামলাতে সামলাতে প্রাণ যায়। আদুরে ছেলে হ'লে যা হ'য়ে থাকে। তাই ভাবছিলাম ওর একটু পড়াশুনোর ভার যদি দয়া ক'রে আপনি নিতে পারেন—এই ধরুন রোজ সন্ধ্যের দিকে এলেন আধঘণ্টা-একঘণ্টার জন্যে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, জোদ্দা যেন হাতে স্বর্গ পেল। মাসান্তে আরো দশটা করে টাকা। মা তো খবরটা শুনেই কপালে

যোড় হাত তুলে বললেন, 'ভগবান আছেন রে—ভাবিস নে, সব হবে।'

পড়ানো তো আরম্ভ হল। সন্টুকে কোনোদিনই তার তেমন বেয়াড়া ব'লে ঠেকে নি। বরং শীঘ্রই দুজনের মধ্যে বেশ ভাব জ'মে গেল। সন্টুর বাবা-মাও বেশ সদয় ব্যবহার করতেন। জোদ্দাকে তাঁদের 'আপনি' সম্বোধন কয়েকদিন যেতে না-যেতেই 'তুমিতে' নেমে এল। জোদ্দাই বলেছিল, 'আমাকে দয়া ক'রে আর আপনি-আপনি ক'রে কথা বলবেন না। আমার বড্ড লজ্জা করে।' আর পড়াতে গিয়ে শুধু যে পয়সাই মিলত, তা নয়—প্রতিদিন এক কাপ চায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুটো করে সন্দেশ জুটত। বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জলখাবার প্রস্তুত, টেবিলের ওপর পাতা। আগে খাওয়া, পরে পড়ানো। আমের সময় আমও মিলত, লিচুর সময় লিচুও। এই ভাবে চুপচাপ খেয়ে যেতে বড় লজ্জা করত জোদ্দার—কারণ সন্টু তো পাশেই ব'সে থকত, দেখত। অবশ্য সন্টুর জন্যে ভাবনা করার কারণ ছিল না—সন্টু তো এসব খেয়েই থাকে, নিত্যই খায়। কিন্তু ওর মনে পড়ত মা'র কথা, মালতীর কথা। ওদের তো কোনোদিন ও সন্দেশ কিনে খাওয়াতে পারে না। বিশেষ ক'রে ছোট্ট মালতীটা, এই রকমের ভেতরে কিশমিশ দেওয়া সন্দেশ যদি ও কোনদিন খেতে পায় তো ওর কত আনন্দ হবে। তাই জোদ্দার কেমন এক ধরনের দুঃখ হ'ত। খেতে ব'সে মনে হত, ও হয়তো মাকে আর মালতীকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছলনা করছে। মনে হত, এসব খাওয়ার অধিকার ওর নেই। তবু খেত, মুখ বুঁজে তাড়াতাড়ি খেয়ে যেত—মনের ভাবটাকে বাইরে বুঝতেই দিত না।

এমনি ক'রে দিন যায়, প্রায় মাস তিনেক হ'ল তার পড়ানো শুরু হয়েছে লাহিড়ীবাড়িতে। তারপর একদিন এল সেই সন্ধ্যাটি—কেন এল? না এলেও তো পারত। সেদিন বাইরের ঘরটাতে ঢুকেই কানে এল ভেতর থেকে হট্টগোলের শব্দ, কোন এক

অপরিচিত মেয়েলি গলার খিলখিল হাসি, দৌড়ঝাঁপ। সণ্টুর গলা তো ছিলই, সণ্টুর দিদি মিণ্টার গলাও ছিল—কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটি নতুন গলা, ভারী মিষ্টি একটি কণ্ঠস্বর। এই সণ্টু, দে বলছি, দে—কাকীমা, ছাখো না…'স্পষ্ট কানে এল জোদ্দার।

খানিক্ষণ বাদেই লাফাতে লাফাতে সণ্টুর প্রবেশ। 'মাস্টারমশাই, আজকে একেবারে পড়তে ইচ্ছে করছে না।'

'সে কী?'

'না মাস্টারমশাই, আজকে ছুটি। আচ্ছা বলুন তো, কে এসেছে আমাদের বাড়িতে?'

'কে?'

'সুরুদি, বার্ণপুর থেকে। এই সুরুদি। এসো না, এত লজ্জা কিসের তোমার?' ব'লেই সণ্টু ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল, এবং অল্লক্ষণের মধ্যে টানতে টানতে একটি ষোল-সতের বছরের মেয়েকে নিয়ে হাজির। 'এই হচ্ছে সুরুদি', আমাদের সুরুদিদি।'

জোদ্দা এতদিন যে-সমাজে মিশেছে—যদি কোনো সমাজে সে মিশেই থাকে—তাতে এধরনের মেয়ে তার কখনো নজরে পড়ে নি। মেয়েটি সুন্দরী, লম্বা নয়, রোগা, কিন্তু শরীরের একটা বাঁধুনি আছে—আর খুব ফর্সা রঙ, চোখে ঘন ক'রে কাজল পরা। চেহারার জলুস তো আছেই, আবার সাজ-গোজও করতে জানে। তার পরিচিত গোষ্ঠীতে যে ধরনের মেয়েদের জোদ্দা এতদিন দেখে এসেছে তাদের কেউই এরকম নয়। আজো মনে পড়ে জোদ্দার, সুরভিকে সেই প্রথম দিন দেখবা মাত্রই ও যেন কেমন এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই লাহিড়ীগিন্নী ঢুকলেন রেকাবীতে ক'রে সন্দেশ ও চা নিয়ে, যথার্থ খবরটা তাঁর মুখেই পেল জোদ্দা। সুরভি নাকি সণ্টুর জ্যাঠতুতো দিদি, থাকে বার্ণপুরে। ওর বাবা সেখানে নাকি আছেন বহুকাল ধ'রে, সেখানকার ইঁটের কারখানায় নাকি

বড় চাকরী করেন। সুরভি এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে, পরীক্ষার ফল বেরোতে এখনো মাস তিনেক দেরী আছে—তাই ওর বাবা মেয়েকে তাঁর ভাইএর কাছে পাঠিয়েছেন গরমে ছুটিতে। মেয়ে নাকি পড়া-শুনোয় অত্যন্ত ভালো, ও ম্যাট্রিকের পর সে নাকি কলকাতার কোন হোস্টেলে থেকে কলেজে আই-এ পড়বে।

যেটা জোদ্দা আজো খুব ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারে নি, তা হচ্ছে সুরভির প্রতি তার যে-আসক্তি প্রথম হ'তেই, সেটাকে তার পক্ষে না হয় স্বাভাবিক ব'লেই ধ'রে নেওয়া গেল, কারণ তখনো পর্যন্ত উঠতি বয়সের কোনো বাইরের মেয়ের নিকট সংস্পর্শে সে আসে নি, আর তার নিজেরি তখন ঐ রকম একটা বয়স—কিন্তু সুরভি? তার কী ক'রে জোদ্দার মত একটা ছেলেকে ভালো লাগল? অত বড় লোকের মেয়ে ও, ওর কাছে জোদ্দা কে? ওদের সমাজের যে-সব ছেলেদের ও দেখে এসেছে, তারা নিশ্চয়ই সব পয়সাওলা লোকেরই ছেলে। তারা নিশ্চয়ই আরো কত ফিটফাট, কত চালাক চতুর, কত বাকপটু, কত হাসিখুশী। আর জোদ্দা? বলা যায় না, হয়তো সেটাই একটা মুখ্য কারণ ওর জোদ্দাকে ভালো-লাগার। কারণ এই বয়সের কোনো বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের ছেলেকে ও হয়তো আগে দেখে নি। আর ও যখন নিজেই জোদ্দা থেকে এত ভিন্ন প্রকৃতির, যেন একেবারে উল্টো স্বভাবের। কী হাসিখুশী মেজাজ ছিল মেয়েটার, কী চঞ্চল। ঠাট্টা ক'রেই আছে, কথায় কথায় হেসে গড়িয়েই আছে, বার্ণপুরের কোন এক মোটা মাস্টারনি ওদের, সে-ভদ্রমহিলার এমন ক্যারিকেচার করত যে জোদ্দা পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারত না। তাই বলা যায় না, হয়তো বিপরীত বিপরীতকে টানে, এবং এক্ষেত্রেও টেনেছিল। আর তা ছাড়া বয়সের প্রশ্নটা তো সুরভির পক্ষেও সমানই প্রযোজ্য হ'তে পারে। ঐ রকম বয়সে কি আর মেয়েরা সব দিক ভেবে-চিন্তে প্রেমে পড়ে? আর শুধু ঐ রকম বয়সেই বা কেন? কোন্ বয়সে মেয়েরা—বা ছেলেরা

প্রেমে পড়ে ভালো-মন্দ বিবেচনা ক'রে? সব বয়সেই প্রেম অন্ধ। বিশেষ ক'রে ছোটো বয়সের প্রেম তো আরো অন্ধ, তা কোনো যুক্তিরই ধার ধারে না। সুরভিও হয়তো তাই এতটুকুও ভাবে নি। তা ছাড়া মেয়ে বাইরে-বাইরে মানুষ। এবং এমন সমাজে মানুষ যেখানে মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা অনেক বেশি। তার বয়সের মেয়েদের প্রেম করতে সে আগে নিশ্চয়ই দেখেছে। এবং এপ্রসঙ্গে ভাববার মত কথা আরো একটি ছিল। এই প্রথম সে বাবা-মার চোখ হ'তে এত দূরে এসে পড়েছে, একটা নতুন জায়গায় সম্পূর্ণ একটা পরিবেশে। আর সেখানে রোজ সন্ধ্যেবেলা একটি যুবক ছেলেকে আসতে দেখছে নিয়মিত, এবং চেহারার দিক থেকে সে-ছেলেটি এমন কিছু অপাংক্তেয়ও নয়, বরং জোদ্দা শুনে এসেছে অনেকের মুখেই যে ঠিক প্রচলিত অর্থে সুন্দর তাকে না বলা গেলেও তার চেহারায় একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, তার মুখে আছে এমন একটি বিষণ্ণ অথচ রুক্ষ শ্রী তা সচরাচর চোখে পড়ে না। হয়তো তাও সুরভিকে আকর্ষণ করতে পেরে থাকে।

আর এসব ছাড়াও তো ছিল কথায়-কথায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসঙ্গ পাড়া, ঐ সন্টুকে পড়াতে পড়াতেই—এই যেমন 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরনীতে' ইত্যাদি। সন্টু বেচারা এসবের কিছুই বুঝত না, কিন্তু সন্টুকে বোঝানোর জন্যে তো এরকম প্রসঙ্গ পাড়া নয়। কথা হচ্ছে, সুরভি যে কাছে থাকত ব'সে, সন্টুকে পড়ানোর সময় প্রায়ই এসে বসত। একটা বয়সে মেয়েরা সকলেই কবিতা-প্রেমিক হ'য়ে পড়ে, বিশেষ ক'রে এই রকম বয়সটাতে। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনের গল্প করতো জোদ্দা—ও একজনকে জানত সে এককালে শান্তিনিকেতনে ছিল ও রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখেছে। সুরভি তন্ময় হয়ে শুনত এই সব গল্প। অবশ্য ততদিনে ওদের মধ্যে দূরত্বের ভাবটা অনেক ক'মে এসেছেও অত্যন্ত ধীরে ধীরে, যেন নিজেদেরি অগোচরে,

ভালোবাসার সূত্রপাতের আভাস যেন দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং জোদ্দা গরিব, জোদ্দা এই, জোদ্দা ওই, এসব বিবেচনা করার অবকাশ কি ছিল তখন সুরভির? কিন্তু তবু ওর কাছে কিছুই লুকোতে চায় নি জোদ্দা—যখন গোপনে বিয়ের কথা পাড়ে ও, সুরভি রাজী হয়, তখন সে সুরভিকে বাড়ির কথা সবই খুলে বলে। তাতে বিগড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, জোদ্দার প্রতি সুরভির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেন সঙ্গে সঙ্গে আরো উথলে ওঠে। আসলে হয়তো তখন তার বিচার করবার কোনো শক্তিই ছিল না। কিন্তু এসব ঘটে পরে, বেশ কিছু পরে।

মনে পড়ে, সুরভির সিঁড়িতলায় আসার প্রথম যা ফল ফলে জোদ্দার ওপর, তা হচ্ছে, সে হঠাৎ রোজ দাড়ি কামাতে সুরু করে। আগে কামাত একদিন অন্তর। এই পরিবর্তনের দরকারটা কী ছিল, তা সে বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে বার করতে পারে নি। সুরভিকে প্রথম দিন থেকে দেখা অবধি রোজ সকালে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে গিয়ে তার মনে হত: 'এই একদিনের দাড়ি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় পড়াতে যাব? যাঃ, সে কি হয়।' দুয়েকদিনের মধ্যেই এই রোজ দাড়ি কামানোর ব্যাপারটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। আরো মনে পড়ে, তার গায়ে ও জামায় সেই ঘামের গন্ধের ব্যাপারটা। অবশ্য সেটা ঘটতে আরো দিন পনের লাগে—কারণ তখনো সে সুরভিকে দেখতে পেত শুধু কশ্চিৎ-কদাচিৎই, তারা পরস্পর পরস্পকে এড়িয়েই চলত। আগে-আগে সে লাহিড়ীবাড়ি পড়াতে আসত সারাদিন ইস্কুল করার পর বাড়ি ফিরে একটু জিরিয়ে। যে-জামা প'রে সারাদিন ইস্কুল করেছে, সেই জামা প'রেই সন্টুর কাছে চ'লে আসত। জামা ছাড়ার কথা তার কখনো মনেই হত না—আর সব সুদ্ধ তিনটের বেশি পাঞ্জাবীও তার ছিল না। ইস্কুল ফিরে গা অবশ্য ধুত কখনো কখনো, কারণ সারাদিন ধ'রে কাজ করার পর ঘামে শরীরটা এমন প্যাচপেচে হ'য়ে যায় যে নিজের গন্ধ

নিজেরি সহ্য হয় না। তবে রোজ গা ধোওয়ার প্রশ্নও কখনো ওঠে নি, কারণ সাবানের খরচাটা তো ছিল।

সুরভির সঙ্গে আলাপ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সে হঠাৎ আবিষ্কার করল যে এই একই জামা প'রে সন্টুকে পড়াতে যাওয়া তার আর একদিনও চলতে পারে না, এবং গাও তার নিত্যই ধুতে হবে। সাবানের ওপর খরচটা যদি একটু বাড়েই তো বাড়বে—কী আর করা যাবে? বড় লোকের বাড়ি পড়াতে গেলে কি এমন হ্যাংলার মত সাজ ক'রে যাওয়া যায়?

'সত্যিই তো', মাও বললেন, 'আমারি তোকে আগে বলা উচিত ছিল।'

সেদিন থেকে মা তার একটা ক'রে পাঞ্জাবী রোজ সকালে কাচতে আরম্ভ করলেন। শুকোলে মালতী ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সেটাকে ইস্তিরি ক'রে দিত। অবশ্য ইস্তিরি একটা কথার কথা। একটা ঘটিতে গরম জল ভরতি ক'রে সেটা ঠেসে পাঞ্জাবীর দুটো হাতার ওপর কয়েকবার চালিয়ে দেওয়া। একটি ক'রে ধুতিও রোজ সকালে এইভাবে কাচা হত। কিন্তু ধুতির একটা সুবিধে এই যে তার জন্যে তো আর তেমন ইস্তিরি-ফিস্তিরির দরকার পড়ে না। এবং এই রকম একটি সদ্য কাচা ধুতি পাঞ্জাবী প'রে জোদ্দা রোজ যেতে আরম্ভ করল লাহিড়ীবাড়ি। প্রথম মনে হত জোদ্দার, সত্যিই পোষাক-পরিচ্ছদের কী মাহাত্ম্য, যেন মনটাকেই পাল্টে দেয়।

এবং কীভাবে তার সঙ্গে সুরভির সেই নিকট হওয়ার ঘটনাটি ঘটল ধীরে ধীরে, তাও এক আশ্চর্য কাহিনী। এবং তা ভাবলে এত দুঃখের মধ্যেও আজও আনন্দ হয়, হাসি পায়। যদিও সমস্ত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়ায় মর্মান্তিকভাবে বিয়োগান্ত, সেই পরিচয়ের ছোটখাটো দুয়েকটা খাপছাড়া টুকরো স্মৃতি মনের মধ্যে আটকা পড়ে আছে, তারা যেন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তার পরবর্তী জীবনের বহু অল্প বিরস মুহূর্তের রোমন্থনের সঞ্চয়।

মনে পড়ে, সেবার সিউড়িতলায় প্রচণ্ড গরম পড়েছে, আর সেবছরে গাছে আমও হয়েছে প্রচুর। সুরভি নাকি তার খুড়তুতো ভাইবোনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুব আম খেয়ে বেড়াচ্ছে। দিনে দশটা, বারোটা, বিশটা। এক একটা ক'রে আম ধরে, পেছনে দাঁত দিয়ে ফুটো করে, আর চোষে। নিজেদের বাগানের আম তো, পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। আর যদি কখনো কিনতেই হয় তো সে-বছরে বাজারে আম এত সস্তা যে সে-পয়সা খরচ করতে গায়ে লাগে না, বিশেষ ক'রে ওদের মতন বড় লোকদের। ওর আমপ্রীতির খবর পেয়ে জোদ্দা বাড়ি হ'তে কিছু কাসুন্দি এনেও উপহার দেয়। আচারে জোদ্দার মা'র ছিল এক অদ্ভুত হাত। অবশ্য কাসুন্দিটা সুরভিকে উদ্দেশ্য ক'রেই আনে নি, অন্তত সেরকম কোনো কথা সে বলে নি। পাথরের বাটিটা লাহিড়ীগিন্নীর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'মা এই আচারটা পাঠিয়েছেন আপনাদের জন্যে।' আচার খেয়ে তো সবাই খুব খুশী। সুরভিও সামনে এসে বলেছিল, 'কী সুন্দর কাসুন্দি, আগে কখনো খাই নি।'

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আসল ব্যাপারটা ঘটল তার কয়েকদিন যেতে না-যেতেই। ঐ গরমে অত আম খাওয়া সইবে কেন? আর অমন স্যাঁতসেঁতে গরমের অভ্যাসও সুরভির কোনোদিন ছিল না। ফলে ওর সমস্ত গা ঘামাচিতে ভ'রে গেল। বেচারীকে একেবারে অস্থির ক'রে তুলল। কিউটিকুরা পাউডার-টাউডার লাগায়, কিছুই হয় না। এততেও শেষ নেই, দুয়েকটা ফোঁড়া পর্যন্ত উঠতে আরম্ভ করল। অবশ্য এসব খবর জোদ্দা তখনি তখনি পায় নি—পরে পায়। হ'ল কি, হঠাৎ সুরভি উধাও, দু-তিন দিন ধ'রে তার কোনো পাত্তাই পায় না জোদ্দা। ভাবল, মেয়েটা গেল কোথায়, চ'লে গেছে নাকি? অথচ সে সম্বন্ধে সামনাসামনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও বাধ-বাধ ঠেকে। হঠাৎ সন্টু একদিন ব'লে বসল? 'সুরুদি'র কী লজ্জা মাস্টারমশাই, আপনার সামনে কিছুতেই আসবে না।'

'কেন, ওর কী হয়েছে?' মনের ব্যগ্রতাটাকে যথাসম্ভব চেপে প্রশ্ন করল জোদ্দা।

'মা', ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল সণ্টু, 'মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করছেন সুরুদির কী হয়েছে?'

আচ্ছা মুস্কিল তো। কী ফচকে ছেলে রে বাবা। লাহিড়ী-গিন্নী ঘরে ঢুকতেই জোদ্দা কান-ফান লাল ক'রে ব'লে উঠল: 'না—না —না, সে কি কথা, আমি কিছু বলিনি। তুমিই তো বলছিলে সণ্টু—'

'কী আবার হবে, কিচ্ছু হয় নি,' সণ্টুর মা বললেন। মেয়ের ঢং দেখে আর বাঁচিনে। এই সুরু, এখানে আয় না, আগে তো দিব্যি আসতিস মাস্টারমশাই-এর সামনে। মেয়ের কপালে একটু ফোঁড়া হয়েছে, তাই মুখ দেখাতে লজ্জা। বলিহারি যাই বাবা আজকালকার মেয়েদের ঢঙের।'

হঠাৎ অন্য ঘর থেকে প্রসন্ন লাহিড়ীর বাজখাঁই সুর কানে ভেসে এল, আর হো হো ক'রে হাসি। 'তাই নাকি? এই বেটী, এদিকে আয় তো দেখি। দেখি তোর ফোঁড়াটা কত বড় হল।'

একটু পরেই সুরভিকে সঙ্গে ক'রে প্রসন্ন লাহিড়ীর প্রবেশ। সুরভি কিছুতেই আসতে চায় না, তাকে যেন জোর ক'রে টেনে আনা। মিণ্টাও এসে হাজির। বাড়িসুদ্ধ লোক একটি ঘরে। সুরভি ছাড়া সকলের মুখেই বেশ একটি কৌতুকের হাসি, যেন সবাই মজা দেখছে। জোদ্দা তাকিয়ে দেখে, সুরভির বাঁ ভুরুটার ঠিক নিচেই বেশ ছোটখাটো একটি ফোঁড়া ঠেলে উঠেছে। আর জায়গাটা এমন যে তাতে চোখটা সম্পূর্ণ ঢাকা প'ড়ে যাবার দশা হয়েছে। বাঁ চোখটায় আজ কাজলও লাগাতে পারে নি। এমনিতেই তো এত ফর্সা রঙ মেয়েটার, তাই জায়গাটা একেবারে লাল হ'য়ে আছে।

ব'লে উঠলেন, 'হবে না? এত আম খাওয়া। আমি পয় পয় ক'রে বলেছি—'

'আহা, তোমারও বাপু একটু বাড়াবাড়ি;' প্রসন্ন লাহিড়ী বাধা দিয়ে বললেন। 'আম খাবে না? একশ' বার খাবে। আরো খাবে। আরো খাবে। এই তো সবে এতদিনে ল্যাংড়া ফজলি উঠতে আরম্ভ করেছে, বাজারে আসছেও। দেখবে, কাল থেকে কেমন ঝুড়ি ঝুড়ি আম আনাই।'

'তা বেশ তো,' লাহিড়ীগিন্নী পাল্টা ঝামটা দিয়ে বললেন, 'আনাবে। তোমার পয়সা, তুমি আনাবে।'

'নিশ্চয়ই আনাব। আম খাবে না? আরে বাবা, আজ না হয় ওর বাপ বার্ণপুরে গিয়ে খুব ইট পেটাতে শিখেছে, খুব সাহেব হয়েছে। কিন্তু চোদ্দ পুরুষের রক্তটা যাবে কোথায়? এই সহজ সত্যটা তুমি বুঝতে পার না? ও তো সিউড়িতলারই মেয়ে, না কী? আম খাবে না। খাবি বেটী, খুব খাবি। আরো খাবি। দিন ভোর খাবি। আমের মতন কি ফল আছে? দিশী বোম্বাই ল্যাংড়া ফজলি, সব খাবি।'

'আম খাক আর কাঁঠাল খাক, আমার ভারী ব'য়েই গেল। কেবল এসেছে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে, তারপর ফোঁড়া-টোড়া হ'য়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকুক, সেটা আমি চাই না। তাই বলছিলাম।'

'আ-হা-হা, তুমি তো গিন্নী হাসালে দেখছি। কোথায় কপালে একটু ফোঁড়া হয়েছে, তার জন্যে মেয়েকে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকতে হবে? আর ফোঁড়া হয়েছে তো হয়েছে কী? ফোঁড়া কি মানুষকে মেরে ফেলে? আর গরমে ফোঁড়া সকলেরই হয় —আমারও হয়েছে, একটু কষ্ট পাচ্ছে, তা তো দেখছিই। কিন্তু তাতে এত চেঁচামেচি করার কী আছে? ও-ফোঁড়া এমনিতেই নেমে যাবে। আর যদি না নামে, ধর কাল সকালেও যদি ভালোয়

লক্ষণ না দেখি, তো তেজা ডাক্তারকে ডাকব, বাস। হয়েছে কী?'

'সে কে কাকাবাবু?' ভয়ে ভয়ে আস্তে গলায় জিজ্ঞেস করল সুরভি।

ওর মনের ভাবখানা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিলেন প্রসন্নবাবু, তাই বললেন: সে কে জানিস? সে এক মস্ত বড় ডাক্তার, এক ধন্বন্তরি ডাক্তার। হতভাগা সিউড়িতলায় প'ড়ে রইল ব'লেই কেউ জানল না। সে কী করবে জানিস? সে আসবে একটা ছোট্ট ছুরি নিয়ে, ছোট্ট বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর ধারালো। তারপর তোর কপালটা ধ'রে ফোঁড়াটাকে ক্যাঁচ ক'রে কেটে দেবে—টেরই পাবি না। ফোঁড়া দেখবি রাতারাতি উবে গেছে।'

'অপারেশন?' ভয়ে সুরভির মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ হ'ল। ওকে আর অপারেশন বলে না। অত ভয় পাচ্ছিস কেন? তোরা না আজকালকার মেয়ে?'

'না না কাকাবাবু, ওসব অপারেশনে-টপারেশনের কোনো দরকার নেই। আমার এমনিতেই সেরে যাবে। তুমি তেজা ডাক্তারকে ডাকবে না।'

'আর যদি না সারে? যদি ফোঁড়াটা আরো বড় হ'য়ে প্রকাণ্ড হ'য়ে সমস্ত মুখটা ঢেকে ফেলে, তখন?'

'না-না-না, তা কখনো হবে না—দেখো তুমি, ঠিক সেরে যাবে। আর আমি আম খাব না, আম ছোঁব না।'

'আরে বেটী, আম খাওয়ার জন্যে কি এটা হয়েছে? এটা হয়েছে এই ভ্যাপসা গরমের জন্যেই। আজ তোর হয়েছে, কাল আমারও হ'তে পারে।'

'তা হোক, তবু তুমি তেজা ডাক্তারকে ডাকবে না। ওসব ছুরি-টুরি দেখলে আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে ম'রে যাব।'

শুনে প্রসন্নবাবু ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তবে তো দেখছি তেজা ডাক্তারকে ডাকতেই হয়, অন্তত তোর ভয়টা ভাঙানোর জন্যে।'

জোদ্দা এতক্ষণ চুপচাপ হ'য়ে সব শুনে যাচ্ছিল, ফোঁড়াটা দেখেই ওর মাথায় একটি ফন্দী আসে, কিন্তু বলবার মত সাহস ঠিক সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারে নি। সুরভিকে এতটা আতঙ্কিত হ'তে দেখে আর যেন থাকতে পারল না, ব'লে ফেলল: 'আমি একটি উপায় জানি, যাতে এসব অপারেশন-টপারেশনের কোনো দরকার নেই। অত্যন্ত সহজে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'সত্যি?' সুরভি যেন লাফিয়ে উঠল। 'বলুন না কাকাবাবুকে। সত্যি আপনি এত ভালো লোক।'

আবার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন প্রসন্নবাবু। 'দেখলে জয়দ্রথ, সঙ্গে সঙ্গে তুমি হ'য়ে গেলে এত ভালো লোক। তোর এত ভয়টা কিসের বেটী?'

সাহস পেয়ে জোদ্দা তখন তার প্রস্তাবটা অল্প কথায় গুছিয়ে বলল। সিঁড়িতলার গগন কবিরাজকে সে ভালো ক'রে চেনে, এবং সেই গগন কবিরাজের তৈরি বহরের ননী এই সব ফোঁড়া-টোড়ার পক্ষে একেবারে অব্যর্থ ওষুধ। এ বাজারের বহরের ননী নয়, এর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। এ একেবারে গগন কবিরাজের সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরি—বাড়িতে ঘুঁটে-টুটে পুড়িয়ে অত্যন্ত যত্ন ক'রে। প্রসন্নবাবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন—তিনি যদি বলেন, জোদ্দা আজই সন্ধ্যায় এখান হ'তে সটাং চ'লে যাবে গগন কবিরাজের বাড়ি, নিয়ে আসবে তাঁর বহরের ননী। চেষ্টা করতে দোষ কী? ভালো ফল যদি নাও হয়, অন্তত মন্দ ফল কিছু হবে না। আর দুয়েকদিনের মধ্যে যদি কোনো উপকার তেমন না দেখা যায়, তখন তো তেজা ডাক্তার আছেই।

সুরভির মুখের ভাবটাই যেন পাল্টে গেছে। প্রসন্নবাবুরও

প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হল না। বললেন, 'ও সব কবিরাজী-টবিরাজীতে আমার তেমন একটা বিশ্বাস নেই বুঝলে, তবে তুমি যখন বলছ যে এতে ভালো বই মন্দ হ'তে পারে না, তখন একবার চেষ্টা ক'রে দেখা চলতে পারে।'

'আজ্ঞে ভালো হবেই। ভালো না হ'য়ে যায় না। এই বহরের ননী কখনো বিফল হয় নি।'

'ওসব তো শোনা কথা। নিজের চোখে ঘটতে দেখেছ কখনো?'

'কী আশ্চর্য। আমার ছোট বোনটারই তো একটা ফোঁড়া হয়েছিল কিছুদিন আগে, এ তো কী ফোঁড়া দেখছেন, সেটা এই এত বড়। পাছায়। সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেল।'

'হ্যাঁ, তবে পাছা জায়গাটা তো তত ভয়ের নয়, এটা যে একেবারে চোখের কাছে।'

'আজ্ঞে চোখের কাছেই হোক আর যেখানেই হোক, ফোঁড়া তো ফোঁড়াই। তা' ছাড়া এ-ওষুধের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা কোনো রকমে একবার চোখের ভেতরে ঢুকে গেলে দৃষ্টিশক্তিকে খারাপ ক'রে দেবে। আর, চোখের মধ্যে ঢুকতে যাবেই বা কেন— সাবধানে লাগাবেন।'

'তথাস্তু, জয়দ্রথ।'

গগন কবিরাজের বহরের ননী জোদ্দার মুখটি রাখল আশ্চর্যভাবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কন্যার ফোঁড়া উধাও। জোদ্দার প্রতি সুরভির ব্যবহারও পাল্টে গেল যেন রাতারাতি। জোদ্দার সামনে তার যে আড়ষ্ট একটা ভাব ছিল আগে, তা যেন একেবারে চ'লে গেল। এখন নানান অছিলায় এসে হাজির হয়, এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে, কথা বলতে চায়, হাসে। ধীরে ধীরে আলাপ ঘনিয়ে উঠল, দুজনের চোখের আড়ালে পঞ্চশর কাজ করতে লাগলেন। চোখে চোখে কথা আরম্ভ হ'ল, চোখে চোখে হাসি। কী অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব উন্মাদনার দিন সেইগুলো, আজো ভাবলে কষ্ট হয়, বুকটায় মোচড়

দিয়ে ওঠে। সারাটা দিন সারাটা রাত কাটে বিহ্বলের মত, রঙিন জাল বুনে। ইস্কুলে পড়াতে গিয়ে মন পড়ে থাকে অন্য দিকে, শুধু ভাবনা সর্বক্ষণ কতক্ষণে পৌঁছবে লাহিড়ীবাড়িতে। জোদ্দা, শ্রীমান জয়দ্রথ খাঁ, এসব কী করেছ তুমি এককালে, কেন এসব তুমি করতে গিয়েছিলে, কী দরকারটা ছিল তোমার! এতদিন পরে ভাবতে ব'সেও যেন বুক ভেঙে যায়। মনে পড়ে, বহুদিন পরে মন্টুবাবু একবার ঠাট্টা ক'রে জোদ্দার কাছে তোলেন তাঁর পটলির প্রসঙ্গ, বলেন জোদ্দার মত মুখচোরাদের দেখলে নাকি পটলিরা গেরুয়া পরবে। হায় রে, জোদ্দার অতীতের তিনি কী জানেন? জোদ্দা তাঁকে বলে নি। কেনই বা বলবে? যাক গে।

তারপর ধীরে ধীরে আরম্ভ হ'ল হঠাৎ-হঠাৎ একটু হাত টিপে দেওয়া—ঐ সন্টুকে পড়াতে পড়াতেই, কিন্তু সন্টুর চোখের আড়ালে। হাত তো সুরভি কোনোদিন সরিয়ে নেয় নি। তারপর বিকেলের দিকে মাঝে-সাঝে এক-আধ দিন গঙ্গার ধারে বেড়ানোও আরম্ভ হ'ল, অবশ্য সুরভির সঙ্গে একলা-একলা নয়, সন্টু-মিন্টাও থাক। আশ্চর্য যা, তা হচ্ছে কেউ কিছু সন্দেহ করে নি—লাহিড়ীগিন্নীর অত তীক্ষ্ণ চোখকেও তারা দুজনে ধাপ্পা দিতে পেরেছে দিনের পর দিন। আর বাচ্চাগুলোর সামনেই যোগ বুঝে কখনো অতর্কিতে ফিস্‌ফাস ক'রে একটা গোপন কথা ব'লে নেওয়া, তাও কিছু শক্ত ছিল না। কিন্তু লাহিড়ীগিন্নী প্রথম থেকেই কেন ধরতে পারেন নি? সুরভির আকস্মিক পরিবর্তন কী করে তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ এড়িয়ে গেল? সেই চপলতা-ভরা দুষ্টু-দুষ্টু দুটি ছোট চোখ হঠাৎ যেন কোন মায়াবীর যাদুদণ্ডের ছোঁওয়ায় উদাসী জ্যোতিতে ভাস্বর হ'ল, এ তিনি না দেখে পারলেন কী ক'রে? যদি পারতেন, যদি ধ'রে ফেলতেন একেবারে গোড়ার দিকেই, তো পরের প্রচণ্ড অপমানটার হাত থেকে জোদ্দাও রেহাই পেত। কিন্তু দোষ তো তাঁর নয়, দোষ কারুরই নয়, দোষ জোদ্দার কপালের।

যাক গে। মনে আছে, একদিন জোদ্দা আর থাকতে পারল না। সন্টুকে পড়াতে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো সুরভির হাতে গুঁজে দিল। তাতে লেখা ছিল, 'ষটরাম দাসের ঘাটের কাছে যে-অশথ গাছটা আছে, তার তলায় কাল সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব। আসবে? কিন্তু একলা আসতে হবে। বড্ড জরুরী কথা আছে। কিছু মনে কোরো না?' সন্টুকে তখন বসিয়েছে জোদ্দা শক্ত একটা অঙ্ক দিয়ে। সুরভি পিছন ফিরে ঝট ক'রে চিঠিটা প'ড়ে নিল, প'ড়েই অতি ধীরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। ও সঙ্গে সঙ্গে একটি অদৃষ্ট হাসির আভায় তার সমস্ত মুখখানা রাঙা টুকটুকে হ'য়ে উঠল। সেই রাঙা মুখ তার সৌন্দর্যে ও মহিমায় লজ্জা দিতে পারে যে-কোনো সূর্যাস্তের দিগন্তকে।

তারপর যা হ'ল, তা তো পড়া পাতা। সে পাতা প'ড়েছে জোদ্দা বহুবার, তার একলা জীবনের বহু মুহূর্তে ফিরে ফিরে, সে-পাতা তার পড়া শেষ হয় নি আজো। এবং কী সেই 'বড্ড জরুরী কথা যা সে সুরভিকে বলতে চেয়েছিল সেই সন্ধ্যায়, এবং যা সে শেষ পর্যন্ত ব'লেও ছিল? সে কথা: 'আমি তোমায় ভালোবাসি।' আ-হা-হা, কী অপূর্ব নতুন একখানি কথা, যেন কেউ আগে শোনে নি, যেন তা কেউ কাউকে আগে বলেনি। সেদিনকার আশপাশের সেই বুড়ো থুত্থুড়ো পৃথিবীটা নিশ্চয়ই প্রাণ খুলে হেসে উঠেছিল, আর তার চেয়ে বুড়ো যে-আকাশটা, সেও নিশ্চয়ই হেসেছিল। জোদ্দা শোনেনি সে হাসি। আর অলক্ষ্যে হেসেছিল তার অদৃষ্টও। কিন্তু সে-হাসি অন্য ধরনের—বাঁকা ঠোঁটের কঠোর নিষ্ঠুর হাসি, হাসি মূর্ত শয়তানের। তবে সে-শয়তান হাসে হাসুক, এ-জীবনে ভালোবাসতেই হয়, নইলে চলে না। জোদ্দা জানে না কেন, কিন্তু বার বার মনে হয়েছে তার, যেন সকল মানুষই গোপনে বহন ক'রে চলে একটা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড সুপ্ত ভালোবাসা। সে-

ভালোবাসার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন না হ'তে পারে—কিন্তু সে-ভালবাসা আছে, যেমন ক'রে সে নিজে আছে। এবং সে-ভালোবাসা কোনোদিন চরিতার্থ হয় না, তার সেই ভালোবাসাকে মানুষ কোনোদিন প্রকাশ করতে পারে না, কোনো পাত্রও থাকতে পারে না সেই ভালোবাসার। শুধু মাঝে মাঝে যেমন ক'রে সমুদ্রের অতলান্ত গহ্বর হ'তে আগ্নেয়গিরি চাড়া দিয়ে ওঠে, এ-ভালোবাসাও তেমনি মানুষের হৃদয়ের অভেদ্য গহনে যেন এক ভূমিকম্পের অনুরণন তোলে হঠাৎ হঠাৎ। এই বিশেষ ও অবোধ্য ভালোবাসার অনুভূতি হ'তে নিস্তার তার কিছুতেই নেই, কারণ সে যে মানুষ হ'য়ে এসেছে এ-জগতের বুকে—গোরু হ'য়ে নয়, পাখি হ'য়ে নয়, গাছ হ'য়ে নয়, রাস্তা হ'য়ে নয়, রাস্তার কাঁকর হ'য়ে নয়।

'আমি তোমায় ভালোবাসি,' জোদ্দার একথার কোনো সরাসরি উত্তর সেদিন দেয় নি সুরভি। তার উত্তর সে জানিয়েছিল হঠাৎ 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনে নেমে এসে। এ সেই ঘাটের সন্ধ্যা, তামার পাতের মত প'ড়ে থাকা গঙ্গার সন্ধ্যা।

এবং মনে আছে, সুরভি কেঁদেছিল। এমন দিনে হয়তো সব মেয়েরাই কাঁদে। কেন কাঁদে? ওর চোখের জল জোদ্দা হাত দিয়ে মুছোতে যায়, তাতে কাজলটা ধেবড়ে যায়। ও তাই প্রশ্ন ওঠে সুরভির ঘন ক'রে কাজল পরার।

এবং ঐ একই দিন বিয়ের কথাও পাড়ে জোদ্দা—বলে ভালোবাসার কোনো মানেই হয় না যদি বিয়ে সম্ভব না হয়। সুরভি জানায়, তারও মত তাই। তারপরই জিজ্ঞেস করে:

'কিন্তু তোমরা না খাঁ? মুসলমান নাকি?

'দূর। মুসলমান হ'তে যাব কেন? খাঁ তো আমাদের উপাধি মাত্র, এখন যদিও নাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ-উপাধি আমাদের পাওয়া নবাবী আমল থেকে। নইলে আমরা ব্রাহ্মণ, খাঁটী ব্রাহ্মণ। আমার বাবা যজমানি পর্যন্ত করতেন।'

‘তবে তোমাদের আসল পদবীটা কী?’

‘আমরা চট্টোপাধ্যায়, রাঢ়ী শ্রেণীর বামুন, শাণ্ডিল্য গোত্র।’

‘সর্বনাশ। আমরা যে বারেন্দ্র।’

‘তাতে কী হ’য়েছে?’

‘কী ক’রে বিয়ে হবে তোমার সঙ্গে? তোমরা যে রাঢ়ী।’

‘রাঢ়ী তো কী? বলে বামুন-কায়েতেই কত বিয়ে হচ্ছে আজকাল আর তোমাতে-আমাতে হবে না? আসল কথা, তোমার মনের জোরটা কতখানি।’

সুরভি জানায়, তার মনে যথেষ্ট জোর আছে। এবং তারা দুজনেই প্রতিজ্ঞা করে যে যা-ই ঘটুক না কেন, যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, তারা বিয়ে করবেই। হয়তো তাদের দুজনকেই বহুকাল অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু তারা অটল থাকবে তাদের প্রতিজ্ঞায়।

তারপর ব্যাপারটার ইতি ঘটতে লাগে মাত্র কয়েকদিন। একদিন মালী দেখে ফেলে, যখন দুজনে সন্ধ্যের অন্ধকারে চুমু খাচ্ছিল বাড়ির পিছন দিকের পাঁচিলে হেলান দিয়ে। বাড়ির ভিতর দিকটায় নয়, বাইরে। জোদ্দা দেখতেই পায় নি, কিন্তু সুরভি মালীকে ঠিক দেখেছিল। তাই সে ‘ও’ ব’লে একটা শব্দ ক’রে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায়, জোদ্দার বাহুবন্ধন হ’তে জোরের সঙ্গে কোনো রকমে নিজেকে মুক্ত ক’রে।

সেদিন সন্ধ্যায় কিছুই ঘটল না, সন্টুকে জোদ্দা যথারীতি পড়িয়ে গেল। কিন্তু পরের দিন ইস্কুলে সন্টু তাকে একটি খাম এনে দেয়। তাতে ছিল দশ টাকার একটা নোট ও প্রসন্নবাবুর একটি চিঠি। তিনি জানিয়েছেন, সন্টুকে পড়াতে আসার আর কোনো দরকার নেই। ব্যাপারটা যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি অপমানজনক, বিশেষ ক’রে সন্টুটাকে যখন রোজই দেখতে হবে ইস্কুলে। আর সুরভি, তাকে না দেখে জোদ্দা থাকতে পারবে কী ক’রে?

দেখা হ'য়েও ছিল সুরভির সঙ্গে, তবে আর একটিবার মাত্র, এবং তাও শুধু দু' তিন মিনিটের জন্যে। ভিতর হ'তে সুরভির উপরও শাসন ছিল নিশ্চয়ই কড়া, তাকে চোখে-চোখে রাখা হত। বাড়িটার চারপাশে সন্ধ্যের অন্ধকারে জোদ্দা দুয়েকদিন ঘুরঘুর করেছে, কিন্তু বৃথাই। একদিন হঠাৎ সুরভি কোনো রকমে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তখন। সুরভি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে জোদ্দার হাত ধরে ও বলে: 'আমাদের বিয়ে হবেই হবে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।' তারপর আরো একটা দুটো কথা ব'লে যেমনভাবে এসেছিল সেইভাবেই পালায়।

কিন্তু এই সাক্ষাতের কথাটাও জানাজানি নিশ্চয়ই হয়, কারণ সেইদিনই সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা আটটা নাগাদ প্রসন্নবাবু জোদ্দার বাড়িতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন। এ সেই প্রথম বারের প্রসন্নবাবু নন, বরং বড়ই অপ্রসন্নবাবু। এসেই বললেন, 'দ্যাখো জয়দ্রথ, তোমাকে আমরা ঘরের ছেলের মত ক'রে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু প্রতিদানে যে-বিশ্বাসঘাতকতা তুমি করেছ আমাদের সঙ্গে, তারপরে লোকসমাজে তোমার আর মুখ দেখানো উচিত নয়। যাক গে, যা হ'য়ে গেছে হ'য়ে গেছে—তা নিয়ে আলোচনা করতে আমি আসি নি। শুধু বলতে এলাম, যদ্দিন সুরু আছে এখানে, ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা তুমি দয়া ক'রে কোরো না। ভালো হবে না। বলেই, জোদ্দাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

মা রান্নাঘর থেকে সব শুনেছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী হয়েছে রে, এসব কী উনি ব'লে গেলেন?'

আসলে তাঁর কেমন এক ধরনের সন্দেহ জেগেছিল আগেই, যে-মুহূর্তে জোদ্দার পড়ানোটা যায়। কিন্তু তাঁকে কী উত্তর দেবে সে? কোনো উত্তর দেবার মতন মনের অবস্থা কি আছে তার তখন? সে গরীব, খুবই গরীব, কিন্তু সেকথা তো সে কারুর কাছে

লুকোতে যায় নি। এবং গরীব ব'লে সে কারুর কাছে ভিক্ষেও চাইতে যায় নি। তবে? কেন লোকে তাকে এই ভাবে এসে অপমান ক'রে যাবে? সে তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছে, সত্য, কিন্তু তোমাদের মেয়েও তো তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। তবে?

তবুও তো অপমানের হয়েছে কী, চরমটি তখনো বাকী ছিল। দুদিন বাদে ইস্কুল সন্টু আবার একটা খাম নিয়ে এসে হাজির। জোদ্দার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি বললেঃ 'এটা সুরুদি' দিয়েছে। কেউ জানে না মাস্টারমশাই, আমি কারুকে বলব না। সুরুদি' বলেছে আমাকে চকোলেট কিনে দেবে।' খামের মধ্যে লেখা ছিলঃ 'কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এসো অশথ গাছটার তলায়। জরুরী কথা আছে। হয়তো দুয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হ'তে পারে। কিন্তু আমি আসবই। ভেবো না, আমি তোমাকেই বিয়ে করব।'

কী সেই জরুরী কথা, জোদ্দা তা কোনোদিন জানবে না। ওকে সুরভি ঐ চিঠিটা পাঠিয়ে ইচ্ছে ক'রে ছলনা করতে চেয়েছিল, তাও মনে হয় না। ব্যাপারটা সারা জীবন রহস্যই থেকে গেল। পরের দিন যথা সময় সে হাজির অশথ গাছটার নীচে। হঠাৎ পিছন হ'তে প্রসন্নবাবুর গম্ভীর গলার স্বর শুনে চমকে উঠল। 'জয়দ্রথ, একবার বাড়ির ভিতরে আসবে? তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।'

বাইরের ঘরটায় ঢুকে তাকে গৃহকর্তা বসতে বললেন, যেখানে সে দিনের পর দিন ধ'রে বসেছে সন্টুকে নিয়ে—শুধু আজ সেখানে সন্টুর বদলে রয়েছেন সন্টুর বাবা। ইনি সেই পরিচিত প্রসন্ন লাহিড়ী নন, এ-প্রসন্ন লাহিড়ীকে জোদ্দা আগে কখনো দেখে নি।

'প্রথমেই বলে রাখি,' প্রসন্নবাবু আরম্ভ করলেন, 'তোমার পাখি পালিয়ে গেছে। সে আর সিউড়িতলায় নেই। এবং তোমার

সঙ্গে যাতে তার আর কখনো দেখা না হয়, সে-ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই প্রথম সে আমাদের কাছে এসেছিল পুরো তিন মাসের জন্যে—তোমার করুণায় দুটি মাসও থাকতে পারল না। যাক সে কথা। এখন তোমাকে আমার দুয়েকটি প্রশ্ন আছে। কোন্ ধরনের ভদ্রসন্তান তুমি হে? তুমি নিজেকে ভেবেছ কী? এ-বাড়িতে ঢুকেছিলে ভালো মানুষের মত ছুঁচ হ'য়ে, আর আজ ফাল হ'য়ে বেরোতে চাও, না? বিয়ে করবে আমাদের বাড়ির মেয়েকে? জানো না তো, সুরু যেন ফুলের মত, আমার দাদার একমাত্র মেয়ে—কত পয়সায়, কত আদরযত্নে সে মানুষ। আর তুমি? তোমার আছে কী? তুমি একটা পচা তক্তা। সেই পচা তক্তার ওপর সারাজীবন ভর দিয়ে দাঁড়াবে আমাদের বাড়ির মেয়ে? এমন আশ্চর্য কল্পনা তোমার মাথায় এল কী করে? আমার মনে হয় তোমার মাথাটায় কিছু গণ্ডগোল আছে জয়দ্রথ, তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত। যাই হোক, তোমাকে ভালো কথায় সাবধান করার চেষ্টা করেছি আগেই, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় আর আসবে না। যদি কখনো জানতে পারি যে আবার তুমি এসেছ, হয় সন্টুর কাছে বা অন্য কারুর কাছে সুরুর খোঁজ খবর চাইতে, তো জেনো সেদিন তোমার পিঠের চামড়া আমি তুলে ছাড়ব। এখন যেতে পার।'

অপূর্ব। জোদ্দা গিয়েছিল ভালোবাসতে। এখন সমস্ত ব্যাপারটা হ'য়ে দাঁড়াল একটা অনবদ্য প্রহসন। জীবনে যেন এমনিতেই দুঃখের, কষ্টের কিছু ঘাটতি ছিল, যেন এই প্রচণ্ড অপমানটাও না পেয়ে চলছিল না। কিন্তু সুরভি, সে কেন একবারও লিখল না, তার কোনো খবর দিল না? আর তার এত প্রতিশ্রুতি এত প্রতিজ্ঞা, সে-সব গেল কোথায়? উঃ, যদি সে সত্যিই পেতে পারত সুরভিকে একদিন তো ঐ প্রসন্ন লাহিড়ীর অহঙ্কারের যথার্থ

জবাব সে দিত। অন্তত সেও যদি পারত সিঁউড়িতলা ছেড়ে চ'লে যেতে। তা তো হবার নয়, কিছুই হবার নয়—সে প'ড়েই রইল যেখানে ছিল, শুধু বছরে বছরে বুড়ো হওয়ার নিয়তি নিয়ে।

হয়তো সুরভি তাকে আর না লিখে ঠিকই করেছে। কারণ ছেলেবেলাকার একটা নিছক সিন্টিমেণ্টাল প্রেম বৈ তো নয়—এসব ঘটনার ইতিও হয়তো এই ধরনেরই হয়। কিন্তু জোদ্দার জীবনে রইল কী? সে তাই পড়ে রইল পুরোনো স্মৃতিকে আঁকড়ে যখের ধনের মত, জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল তার সেই ক্রুদ্ধ, আহত অহঙ্কারে, তার অভিমানে। তবু সময় দয়াময়, তার চেয়ে বড় ডাক্তার নেই। ক্ষতটা র'য়েই গেল, কিন্তু তার জ্বালাটা যেন ধীরে ধীরে অনেক ক'মে এসেছিল। আজ তা হঠাৎ যেন আবার জেগে উঠেছে। কারণ আজ হয়তো সে আবার ঐ একই ধরনের আরো একটি প্রচণ্ড মুহূর্তের সামনে এসে উপস্থিত। সুরভি কি সত্যিই তবে তার নিয়তির পথ চিরকালের জন্য চিহ্নিত ক'রে গেছে?

কিন্তু শুধুই কি সুরভি? চাকরিটার কী হ'ল? চাকরিটা হ'লে তার যেতেই হত না সিঁউড়িতলায়, দেখাই হত না সুরভির সঙ্গে। আর যদি হতই দেখা সুরভির সঙ্গে বা সুরভির মত অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে, তো তখন তার জোর থাকত অন্য রকম, কারুর সাধ্য থাকত না তাকে প্রসন্ন লাহিড়ীর মত একটা লোক এসে অপমান করার, তাকে পচা তক্তা বলার। কী ভাবেই একেবারে শেষ মুহূর্তে ফস্কে গেল চাকরিটা। আজ অবশ্য অনেকটা ভুলে গেছে জোদ্দা, তার ব'য়ে গেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, চাকরিটা ফস্কে গেল কেন? নিতান্ত পোড়াকপাল না হ'লে কি কারুর এমন একটা অভিজ্ঞতা হয়? সুতরাং সেক্ষেত্রেও, দোষ তার নিজেরি কপালের, অসিত গুঁই-এর নয়। অসিত গুঁই তো চেষ্টা করেছিল, প্রাণপণ

কিন্তু কার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, জোদ্দার কপালের বিরুদ্ধে ?

আশ্চর্য, এই কুড়ি বাইশ বছর পরেও অসিত গুঁই-এর নামটা মনে আছে। তাকে তো তেমন ভালো ক'রে সে কোনোদিন চেনে নি—কেবল কলেজে যা বছর দুয়েক এক সঙ্গে পড়েছিল। কোথায় যেন গান শিখত ছেলেটা, গীটারও বাজাত। কলেজের অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠানে তার ধুতিপাঞ্জাবী আর ভোঁতা নাক যেন আজো জোদ্দা দেখতে পাচ্ছে। গীটারে ছেলেটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজাত—'প্রায়ই বাজাত, তোমার হ'ল সুরু, আমার হ'ল সারা।' বেশ ভালোই বাজাত। জোদ্দারও তখন গানের সখ ছিল প্রচুর, গলাও ছিল—যদিও বাইরে গায়-টায়নি কখনো। এবং সেই সূত্রেই আলাপ তার অসিত গুঁই-এর সঙ্গে। অসিতের বাড়িতে সে বেশ কয়েকবার গেছে সন্ধ্যের দিকে—দুটো একটা গান তুলে নিতে। মনে পড়ে, একটা গান তার খুব ভালো লাগত—'কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।' প্রথম যৌবনের দিন তখন, চোখে যেন রঙিন চশমা পরা। বাড়ির দায়িত্বটা তখনো পাহাড় প্রমাণ হ'য়ে জাগে নি, কারণ বাবা তখনো বেঁচে। যাক গে।

স্পষ্ট মনে আছে, বি-এ পরীক্ষাটা সবে শেষ হয়েছে—চৌরঙ্গীর একটা মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে একদিন ছেঁড়া চটী জুতোটা সারিয়ে নচ্ছে। কাঠফাটা রোদ্দুর।

হঠাৎ পিছন হ'তে, 'কী রে জয়দ্রথ, এখানে কী করছিস ?'

চমকে তাকিয়ে দেখে, অসিত গুঁই। 'কী খবর ?'

'কী আশ্চর্য ভাখ, তোর কথাই ভাবছিলুম আজ সকাল থেকে।'

'আচ্ছা ?'

'আজ সন্ধ্যেবেলা একটা ফাঙ্‌শান আছে—গান করতে পারবি ?'

'সে কী রে—আমি কি কোথাও কখনো গেয়েছি যে গাইব ?'

'চল, একটু বসা যাক কোথাও, কথা আছে।'

ত্থজনে গিয়ে ঢুকল অনাদি কেবিনে। গানফান করতে সে পারবে না, জোদ্দা সরাসরি জানাল। তারপর একথা-সেকথার পর অসিত জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী করবি, এম-এ পড়বি নাকি?'

'আগে দেখি পাশ করি কি না।'

'পাশ ক'রে যাবি। তোর তো অনার্স ছিল না?'

'না। কিন্তু তোর তো ছিল। কেমন দিলি?'

'মনে তো হয় ভালোই দিয়েছি—অন্তত ফেল-এর ভয়টা নেই। তবে অনার্সটা জানি না কী হবে। একটা পেপার বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে। মরুক গে। আমি এমনিতেই আর পড়ব না ঠিক করেছি।'

'তবে? কী করবি?'

'কী হবে প'ড়ে? এম-এ পড়া মানে খামাখা আরো ছুটো বছর নষ্ট করা। তা ছাড়া, একটা চাকরি যোগাড় ক'রে ফেলেছি।'

'সত্যি নাকি? কোথায়?'

'দারুণ জায়গায়, বার্মা শেল-এ। চাদ্দিকে খোঁজ খবর রাখতে হয় স্যার, নইলে ভ্যাবা গঙ্গারাম হ'য়ে ঘুরে মরলে কি চলে?'

উক্তিটি তাকে উদ্দেশ্যে ক'রে বলা কি না জোদ্দা ঠিক বুঝতে পারল না। তাই একটু লজ্জিত বোধ করল। বলল: 'তোরা অবশ্য সুবিধে আছে। ইকনমিকসে অনার্স ছিল তো।'

'তাতে কী হয়েছে? কিসে অনার্স ছিল কি না ছিল, তা' জেনে তো তাদের ভারী ব'য়েই গেল। আসলে আমার দাদা তো আছেন, বার্মা শেল-এ অনেক কাল, তিনিই ব'লে ক'য়ে চাকরীটা করিয়ে দিয়েছেন।

'ও'.

'তবে শুনছি নাকি এবার অনেক নতুন লোক নিচ্ছে। হয়তে তোরও হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু তুই চাকরি করবি কি এখন?'

'পেলে নিশ্চয়ই করব, এক্ষুণি করব। কিন্তু পাচ্ছি কোথায় বল?'

'কী, বার্মা শেল-এ চাকরি করবি ?'

'নিশ্চয়ই, এক্ষুণি।'

'তবে, দাঁড়া। একদিন আসতে পারবি আমাদের আপিসে? এই ধর, দিন পাঁচ-সাত বাদে? ইতিমধ্যে আমি দাদাকে দিয়ে একটু চেষ্টাচরিত্র করিয়ে নেব। দাদার সাহেবটা এমনিতেই ভাল লোক, তায় দাদা তাকে পটিয়ে হাত করেছে বহুকাল। বলা যায় না, হয়তো কিছু হ'য়ে যেতে পারে। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই, কী বল?'

পাঁচদিন বাদে অসিতের আপিসে যেতেই সে ব'লে উঠল: 'কপাল ভালো রে তোর। চল, দাদার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি।' তার দাদা বললেন, 'চলুন আপনাকে আমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। কথাবার্তা সব হ'য়ে গেছে আগেই। শুধু সাহেব আপনাকে একবার দেখতে চান সামনাসামনি। হয়তো দুটো একটা মামুলি প্রশ্ন করবেন। ইংরিজী-টিংরিজী তো আসে একটু-আধটু?

বুক দুর দুর করছিল জোদ্দার। কিন্তু সাহেবটি সত্যিই বেশ অমায়িক—হাসি-হাসি মুখ। নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন, কদ্দুর পড়েছে জোদ্দা, ইত্যাদি। দু' মিনিটের মধ্যেই অসিতের টেবিলে সকলে ফিরে এল। কাজ সম্বন্ধে সাহেব কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি, কিন্তু অসিতের দাদা বলেছিলেন হ'য়ে যাবে—সাহেবের সঙ্গে আগে একবার দেখা ক'রে নেওয়া একটা ফরম্যালিটি মাত্র। সাহেব নাকি আগে থেকেই সব জানেন, ও তাঁর মতও নাকি আছে।

কেরাণীর চাকরি—অসিত বোঝাল। কাজ শিখে নিতে হবে, খুব সোজা কাজ। পরে উন্নতির সম্ভাবনাও নাকি প্রচুর। এবং ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি মাসান্তে শ'খানেক টাকা ক'রে মাইনে। সেই যুগের একশ টাকা, যখন সরকারী আপিসে কেরাণী ঢুকত পঁয়ত্রিশ টাকায়, বা ঐ ধরনের কিছু একটা মাইনেতে। অসিত আরো কত

লোভ দেখাল, বলল ওদের আপিসে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-টাণ্ডের সুবিধার কথা—তখন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-টাণ্ডের কথা সরকারী আপিসে কেউ শোনেও নি। মিথ্যে লোভ তো অসিত কিছু দেখায় নি—সে ঠিকই বলেছিল। চাকরিটায় থাকতে পারলে আজ জোদ্দা হয়তো মাসে পনের-ষোলশ' টাকা মাইনে পেত। তারপর তো যুদ্ধের দিনে এল বোনাস ইত্যাদি ব্যবস্থার সূত্রপাত, এটা-ওটা এ্যালাউন্স, কত কী!

কিন্তু এই সব বোনাস-টোনাস ছেড়ে দিয়েও মাসান্তে তখনকার দিনের সেই একশোটি ক'রে টাকা, সেইটাই বা কম কী? অসিতের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, জোদ্দা যেন হাতে স্বর্গ পেতে চলেছে। যেন বিশ্বাসই হয় না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যা ঘটল, তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই আর উঠল না। অসিতের দাদা সেদিন বলেছিলেন: 'আপনি সোমবার আপিসের সময় সটাং চ'লে আসুন। প্যাণ্ট আছে তো?'

'কিন্তু এ্যাপয়েণ্টমেনণ্ট লেটারটা তো পাই নি?'

'ঐ দিন পাবেন। ওটা তো ফরম্যালিটির ব্যাপার। আরো দুয়েকটা ছোট খাটো ফরম্যালিটি আছে, তাও সোমবার সকালেই ক'রে ফেলবেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ ক'রে দিন। এ তো আর সরকারী আপিস নয় যে গুচ্ছের ফরম্যালিটির পেছনে পাঁয়তারা কষতে কষতেই মাস খানেক কেটে যাবে।'

আগে কখনো পেণ্ট পরে নি জোদ্দা। প্যাণ্টের কাপড় কিনে, দর্জি দিয়ে প্যাণ্টটাকে তৈরী ক'রে, প'রে, একেবারে সাহেব সেজে জোদ্দা সোমবার আপিসে এসে হাজির। একটা লাল রঙের নেকটাই-ও কিনতে হয়েছিল, মনে আছে। সেটাকে খুঁজলে এখনো পাওয়া যাবে হয়তো তোরঙ্গের তলায়। যাকগে। কিন্তু নতুন সার্ট কেনেনি, তা' বেশ মনে আছে। একটা পুরোনো

ভালো ইস্তিরি-টিস্তিরি করা সার্ট ছিল, যদিও কলারের কাছটায় একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল, সে-ছেঁড়া নজরেই পড়ে না। এক জোড়া জুতোও কিনতে হয়েছিল—আর মোজাও, চৌরঙ্গীর ফুটপাত হ'তে। যাই হোক, আপিসে পৌঁছোতে সেদিন কী ব্যগ্রতা তার। সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল কত আশা নিয়ে—জেনে যে আজ হ'তে তার কাজ আরম্ভ হচ্ছে। সিঁড়ি তো নয়, যেন স্বর্গের সিঁড়ি।

অসিত তাকে দেখতে পেয়েই আড়ালে নিয়ে গেল। বলল: 'জানি না তুই কী ভাববি জয়দ্রথ, কিন্তু তোকে মুখ দেখাবার মত অবস্থা আমার আর নেই।'

ছলাৎ ক'রে যেন একটা রক্তের ঢেউ জোদ্দার বুকে এসে ধাক্কা মারল। তার হৃৎপিণ্ডটায় মনে হল কে যেন হাতুড়ি পেটাতে স্থরু করেছে। অসিত যা বলল, তার সব কথা তেমন ঢুকলও না তার কানে। তবু যা বোঝাবার ছিল সেই সকালে, যা বোঝবার জন্যে সেদিন নতুন প্যান্ট-ট্যান্ট কিনে সঙসেজে সে এসেছিল, তা সে বুঝল।

সাহেবদের পরেই যে-বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন সেই আপিসের বড় কর্তা, তাঁরই এক ভাগ্নে নাকি খালি পদটিতে ঢুকে পড়েছে। সেই একই সাহেব, যিনি নাকি জোদ্দার সম্বন্ধে কথা দেন অসিতের দাদাকে, তাকেই বাঙালী বড় কর্তাটি একেবারে ষ মুহূর্তে এমনভাবে বশীভূত করেন যে তিনি আর না করতে পারেন নি। ভাগ্নেটি নাকি সত্য ম্যাট্রিক পাশ করা—তখনো তার পরীক্ষার ফলও নাকি বেরোয় নি। কিন্তু তা হোক গে, সে তো বড় কর্তার ভাগ্নে। জোদ্দা কে?

অসিত গুঁই অবশ্য অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছিল। বলেছিল 'আরো চাকরি নিশ্চয়ই খালি আছে বা হবে এখানে। তোর জন্যে চেষ্টা ক'রে যাব। আর তুই তো সাহেবের সঙ্গে আগেই দেখা ক'রে নিয়েছিস, একটা কিছু হ'য়ে যাবেই। ঠিকানাটা রেখে যা, তোকে খবর দেব।'

জোদ্দা ঠিকানাটা রেখে যায়। কিন্তু কোনো আশা করে নি। ভালোই করেছিল, কারণ অসিত গুঁই তাকে কোনো খবরই দেয় নি, এবং অসিত গুঁই-এর সঙ্গে তারপর আর কখনো দেখাও হয়নি তার।

খেদ যে খুব একটা আছে তেমন, তা নয়। ইস্কুলের চাকরিটা পেয়ে যায় মাস দু'তিনের মধ্যেই। অবশ্য ইতিমধ্যে বাড়িতে একটি সর্বনাশও ঘ'টে যায়, বাবা মারা যান। যাই হোক, সেই শোকে দুঃখে ও সংসারের চিন্তায় এক মুহূর্ত সময় ছিল না বৃথা আক্ষেপের। তারপর তো সিউড়িতলা, নতুন চাকরি, ধীরে-সুস্থে গুছিয়ে বসা নতুন জীবনে। কেবল আজ মনে প'ড়ে গেল বার্মাশেল-এর অভিজ্ঞতাটার কথা। মনে হল জোদ্দার, তার জীবনটা তো লেখা হ'য়ে আছেই বিধাতার খাতায়, এবং সেই জীবনের গতিটা শেষ পর্যন্ত যাবে কোন্ দিকে, তার সম্বন্ধে দুয়েকটি অতি স্পষ্ট ইঙ্গিতও যেন বিধাতা জোদ্দাকে দিয়েছেন আগেই। আজকের এই ব্যাপারটাও হয়তো নেবে সেই একই নিয়তির পথ—শুধু অপেক্ষা করা ও দেখা, কেমন ক'রে শেষ নামে। কিন্তু সে না মানুষ? যতক্ষণ এতটুকুও আশা আছে, ততক্ষণ সে কেন যুদ্ধ করবে না? শত্রু হোক না তারই দুর্দম নিয়তি—তাই ব'লেই কি সে সব আশা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা এলিয়ে ব'সে থাকবে?

কিন্তু হাত-পা এলিয়ে ব'সে থাকুক আর নাই থাকুক, যুদ্ধ করুক আর নাই করুক, যা হবার তা তো হবেই, ও তা হ'য়ে এসেছেও। জীবন ভোর শুধু কতকগুলো আজে বাজে কথাবার্তা, অর্থহীন আলাপ, কয়েকটি নিষ্ফল সূর্যাস্ত, দারিদ্র্য আর ঘাম, রিক্ততার গ্লানি আর ক্লান্তি স্মৃতির এই তো সঞ্চয় তার। আর আজ আসে নি মণ্টুবাবু, কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছে, তাই ব'সে ব'সে শুনে যেতে হ'ল কোথাকার কোন এক রাখাল চক্রবর্তীর কতকগুলো আজগুবি এ্যাক্সিডেণ্টের কাহিনী। ও স্মৃতিতে তাও

সঞ্চিত হ'য়ে রইল—তা নিয়েও ভাবনা। তা নিয়েও বুকটা ধড়ফড় করল, এখনো করছে। যেন জোদ্দার আর কিছু করার নেই, যেন তার সময়ের দাম নেই—যেন ব্যর্থতা আর তুচ্ছতা সঞ্চয় ক'রে চলাই তার পেশা। হাসিও পায়, দুঃখও ধরে।

অথচ আকাশ ভ'রে এত আলো পৃথিবীতে, এত লোকের এত হাসি, এত আনন্দ, এসবও তো রয়েছে একই জগতে। অনেক লোক তো অর্থ পেয়েছে জীবনে—অন্তত বাইরে থেকে দেখে তো তা-ই মনে হয়। না তারা আসলে কেউই অর্থ পায়নি, সকলেই জোদ্দার মতন—ভেতরটা ফাঁপা, ফাঁকা, সেখানে সঞ্চিত শুধু অতৃপ্তি। একই অর্থহীনতার ক্লান্তি, রিক্ততার গ্লানি?

কে জানে। সকলের সম্বন্ধে সব জানা সম্ভব নয়—এবং তা জেনে বা জানতে চেয়ে লাভটাই বা কী? বলে আপনি পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

অবশ্য বার্মা শেল-এর ঘটনাটার আগে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোনো পরিচয়ে সে আসে নি। যে-প্রকাণ্ড মমতাহীন জীবনটা প'ড়ে আছে ঘরের বাইরে, সেখানে খেটে খেতে হয়, সে-জীবনসম্বন্ধে তার কোনো ধারনাই ছিল না। সেই জীবনটাই যথার্থ রোদ্দুরের, ঘামের, অন্তহীন খটখটে প্রান্তরের একটা প্রথম আভাস সে পেল, যখন চাকরিটা অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে একেবারে শেষ মুহূর্তে যেন হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গেল। সেইদিনই প্রথম এই দুর্দান্ত প্রচণ্ড জ্ঞানের উদয় তার: এ-জগতে হবে বললেই হয় না জিনিস, অনেক জিনিস যা হবে ব'লে ব'সে আছে—তারা হবে না কোনোদিন। তাদের একটার পর একটা না-হওয়ার গ্লানিতে শুধু বিপর্যস্ত হবে স্মৃতি, দিন কাটবে। তারপর এমনি ক'রে বুড়ো হওয়া একদিন, ম'রে যাওয়া, ব্যস। খাসা জীবন' এ-জগতে মানুষ-জন্ম নিয়ে আসার তার দরকারটা ছিল কী?

আর সমস্ত স্মৃতির ভাণ্ডারটাই বা তার এমনভাবে বিপর্যস্ত হ'তে

গেল কেন ? যেন একটা জগদ্দল পাথর, শিকল দিয়ে বাঁধা পায়ের সঙ্গে—তাকেই ব'য়ে বেড়ানো জীবনের পথে, সমস্ত নীরব একলা মুহূর্তে। অন্তত একটা দুটো ছোটখাটো স্মৃতি একটু অন্য ধরনের, তাও তো থাকতে পারত সেই ভাণ্ডারটায়। শৈশবের কোনো একটা ঘটনা, একটা হাসির বা আনন্দের কথা, একটা ভীষণ কোনো মজার কাণ্ড, যা ভেবে আপনার মনে কখনো কখনো প্রাণ খুলে হেসে উঠতে পারা যেত পরের জীবনে—মনে রাখবার মত সেই ধরনের একটা কিছু থাকলেও ভারটা হয়তো একটু লাঘব হত। কিন্তু স্মৃতি তো কল্পনা নয়—স্মৃতি থাকবে কেমন ক'রে যদি সেই ধরনের কোনো ঘটনা না ঘ'টে থাকে ? না, জোদ্দার শৈশবটাও একটা দগ্ধ প্রান্তরের মত, একটা দুঃস্বপ্ন। সাধে কি তার মুখ এত রুক্ষ, এত বিষণ্ণ ? হাসতে যে সে শেখেনি। সে-অধিকার তাকে দেওয়া হয় নি।

সে এক ফ্যাকাসে শৈশব—রক্তহীন, বর্ণহীন, আনন্দহীন। তার চেয়ে আরো সাংঘাতিক যা', সে-শৈশব কেটেছে এক মূঢ় সঙ্গীহীন স্তব্ধতায়। দুটি-একটি সঙ্গী অবশ্য জুটেছিল, তাদের সঙ্গে সে খেলাও করেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু তখনো তার বোঝবার মত বয়স তেমন হয় নি—তাই সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশায় বাধাটা কম ছিল। একটু বয়স হ'তেই দেখল, তারা গরিব, বড্ড গরিব, তাদের বাড়িতে নিত্য অভাব, সংসার চলে না। গরিব তো সকলেই, বড়লোক আর কে ? তবু তাদের মত যথার্থ গরিব তার জানাশোনার মধ্যে ছিল না। মনে আছে, বাড়িতে কত ভিখিরী এসেছে, এক মুঠো চালও পায়নি কখনো। অথচ সেই সব ভিখিরীই যখন অন্য বাড়িতে ঢুকত, কিছু-না-কিছু ভিক্ষে সকলেরই মিলত। একজন বুড়ো ভিখিরীকে বেশ মনে পড়ে, সে পাশের বাড়িতে খঞ্জনি বাজিয়ে গান ধরত :

'হরিনাম সত্য, গুরুনাম সত্য, পথের সম্বল কর সার।

ভবে এসেছ একা, যেতে হবে একা, সঙ্গের সাথী কেউ নয় তোমার।'

তার ফোকলা দাঁত, গায়ে ছেঁড়া ময়লা নামাবলী, কপালে চন্দন। কখনো সে গেয়ে উঠত :

'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল সখি গো…।'

আশপাশের বাড়ি হ'তে ছেলেমেয়ের দল এসে ভিড় করত গান শোনার জন্যে, জোদ্দাও যেত। বুড়োটার মিলত কখনো নারকেল নাড়ু, কখনো বাড়ির তৈরি সন্দেশ, কখনো বা এক মুঠো চাল, দুয়েকটা আলু-পটল। কতবার মনে হয়েছে জোদ্দার, ঐ বুড়ো ভিখিরীটাকে কেন ও ওদের বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে না, কেন জোদ্দার মা কখনো নারকেল নাড়ু করেন না? যা ভেবে তার সবচেয়ে খারাপ লাগত, তা হচ্ছে সকলেই ভিক্ষে দেয়, ওরা কেন ভিক্ষে দিতে পারে না?

অবশ্য এ-প্রশ্নের উত্তরটা অল্পদিন বাদেই সে বুঝতে পারে। ওরা ভিক্ষে দিতে পারে না, কারণ এক অর্থে ওরা নিজেরাই ভিখিরী, ওদের সংসার চলে দেনা ক'রে। নারকেল নাড়ু ভিখিরীকে কী ক'রে দেবে, যখন নিজেরাই তা কোনোদিন খেতে পায় না? বাড়িতে মা'র মুখ সব সময়ই মলিন, বাবার মেজাজ তিতিবিরক্ত। এবং যেহেতু জোদ্দা ছেলেবেলা হ'তেই ছিল অত ভাবপ্রবণ, ধীরে ধীরে শীঘ্রই সে তার ও অন্যান্য সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে একটা দূরত্বের ভাব আপনা হ'তেই অনুভব করতে আরম্ভ করল। মনে হতে লাগল, তার বন্ধুরা যে-জগতের অধিবাসী ঠিক সেই জগতের অধিবাসী হয়তো সে নয়, যে-কাজ তার বন্ধুদের পক্ষে শোভন ঠেকতে পারে, সে-কাজ করা হয়তো তার ঠিক শোভা পাবে না। তারপর থেকেই যেন মেলামেশার ভাবটা হঠাৎ একেবারে ক'মে এল—ইস্কুলে যেত সমানই, বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তাও হত কিন্তু সে নিজেকে কিছুতেই আর খাপ খাওয়াতে পারত না পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। সঙ্গীহীন শৈশব, তার চেয়ে সাংঘাতিক আর কী ঘটতে পারে?

তবু তার চেয়ে সাংঘাতিক আরো কিছু ঘটেছিল। 'তাতে আর কী? ছেলেটাকে আগে মেরে ফেললেই হবে।' গভীর রাত্রে সেই ফিসফিস ক'রে বলা কথা যেন এখনো তার কানে বাজছে। এখনো গা শিউরে ওঠে। এখনো মনে হয়, তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র যেন কেউ কোথাও সর্বক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে করছে। বাবা-মা আর নেই, কিন্তু বাবা-মাই যদি এমন একটা কথা মনে করতে পেরে থাকেন একদিন তো অন্য লোকে পারবে না কেন? সত্যি, কী ভয়ংকর আশংকার মধ্যে দিয়েই না তার সারা শৈশবটা কেটেছে। কেবলি ভয়, এই বুঝি তাকে মেরে ফেলে—হয়তো কাল সকালে তাকে ম'রে প'ড়ে থাকতে হবে। অবশ্য সে আজ অনেক দিনের কথা, এবং সে-ভয়ের কথা মনে করলে খানিকটা হাসির ভাবও আসে আজ। তবু সে জানে, কত বড় যাতনায় অস্থির হ'লে মানুষ তার নিজের সন্তানকে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে। তাই দুঃখও হয় তার মা-বাবার জন্যে, তাঁদের প্রতি প্রচণ্ড সহানুভূতি ও করুণার একটি মিশ্র অনুভূতিতে সমস্ত মনটা সিক্ত হ'য়ে ওঠে। আজ জোদ্দা প্রার্থনা করে তাঁদের আত্মার শান্তি চেয়ে। কিন্তু তাঁরাও কি তাকে একদিন কম দুঃখ দিয়েছেন, কিছু কম ভয় দেখিয়েছেন? তার দোষটা কী, তাকে তাঁরা এনেছিলেন কেন এ-জগতে? মাঝে মাঝে মনে হয়, জোদ্দার, জীবনটাকে যদি কোনো শিল্পী তার ছবির বিষয় করে, সেই ছবিতে শিল্পী এলোপাথাড়ী লাগাবে রঙ ধুলোর আর তুচ্ছতার, ও মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও একটি ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারের দাগ, যাতে অঙ্কিত হবে জোদ্দার নামহীন আতঙ্কের নিভৃত চেতনা। নিরাপত্তা কাকে বলে, তা' জোদ্দা জানে নি কোনোদিন। শৈশবেও নয়—বিশেষ ক'রে তো শৈশবে নয়ই।

তখন তার বয়স হবে সাত কি আট। ঠিক বোঝবার বয়স সেটা নয়—তবে দুঃখীর ঘরের ছেলে বুঝতে শেখে তাড়াতাড়ি। জোদ্দাও তখনি কেমন একটা আন্দাজে আঁচ করতে আরম্ভ করেছে

তাদের দুঃখটা, তাদের প্রচণ্ড দারিদ্র্যটা, তাদের সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক অভাবটা। মা-বাবার এক মাত্র ছেলে সে, আর কোনো ভাইবোন নেই। বাবা বেচারা ভালো লোক, খুবই ভালো লোক, উদার হৃদয়, অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, এবং পড়াশুনোও করেছিলেন। পড়েছিলেন বোধ হয় বি-এ পর্যন্ত, কিন্তু বি-এ পাশ করতে পারেন নি। তাঁর দীর্ঘ অস্থিসার চেহারাটা মনে পড়ে, বড় বড় চোখ দুটো এখনো জোদ্দা দেখতে পায় কল্পনায়। অত বড় চোখ নিয়ে কেন তিনি জন্মেছিলেন, কী দেখতে? দেখে তো গেলেন শুধু দুঃখ।

বাবা বেচারার হৃদয়ের গুণ ছিল অনেক। কিন্তু পয়সা উপায় করা তাঁর ধাতে ছিল না। এ-জগতে খেটে খায় সবাই, কিন্তু কয়েকটা অদ্ভুত লোক আছে যারা কিছুতেই কোনো পয়সা উপায় করতে পারে না। তার বাবাও ছিলেন সেই রকম, অন্তত তাঁর জীবনের অনেক কাল ধ'রে। তার মানে এই নয় যে তিনি চেষ্টা করেন নি, বাড়িতে শুধু শুয়ে সময় কাটিয়েছেন। চেষ্টা তিনি অজস্র করেছেন কিন্তু কপালে না থাকলে হবে কী? জোদ্দা যখন জন্মায় নি, কলকাতার কোন একটা আপিসে নাকি চাকরি করতেন। অবশ্য কলকাতায় থাকতেন না তাঁরা, কলকাতা হ'তে মাইল পঁচিশেক দূরে একটা ছোট শহরে বাস করতেন। জোদ্দার শৈশবের একটি বড় অংশ কেটেছে সেই সহরে, যেটা তাদের দেশ। তারপর একদিন কী হ'ল, সে-চাকরি তাঁর আর রইল না, ও তিনি যজমানি আরম্ভ করলেন। কিন্তু শুধু যজমানি ক'রে কি সংসার চলে? তাই কিছুদিন বাদে যজমানি করাও ছেড়ে দিলেন, ছেড়ে দিয়ে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা কেরাণীর কাজে ঢুকলেন। কিন্তু তাও চলল না বেশি দিন। হয়তো কেরাণীর চাকরিটাই ছিল সাময়িক, অথবা সে-কাজ তিনি নিজেই ইচ্ছে ক'রে ছেড়ে দেন, কিম্বা তাঁর কাজ হয়তো পছন্দ হয় নি কর্তৃপক্ষের। কারণ যাই হোক না কেন, চাকরিটা তাঁর রইল না—বড় কথা সেইটাই।

বাড়িতে একদিকে নিত্য অভাব, হাঁড়ি চলে কি চলে না, এই অবস্থা। মা আড়ালে কাঁদেন, কারণে-অকারণে মা-বাবার মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়, বাবা একটুতেই রেগে ওঠেন, জোদ্দাকে ধমকান, মারেন—তাও মনে পড়ে। অবশেষে বাবা একদিন হঠাৎ মণিহারীর দোকান খুলে বসলেন। হয়তো চালডালও বিক্রি করতেন সেই দোকানে—কিন্তু খেলনাও বিক্রী করতেন, মনে আছে। একবার জোদ্দাকে একটা কাঠের ঘোড়া এনে দেন, ছোট্ট ঘোড়া, তার সামনের একটা পা তোলা ওপর দিকে। তার শৈশবে হয়তো মনে রাখবার মত স্মৃতি ঐ একটি খেলনাই। আর ভোরে উঠে রোজ বিছানায় জোদ্দার ডিগবাজী খাওয়া' কখনো বাবার কোলে গিয়ে পড়া, কখনো মা'র কোলে গিয়ে পড়া। কী আনন্দ! তাও আবছা আবছা মনে পড়ে।

কিন্তু ডিগবাজী খেয়ে আর কদিন যাবে? যে-বিষণ্ণতা বাড়ির সর্বত্র, মা-বাবার চোখে মুখে, তা অনুভব না ক'রে সে কতদিন পারবে? সে তখন আর তেমন ছোটটি আর নেই, সাত-আট বছর বয়স হয়েছে তার। সে বুঝতে পারে, বাবার দোকান আর চলছে না। দুবেলা দুমুঠো খেতে সমানেই পাচ্ছে, যদিও পয়সা আসছে কোত্থেকে তা সে আন্দাজ করতে পারে না। তারপর একদিন এল সেই দারুণ রাত্রিটা।

মনে পড়ে, সেদিন কালবৈশাখীর ঝড়ে অনেকগুলো গাছ উপড়ে পড়েছে, বহু বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। কত রাত ঠিক খেয়াল নেই, ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। চিরকালই জোদ্দার অত্যন্ত হালকা ঘুম। রোজকার মত শুয়ে আছে মা-বাবার সঙ্গে এক বিছানায়, মেঝের ওপর। অন্ধকার ঘর, গভীর রাত— কোথাও এতটুকু শব্দ হচ্ছে না। আধো-ঘুম আধো-জাগা এক আচ্ছন্ন অবস্থায় চুপ ক'রে শুয়ে আছে বিছানার এক ধারে—পাশে মা, মা'র পাশে বাবা। হঠাৎ কানে এল বাবার ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলা। মা'কে ডাকছেন।

'শুনছ ?'

'কী বল ?' বললেন মাও অত্যন্ত নিচু গলায়।

'ঘুম নেই, না ?'

'জোদ্দার গা-টা একটু গরম-গরম ঠেকছে, জানো ? জ্বর না হয়।'

'কী করি বল ? আর তো পারিনা।'

খানিকক্ষণ চুপ চাপ। আবার বাবা বললেন ঃ

'মহাদেব মাস্টারের সঙ্গে দেখা হ'ল আজ, রাস্তায়। বললেন, উনি নাকি খুব সন্তুষ্ট জোদ্দার ওপর। ছেলেটা সত্যিই এত ভালো —কেন যে আমাদের ঘরে এল জানি না। যাক, মহাদেব মাস্টারের দয়ায় ওর ফ্রীশিপ্‌টা হ'য়ে গেছে, পড়তে পাচ্ছে।'

'ভন্টু তো না পায় বই, না পায় খাতা-পেন্সিল—কিচ্ছু না।'

'কী করব বল ?' বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

'একটা কিছু কর তুমি, সত্যি—আর যে চলছে না।' অন্ধকারে কিছু না দেখেও জোদ্দা বুঝল, মা কাঁদছেন। আবার বললেন মা ঃ 'লোকের কাছে আমি তো আর মুখ দেখাতে পারি না। এখনো লোকে ধার দিচ্ছে, কিন্তু আর কদ্দিন দেবে ? দু বছর ধ'রে আমরা কেবল ধারই করে চলেছি, শোধ দেবার নাম নেই।

'কোত্থেকে শোধ দেব বল ? জানো তো কত উপায় করি।'

খানিকক্ষণ থেমে বাবা আবার বললেন, 'আজ তোমায় একটা কথা বলতে চাই, একটা ভীষণ কথা।'

'কী ?'

'ভেবেছিলাম বলব না, কাজটা না জানিয়েই করে ফেলব। কিন্তু যদি না বলি, তাহলেও হয়তো তোমাদের প্রতি একটা মহাপাপ করব। এমনিতেই তো পাপের সীমা নেই আমার। কী অপদার্থ স্বামী আমি, কী অপদার্থ বাপ—নিজের ওপর ঘেন্না ধ'রে যায়।'

'ওসব পাপ-ফাপের কথা না ভেবে ঘুমোবার চেষ্টা কর।

এতলোকে তো কাজ পায়, তুমি কেন পাবে না? একটা চাকরি পাওয়ার চেষ্টা কর, সত্যি।'

'কোথায় চাকরি, রমা? কত চাকরি তো করলাম জীবনে, কোনোটাই কি রইল? আমার কিছুই হবে না—কপাল যে মন্দ। যাক গে। শোনো রমা, এভাবে আমি আর পারছি না।'

'আমিই কি পারছি?'

'তা নয়। তবে আমি যে সংসারের কর্তা—তোমাদের খাওয়ানো পরানোর দায়িত্ব তো আমারই। তোমাদের এ-দুঃখ চোখ দিয়ে আমি আর দেখতে পারছি না। আমি আত্মহত্যা করব ঠিক করেছি।'

'এসব কী বলছ তুমি? ছি-ছি-ছি-ছি-ছি। আমাদের কী হবে, সে কথা একবারও ভেবে দেখেছ কি?'

'ভেবে দেখেছি অনেক, কিন্তু কোনো সমাধান পাই নি। যা সামান্য বাড়ি-ঘর-দোর রয়েছে, তা বিক্রী ক'রে কিছু পয়সা আসবে। তাতে হয়তো দেনাটা শোধ ক'রেও তোমার হাতে কিছু বাকী থেকে যাবে। তারপর তুমি চ'লে যাবে তোমার দিদির কাছে। কোনোরকমে জোদ্দাটা একবার মানুষ হ'তে পারলেই আর ভাবনা থাকবে না।'

'এসব কথা ভাবতে লজ্জা করেনা তোমার? এত বড় কাপুরুষের মত একটা কাজ তুমি কী ক'রে করবে? আমি কারুর দরজায় ভিখিরীর মত যেতে চাই না।'

'কিন্তু আর যে কিছু হবার নেই রমা, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না।'

'আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমিই বুঝতে পাচ্ছ না। সংসারের দায়িত্ব তুমি যদি না নিতে পারলে তো মেয়েমানুষ হ'য়ে সে-দায়িত্ব আমি কেমন ক'রে নেব? আমাকে দিয়ে তুমি ঝি'র কাজ করাতে চাও কোথাও? ছেলেটার মুখ চেয়ে তা করতেও রাজী আছি, কিন্তু তাতেই বা কত টাকা আসবে?

কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি বলছি রমা, আমি আর দেখতে পারছি না। শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন দুমুঠো অন্নও আর যোগাতে পারব না। না না, আমি দেখতে পারব না। তার চেয়ে আত্মহত্যাও ভালো, এবং তাই আমি করব।'

'বেশ, তুমি আত্মহত্যা করলে আমিও আত্মহত্যা করব।'

খানিকক্ষণ থেমে বাবা বললেন ঃ 'সেটা কিন্তু আসলে মন্দ কথা নয়! হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটেই হবে সবচেয়ে ভালো ফন্দী। এসো, দুজনে এক সঙ্গে আত্মহত্যা করি।'

'বাঃ, আর ছেলেটার কী হবে?'

'তাতে আর কী? ছেলেটাকে আগে মেরে ফেললেই হবে। তারপর আমরা দুজনে মরব।'

শুনে জোদ্দার সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। এত ভয় পেল যে ককিয়ে কেঁদে ওঠার শক্তি পর্যন্ত রইল না।

'তুমি ঘুমোও। এসব আবোল-তাবোল ভাবার কোনো দরকার নেই।' মা বললেন দৃঢ়স্বরে।

'কিন্তু করতে তো হবে একটা কিছু।'

'যা করতে হবে, তা করব। কিন্তু কথা দাও, আমাকে লুকিয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে যাবে না।'

'বেশ, কথা দিলাম।'

'এখন ঘুমোও।'

হয়তো মা-বাবা ঘুমোতে পেরেছিলেন পরে, কিন্তু সেরাত্রে জোদ্দার আর ঘুম হয় নি। খালি মনে হয়েছে তার, বাবা-মা খেতে পান না, তাই তাকে মেরে ফেলবেন। হয়তো গলা টিপে, কিম্বা বিষ খাইয়ে, কিম্বা অন্য কিছু ক'রে। ঘুমোতে সে পারেনি অনেক রাত। ভয়ে ভয়ে থেকেছে দিনের পর দিন, কখনো ভেবেছে, মা'র পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে, কেঁদে বলবে 'আমাকে তোমরা মেরে ফেলো না, তোমরা যা বলবে আমি তা-ই করব।'

কখনো ভেবেছে, ছুটে কোথাও পালিয়ে যাবে বাড়ি হ'তে, বাবা-মা'র চোখের বাইরে অনেক দূরে। হয়তো সে সত্যিই পালিয়ে যেত কোথাও, ভিড়তো চোর-ছ্যাঁচোড়ের দলে—যদি থাকত কলকাতার মত কোনো সহরে। কিন্তু ছোট সহরে তো সে-ধরনের সুযোগ বড় একটা নেই—তা ছাড়া যে-আবহাওয়ায় সে মানুষ, তাতে বদমায়েশ ছেলে-টেলের দলে ঢোকার মত কোনো সমাধানের কথা মনে আসাই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাইরের জগতের সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞান তার ছিল? তা ছাড়া ছিল তার স্বাভাবিক কুণ্ঠা, অত্যধিক লাজুকতা, সঙ্গীহীনতা। তাই শেষ পর্যন্ত কিছুই ক'রে উঠতে পারে নি—শুধু এক প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কেটেছে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। এবং এই ভয়ের ভাবটা তার যায় নি কোনোদিন, হয়তো আজও নয়। তার বাবাকে অবশ্য আত্মহত্যা করতে হয় নি, শীঘ্রই তিনি চাকরি পেয়ে যান কলকাতার একটা হাসপাতালে। আবার একটা কেরাণীর চাকরি। এবং সে-চাকরি ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। তাদের কলকাতায় আসার পর থেকে বাড়ির অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাবে ভালো হ'তে সুরু করে, এবং বছর দুয়েকের মধ্যেই মালতীর জন্ম হয়। তবু জোদ্দার ভয়টা ঘোচে নি।

হ্যাঁ, সবই মনে পড়ে—কোন্ শাস্তি বিধাতা তাকে দিয়েছেন, কবে, কোথায়? আর দেশ ছেড়ে-ছুড়ে কলকাতায় চ'লে আসা, সত্যভামা ইনস্টিটিউশানে ভর্তি হওয়া, সহুরে সহপাঠিদের তাকে নিয়ে অহরহ ঠাট্টা করা, তার গায়ে ব্যাঙ ছেড়ে দেওয়া, জামার মধ্যে দিয়ে তেলাপোকা ঢুকিয়ে দেওয়া, হাজার রকমের অসহ্য অত্যাচার, টিটকিরি—কোন, অভিজ্ঞতাটা তার কবে মুখরোচক ঠেকেছে? তার ওপর সবচেয়ে বেশি ক'রে যা ছিল, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ও সহস্রগুণে জটিলতর এক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে ক্রমাগতই খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা। এতদিন ধ'রে সে যা-কিছু

চিনে এসেছে, যা-কিছু জেনে এসেছে আপনার জগতের জিনিস ব'লে, সেই সব রাস্তা-পথ-ঘাট মানুষের মুখ, তারা যেন নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। আর দেখা হবে না তাদের সঙ্গে।

এই তো ইতিহাস জীবনের। শুধু কি তাই? ঠিক যখন জীবনটা একটু গুছিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে, সংসারের ভাবনা-চিন্তা মনে হচ্ছিল যেন একটু কম, বাবা মারা গেলেন সেই সময়। হঠাৎ, একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত। কলেরায় মহামারী লেগেছে তখন সেই বছরে, যেমন তা আজো প্রতি বছরেই লাগে কলকাতায়, ও তারা থাকত বস্তির পাশেই একটা জায়গায় মাত্র একখানি ঘর ভাড়া ক'রে। বাবার যে কলেরা হয়েছিল, তা বুঝতে না-বুঝতেই তাঁর মৃত্যু। যদিও তিনি একদিন জোদ্দাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন, এবং, যদিও সেই ঘটনার পর থেকে সে তাঁকে চিরকাল কেমন এক সন্দেহ মিশ্রিত ভয়ের চোখে দেখে এসেছে, তাঁর কথা মনে করলে আজো জোদ্দার বড্ড কষ্ট হয়, মনটা ভ'রে ওঠে এক অপরিসীম করুণায়। কারণ সমস্ত পিতার মতনই অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, জোদ্দার ভালো বই মন্দ তিনি কখনো চান নি। তবু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুটাকে সে আজো যেন সম্পূর্ণ ক্ষমা ক'রে উঠতে পারে নি। সেই ঘটনাটি নিয়েও তার মনের গোপনে যেন ঘোর এক অভিযোগ সঞ্চিত হ'য়ে আছে। সে কী ক'রে না ভেবে পারবে যে যদি তার বাবা অমন ক'রে হঠাৎ না মরতেন, সে হয়তো তার জীবনটাকে একটু উন্নত করার সুযোগ পেত। অন্তত তিনি বাঁচতে পারতেন তো মালতীটার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত। তাহলে জোদ্দার সম্ভব হত হয়তো এম-এ পড়ার, কিম্বা চেষ্টাচরিত্র ক'রে একটু ভালো গোছের একটা চাকরি যোগাড় করার, যা সে হয়েছে আজ, তার থেকে আরো একটু ভালো কিছু হওয়ার। উল্টে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পড়ল তার ঘাড়ে—আর সে কী প্রচণ্ড দায়িত্ব! শুধু কি মা আর মালতীই? ছিলেন ছোট

কাকা ও তাঁর বৃহৎ পরিবার। অত্যন্ত নগণ্য একটা কেরাণীর চাকরি করতেন ছোট কাকা—তাঁকে ছু'পাঁচ টাকা ক'রে প্রতি মাসেই পাঠাতে হত। কারণ বাবাও তাই করতেন—অবশ্য কলকাতার চাকরিটা পাওয়ার পর হ'তে। জোদ্দাও বাবার মৃত্যুর পর প্রথম ছু-তিন মাস ধ'রে সামান্য কিছু টাকা পাঠিয়েছে ছোট কাকাকে, পরে বন্ধ ক'রে দেয়। কী ক'রে পারবে? সংসারের ঘুর্ণিতে প'ড়ে তার হাত-পা বন্ধ হ'য়ে আসার অবস্থা হয়। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনা বা পরিকল্পনা তো চুলোয় যায় মুহূর্তের মধ্যে। নিজের সম্বন্ধে ভাবার সময় কি সেটা? পরেও যে-দায়িত্ব চাপল ঘাড়ে, তাতে নিজের সম্বন্ধে ভাবার সময় সে পায় নি।

তবে সে সময় হয়তো এসেছে, আজ, এতদিন বাদে—মালতীটার বিয়ে হ'য়ে গেছে, মাও মারা গেছেন—এখন তার জীবনটা একলা, সে ভাবতে পারে তার ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এখন ভেবে আর কী হবে, সে-ভবিষ্যতের আর কতটুকই-বা বাকী আছে? আদ্ধেকের ওপর জীবন তো ইতিমধ্যেই অতিবাহিত। তা ছাড়া, জীবন নিয়ে নতুন ক'রে ভাবতে চাওয়ার মত ক্ষমতাও আর তার নেই, ইচ্ছাও নেই। এখন চেনা পথেই চলতে হবে। ও তাতে খেদও নেই। যেমন জীবন সে পেয়েছে, তাকে সে মেনে নিয়েছে, আজ তাকে সে আপন ক'রে নিয়েছে। তাই আর যুদ্ধ ক'রে কী হবে, যখন যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, সেই জীবনটাকেই মেনে নিয়েছি ভাই ব'লে? তার সিঁড়িতলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে, যে-অজ্ঞাত জীবনটা আজো প'ড়ে আছে সামনে, তার সম্বন্ধে জোদ্দার মোদ্দা কথাটাই তা-ই।

তাই হয়তো না ঘটলেও পারত এই নতুন ব্যাপারটা। এ তার স্থির হ'য়ে আসা জীবনে আবার একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। এ তাকে আবার আশা দিয়েছে, এক নতুন আলোকের সম্ভাবনা দেখিয়েছে। তার চোখের সামনে মোওয়া তুলে ধ'রে আবার

তাকে নাচিয়েছে নিয়তি। হয়তো শেষ মুহূর্তে এবারও মোওয়া ফ'স্কে যাবে। তবে কি সে এসব ঝামেলার মধ্যে আর মাথা গলাবে না, আর নাচবে না নিয়তির প্রলোভনে? তবে কি সে পালাবে, ওকে গিয়ে বলবে, 'না, এ হবে না, এ হবার নয়—আমায় ফিরে যেতে দাও আমার পুরনো জগতে, যেখানে কোনো আশা করার দরকার নেই আমার, তাই প্রবঞ্চিত হবারও ভয় নেই?'

কিন্তু কেন সে এতদূরে এসে আজ এইভাবে পিছিয়ে যাবে? জীবনে কোন্ অবস্থার সামনে সে কবে পিছিয়ে গেছে? দুঃখের, প্রবঞ্চনার অভিজ্ঞতা তো কম নয় তার জীবনে, সারাটা জীবনই কাটল যুদ্ধ ক'রে। আর আজ সে কাপুরুষ সাজতে যাবে? কখনো নয়। যা আছে কপালে তা হবে—কিন্তু সে আগে থেকে পিছিয়ে যাবে না। আর ওর প্রতি আজ তার দায়িত্বও একটা আছে, সে-দায়িত্ব হ'তে যথার্থ কোনো কারণ না দেখিয়ে সে কেমন ক'রে ছাড়া পাবে? তা ছাড়া, ছাড়া পেতে চায়ও না। কোনো দায়িত্ব বহন করতে কোনোদিন সে পরাঙ্মুখ হয় নি। এ-জীবন কী, এ-জগৎটা কেমন জায়গা, তা বোঝবার আগেই তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে। বাবার ঋণ শোধ করেছে, মা-বোনের ভার বহু দীর্ঘকাল ধ'রে সার্থকভাবে বহন ক'রে এসেছে, একটা সামান্য ইস্কুলমাস্টারের আয় থেকে পয়সা জমিয়ে বোনের বিয়ে পর্যন্ত দিয়েছে। ভীরু হ'লে, দুর্বল হ'লে আজ সে জীবনের বন্যায় কোথায় ভেসে যেত, ও ভাসিয়ে দিত সেই সঙ্গেই তার মা ও বোনকে। না, আর যাই হোক, সে ভীরু নয়, দুর্বল নয়, সারা জীবন যে-বীরের সাহস সে দেখিয়ে এসেছে, তাতে তার গর্ব বোধ করা উচিত। আজো সে মাথা নোওয়াবে না, পালাবে না। তা ছাড়া, দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

একটা কাক ডেকে উঠল সিঁড়ির জানালাটার পাশ থেকে কোথাও। এদিকটা ছায়া তো কার্নিসের ওপর ব'সে আছে

কাকটা। সকলেই বৃষ্টির অপেক্ষা করছে—অথচ এখনো বৃষ্টির নাম গন্ধও নেই এ-বছরে। কাকের মত একটা কঠিন পাখি, তারও কষ্ট হচ্ছে। যাক গে, আশা করা যাক অন্তত সৌরেন সেন আছে ঘরে। সিঁড়ি দিয়ে হন হন ক'রে উঠছে জোদ্দা। কেমন একটা আড়ষ্ট চেতনা, একটা হতাশা, ক্লান্তি—ও সব ছাড়িয়েও নিজের ওপর কেমন একটা নামহীন বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসটা আছে ব'লেই তো এখনো আশা করতে পারছে, এখনো চেষ্টা ক'রে চলেছে। তার সম্পূর্ণ নিরাশ হবার মত এখনো হয়েছেই বা কী? কিছুই হয় নি। সবই হবে, অন্তত সব হবার সম্পূর্ণ আশা এখনো নিশ্চয়ই আছে।

রাখাল চক্রবর্তীর ঘরের বাইরে দালান, ও দালান পেরিয়েই সিঁড়ি। সেইটুকু পথের মধ্যে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে জোদ্দা তার জীবনের এত কথা ভেবে বসবে, তা কি সম্ভব? কিন্তু এত কথা, এত ঘটনার খুঁটিনাটি, এসব যে সে তেমন ভেবেছে, তাও নয়। ভাববার দরকারটাই বা কী? সমস্ত জীবনটাই যে তোলপাড় হচ্ছে সর্বক্ষণ মনের মধ্যে—বিশেষ ক'রে এই মুহূর্তে। আর এমন মুহূর্ত সত্যিই আছে যা ধরতে পারে অনন্তকে। জোদ্দার আজকের মুহূর্তটিও সেই রকম। তাতে যেন এক ঝলকে বিভাসিত হ'য়ে গেল তার জীবনভোর ব্যর্থতার কাহিনীটা।

হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন চেঁচিয়ে ডাকছে কাকে। যেন শুনল: 'ও মশাই, শুনছেন?' কিন্তু তাকে কে ডাকবে এখানে? পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, রাখাল চক্রবর্তী তার দিকে এগিয়ে আসছে হন্তদন্ত হ'য়ে। যাক বাবা, তা হ'লে মন্টুবাবু এসে গেছেন। কী অনাবশ্যক আবোল-তাবোল সে ভাবছিল এতক্ষণ। মনটা খুশীতে ভ'রে উঠল।

'মন্টুবাবু ফিরেছেন?' অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল জোদ্দা।

'না, এখনো ফেরেন নি। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।' তার কাছে এসে থেমে বলল রাখাল।

'বলুন।'

'আপনি বললেন আপনার নাম জয়দ্রথ খাঁ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনার নামটা একটু অদ্ভুত কিনা, তাই আমার মনে হ'ল হয়তো···আসলে আমি এই নামের একজনকে চিনতাম এক কালে।'

'তাই নাকি? কিন্তু আপনাকে কখনো দেখেছি ব'লে আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না।'

'মনে না পড়ারই কথা, কারণ সে বহুকাল আগেকার ব্যাপার। অবশ্য বলা যায় না, হয়তো আমি যাকে চিনতাম সে অন্য ব্যক্তি। আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি কখনো শ্যামনগরে থেকেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্যামনগর আমাদের দেশ। সেখানে আমার ছেলেবেলা কাটে।'

'সত্যি?' লোকটা যেন লাফিয়ে উঠল। 'আপনি কি কখনো অমরকৃষ্ণ পাঠশালায় পড়েছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সত্যি? আপনার ডাকনাম জোদ্দা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শ্যামনগর আমাদেরও দেশ, আমারও ছেলেবেলা কাটে সেখানে। আমিও পড়েছি অমরকৃষ্ণ পাঠশালায়। আমাকে আপনার মনে পড়ছে না?

'আপনার নাম রাখাল চক্রবর্তী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাখাল। মনে পড়ছে না?'

মনে করবার চেষ্টা করল জোদ্দা—রাখাল, রাখলে, কিন্তু মনে করতে পারছে না। কতকাল আগেকার কথা, কত ধুলো আর ঝরা-পাতায় ঢাকা আজ সেই শৈশব। কিন্তু লোকটা তাকে চেনে নিশ্চয়ই, কারণ শ্যামনগর, অমরকৃষ্ণ পাঠশালা, জোদ্দা, সবই তো ব'লে ফেলল সে।

'আজ্ঞে আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই চিনতাম আপনাকে। তা আপনি এখন এখানে কাজ করছেন ?'

কিন্তু লোকটা একেবারে নাছোড়বান্দা। বলল : 'দাঁড়ান, আপনাকে একটা ঘটনা বলি। ভূষণ মিত্তিরের বাগান মনে পড়ে ? মনে পড়ে একবার আমরা কাঁঠাল চুরি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে যাই আপনার পা মচকে যায় ? আমার মা চুণহলুদ লাগিয়ে দেন ? আপনারা থাকতেন আমাদের বাড়ির পাশেই ? মনে পড়ছে না ?'

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। এক দমকা হাওয়ায় হঠাৎ যেন এতদিনের ধুলো আর ঝরা-পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল। এই তো সেই রাখাল, এদের বাড়িতেই তো বুড়ো ভিখিরীটা গান করতে আসত। ভূষণ মিত্তিরের বাগানটাও বেশ মনে পড়ছে। কী কৃপণই ছিল বুড়োটা, হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ছিল। বাড়ির সংলগ্ন বাগান তার, অন্য পাড়ায়—আর সে-বাগানভর্তি নানা রকম ফলের গাছ, লিচু, জামরুল, কাঁঠাল, কলা, কলমের আমগাছ। সব ছেলেরই নজর ছিল বাগানটার ওপর—তাই বুড়োও সর্বক্ষণ কড়া পাহারা দিত। বাগানটাকে ঘিরে ফেলেছিল উঁচু পাঁচিল দিয়ে, পাঁচিলের ওপর বেল আর বাবলা কাঁটা সযত্নে পোঁতা। তবু তা সত্ত্বেও পাড়ার ধুরন্ধর ছেলেদের ঠেকাবে কী ক'রে ? ফল চুরি যেত ঠিকই।

একবার এই রকম ফল-চোরদের দলে জোদ্দা প'ড়ে যায়। দলে একটি বড় ছেলেও ছিল, ষোল-সতের বছরের। সে-ই প্রকাণ্ড কাঁঠালটাকে কাটে দা দিয়ে। গাছ থেকে সে নামতে না-নামতেই অন্য ছেলেরা আগ্রহের আতিশয্যে ফলটাকে ধরতে যায়। শেষে জোদ্দার হাতেও পড়ে। তখন তার বয়স সাত কি আট, আর ফলটা তার কী প্রচণ্ড ভারী ঠেকেছিল তাও মনে আছে। তারপর

হঠাৎ দূর থেকে 'ওখানে কে র‍্যা' ক'রে ভূষণ মিত্তির তেড়ে আসে। অন্য ছেলেরা তো সঙ্গে সঙ্গে চোঁচা দৌড় মারে, পাঁচিল টপকে উধাও হয়। কেবল পালায় নি রাখাল। জোদ্দা তখনো কাঁঠালটা ধ'রে। ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গিয়ে সেও পালাতে যায় কাঁঠালটা মাটিতে ফেলে দিয়ে কিন্তু প্রকাণ্ড ভারী ফলটা এসে পড়ে তার পায়ের ওপর, ও তার পা'টা মচকে যায়। সেই সময় এই রাখাল যদি তাকে সাহায্য না করত পাঁচিল টপকে পেরিয়ে যেতে তো হয়তো ভূষণ মিত্তিরের লাঠি তাকে আর আস্ত রাখত না সেদিন। হ্যাঁ, রাখালের মা ওর পায়ে চুণহলুদ লাগিয়ে দেন, তাও মনে আছে। আর কী বকুনিটাই না খেতে হয় বাড়িতে পরে। বাবা তো এমনিতেই কথায় কথায় ধমকেই আছেন, তারপর এই চুরির কাণ্ড। যেটা ভেবে পরে তার সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল, তা হচ্ছে স্বভাবতই সে ছিল ভালোমানুষ, কোনো ঝামেলার মধ্যে কখনো থাকত না, ফল চুরি-টুরি সে কখনো আগে করেনি, এই প্রথম পাকে-চক্রে ছেলেগুলোর দলে প'ড়ে যায়। তারপরে খামাখা এই ডেকে-আনা অপমান, পায়ে চোট লাগা, বাড়ির বকুনি ইত্যাদি। উঃ, কী সাংঘাতিক লেগেছিল পায়ে সেদিন, দশ-বারো দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি।

এই হ'ল সেই রাখাল, আজ এখানে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। হ্যাঁ, একে বেশ মনে পড়ছে। শ্যামনগরে এর সঙ্গে সে মিশেছে খুবই। এবং পরেও! যখন সকলের সঙ্গেই তার মেলামেশা এক রকম প্রায় বন্ধ হ'য়ে আসে, তখনো রাখালের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত নিত্যই—কারণ ওরা তো থাকত পাশের বাড়িতেই। তা ছাড়া দুজনে একই পাঠশালায় পড়ত—এবং পরে যখন পাঠশালা ছেড়ে শ্যামনগরের ইস্কুলে ঢোকে, তখনো দুজনে একই ক্লাসে ভর্তি হয়। এই সেই রাখাল, আর এখন সে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। অবশ্য মনে করতে পারবেই বা কী ক'রে—সেই ছেলেবেলায় দেখেছে আর এখন দেখছে। আর নামটাও তো তার

নিজের নামের মত তেমন অসাধারণ নয়, অত্যন্ত চলতি নাম, রাখাল চক্রবর্তী। তাই খেয়াল হয় নি। সত্যি, স্মৃতি জিনিসটা ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার—মানুষ হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে কিছুই ভোলে না, জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও হয়তো সঞ্চিত হ'য়ে থাকে স্মৃতির ভাণ্ডারে। যথার্থ জায়গায় একটু উস্কানি পেলেই তারা বিস্মৃতির গহ্বর হ'তে হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে আসে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার ঠিক মনে পড়েছে—আপনিই সেই রাখাল ?' বিস্মিত হ'য়ে বলল জোদ্দা।

'নিশ্চয়ই। আর আপনি জোদ্দা ? কী কাণ্ড ভেবে দেখুন। কতদিন বাদে আপনার সঙ্গে···দূর, এ কি আপনি-আপনি করছি তোর সঙ্গে ? কী ব্যাপার ? এখানে কী করতে এসেছিস তুই ? রাখাল হঠাৎ জোদ্দার হাতটা চেপে জিজ্ঞেস করল।

'এসেছিলাম নিজের একটা কাজে। তো আপনি···তুই··· তোর খবর কী ?' যেন কথা খুঁজে পায় না জোদ্দা।

'আমার আর খবর কী ? এই এখানে কাজ করছি, আর কি। কিন্তু চল, ঘরে চল, এই সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার মানে হয় না।' জোদ্দার হাতটা ধ'রে একটু টান দিল রাখাল। 'সত্যি, কতদিন বাদে দেখা তোর সঙ্গে।'

'কিন্তু আমার ভাই ভয়ঙ্কর তাড়া। যাচ্ছিলাম সৌরেনবাবুর কাছে। ওঁর সঙ্গে এখুনি দেখা না করলেই নয়।'

'কী ব্যাপার বল তো তোর ? আমার ঘরে যতক্ষণ ছিলি, খালি মণ্টুবাবু করছিলি, আর এখন সৌরেনবাবুর সঙ্গে দেখা না করলেই নয় তোর।'

'সে ভাই অনেক কথা, খুলে বলার সময় নেই এখন, পরে বলব।'

'তা' বেশ তো, সৌরেনবাবুকে আমিই ফোন ক'রে দিচ্ছি ঘর থেকে—উনি চ'লে আসবেন আমার ঘরে। তুই কেন আবার খামাখা সিঁড়ি ভাঙতে যাবি ?'

'হ্যাঁ, তা হ'লে তো ভালোই হয়,' যেন কেমন একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলল জোদ্দা।' তো বেশ চল, তোর ঘরেই যাওয়া যাক।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'সত্যি কী আশ্চর্য কাণ্ড ছ্যাখ। এতক্ষণ ঘরে বসে রইলি, অথচ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি তুই সেই জোদ্দা। তা যদি প্রথমেই জেনে ফেলতাম তো এতদিনের কত কথা কওয়া যেত। শ্যামনগর ছাড়ার পর তুই কী করলি, এ্যাদ্দিন কী করেছিস, আমিই বা কী করেছি, কত কথাই না শোনার আছে তোর কাছে থেকে, কত কথা বলারও আছে তোকে। শিবু, সন্তোষ, বুড়ো, এদের কোনো খবর পাস?'

'না ভাই, আমি কারুরই খবর রাখি নি। শ্যামনগরের কোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাই হয় নি পরে। আজ কেবল তোর সঙ্গে এই ভাবে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল।'

'তোর কথা বহুবার মনে হয়েছে পরে, জানিস? সেই যে হঠাৎ একদিন কোথায় উধাও হ'য়ে গেলি, আর তোর পাত্তা পেলাম না জীবনে। কিন্তু তোর খবর পাওয়ার চেষ্টা করেছি অনেক। আশু বেঁচে থাকতে অনেকবার তাকে তোর কথা জিজ্ঞেস করেছি। আশুকে মনে আছে তো?'

'কোন্ আশু বল তো?'

'আশু রে, আশুতোষ ভট্টাচার্য। যে ম্যাট্রিকে ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করেছিল, শ্যামনগর হাই স্কুলের নাম করিয়ে দিল যে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তার আবার কী হ'ল?'

'সে তো মারা গেছে, জানিস না?'

'তাই নাকি?'

'অনেক কাল মারা গেছে, বি-এ পড়তে পড়তেই। যক্ষ্মা হয়েছিল।'

খবরটা শুনে জোদ্দার সত্যিই খারাপ লাগল। এই আশুর সঙ্গে ও এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসত ইস্কুলে। দুজনেই খুব ভালো

ছাত্র ছিল ক্লাসের। যে-দু বছর জোদ্দা শ্যামনগর হাইস্কুলে কাটায়, তার প্রতিবারই বার্ষিক ও অন্যান্য পরীক্ষায় আশু হত ফার্স্ট আর জোদ্দা হত সেকেণ্ড। ওদের বার ম্যাট্রিকে সমগ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশু ফার্স্ট হয়, সে-খবরও জোদ্দা পায়।

আবার রাখালের ঘরে। ঢুকেই মণ্টুবাবুর টেবিলটার দিকে তাকিয়ে নিল জোদ্দা—এখনো ফেরেন নি ভদ্রলোক।

'কী, ব'স। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?' রাখাল তার টেবিলের সামনের চেয়ারটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল।

'আবার বসব? আমার যে সময় নেই।' চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে বলল জোদ্দা।

'ধ্যাৎ। কী সময় নেই? এ্যাদ্দিন বাদে দেখা, একটু বসতেও পারবি না? কী খাবি বল? আগেই ব'লে রাখি, আমাদের ক্যান্টিনটা দ্বারিক ঘোষের দোকানের সঙ্গে পাল্লা দেয় না। তবে কিছু ভালো চা সব সময়ই মিলতে পারে, আর খুব ভালো ছানাবড়াও মেলে। বলব ছানাবড়া আর চা?' ফোনে হাত দিয়ে রাখাল বলল—অপেক্ষা যেন জোদ্দার আদেশেরই।

'না ভাই, কিচ্ছু দরকার নেই, সত্যি। সৌরেনবাবুকে যদি ফোন করিস তো বড় ভালো হয়।'

'ও, হ্যাঁ।' বলেই ফোন তুলে ধরল রাখাল ও সৌরেন সেনের এক্সটেনসানটা চাইল। খানিকক্ষণ বাদেই : 'দেখুন, আমি রাখাল চক্রবর্তী কথা বলছি। সৌরেনবাবু আছেন কি? ……নেই? ……বেরিয়েছেন?……কখন ফিরবেন বলতে পারেন?…… ও, তাহ'লে দেখুন, উনি ফিরলেই দয়া ক'রে কি বলবেন আমার ঘরে সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসতে? ……হ্যাঁ, আমার ঘরে। আর শুনুন, বলবেন জয়দ্রথ খাঁ, যাঁকে উনি আসতে বলেছিলেন, তিনি এখানেই অপেক্ষা করছেন, মানে আমার ঘরে।……হ্যাঁ, জ-য়-দ্র-থ খাঁ।' ব'লে ফোনটা নামিয়ে রাখল রাখাল।

জোদ্দার পায়ের তলা হতে যেন মাটি স'রে যাচ্ছে। 'নেই বুঝি ?'

'না, বেরিয়েছেন।'

'কোথায় গেছেনে, কখন ফিরবেন, কিছু শুনলি ?'

'কোথায় আর যাবেন। এখুনি ফিরবেন নিশ্চয়ই। তোকে আসতে বলেছিলেন তো ? একটু বস না, এক কাপ চা খা……।'

সব কথা ভালো ক'রে আর ঢুকছেও না জোদ্দার কানে। মাথায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বলল : 'কী সর্বনাশ ! এখন যে কী করি, কোথায় যাই, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আসতে ব'লে দুজনেই উধাও। এর মানে কী ?'

'কী ব্যাপারটা বল না ! তুই কী ক'রে চিনলি এঁদের, আর এঁদের সঙ্গে তোর দরকারটাই বা কী ? কোনো ইন্‌কামট্যাক্সের ব্যাপার ? তো বল না আমাকে— আমিও তোকে সমানই সামায্য করতে পারব। কোথায় কাজ করিস তুই ?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' আবার ফিস ফিস ক'রে বলল জোদ্দা।

'কী, হয়েছে কী ? ব্যাপারটা কী ? মণ্টুবাবু—সৌরেন-বাবুকে যদি বলতে পারিস তো আমাকে বলতে তোর দোষ কী ? এ্যাদ্দিনের জানাশোনা আমাদের।'

'আমি ভাই ভয়ঙ্কর মুস্কিলে পড়লাম। এ কী করলেন মণ্টুবাবু-সৌরেনবাবু ? আমাকে কথা দেওয়ার দরকারটা কী ছিল ?'

'আরে ভাই, বল না কী ব্যাপার। অমন হেঁয়ালি ক'রে চলেছিস কেন ?'

বলবে কি তবে রাখালকে ? লজ্জা করার আছে কী ? আর তা ছাড়া এ্যাদ্দিনের বন্ধু, তার কাছে আবার লজ্জা কিসের ? কিছু মনে করবে ? কিন্তু কেন মনে করবে ? ও'র মনে যদি করেই, করুক গে।

ব'লে ফেলল জোদ্দা : 'আমি ভাই বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

চার ॥ আবার রাখাল ও এক কাপ চা

'এ্যাঁ, বিয়ে করতে যাচ্ছিস?'

রাখালের যেন বিশ্বাসই হয় না। কেমন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে জোদ্দার দিকে। ভালো ক'রে তাকাতে গিয়ে মনে হয়, কে এই লোকটা, চিনি কি তাকে? চিনি কি তাকে? চিনি কি এই চোখকে, চিনি কি এর কিছু? এ কি আমার স্মৃতি বা চিন্তার সঙ্গে কখনো জড়িত ছিল মাত্র, একটি মুহূর্তের জন্যেও কোনো অর্থপূর্ণ ভাবে? আমি যা করেছি, হয়েছি, এই যে আজ আমি বসে আছি এই চেয়ারে, এই যে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছি, আমার যে-প্রকাণ্ড অতীতটা আমাকে ধ'রে আছে আমার এই বর্তমানের মুহূর্তটিতে, তার কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো দৃষ্ট বা অদৃশ্যভাবে কি এই লোকটা জড়িত? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, একে চিনতাম একদিন। সেই নামটা তার আজও ঠিক একই আছে, কিন্তু তাই ব'লে কি লোকটাও সেই একই আছে? আমিই কি সেই এক রাখাল আছি? সেই শ্যামনগরের দিনগুলো আর আজকের মধ্যে কী প্রকাণ্ড প্রচণ্ড অনতিক্রম্য দূরত্ব। এর মধ্যে আমি নিজেই তো কত রাখাল হলাম, জোদ্দাও নিশ্চয়ই কত জোদ্দা হয়েছে। তবে আজ এতদিন পরে আবার পিছন ফিরে চাওয়া কেন, পিছনের পথ ধ'রে বহুদিনের এক প্রায় লুপ্ত অতীতকে কেনই বা বৃথা জাগানোর চেষ্টা করা? এ-জীবনটা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, তার একটি মুহূর্তের সঙ্গে পরের মুহূর্তের নাড়ির যোগ ক্ষীণ। আর নদীর মত তা ব'য়ে চলেছেই –একতা বা ঐক্য যদি কিছু থাকে তো তা ঐ বিয়ে চলাতেই। প্রতিটি জীবনই তাই এক নয়, অনেকতাতে কেবলি অনেক আবেশ, পরিবেশ, ক্রমাগতই নিত্য নতূনের সমাবেশ,

ক্রমশই পুরাতনের বিলুপ্তি। অতএব? হয়তো লোকটা বিয়ে করতে চলেছে, তাতে আমার কী? আমার কোন্ অতীতের কী, আমার এই মুহূর্তেরই বা কী? আর যে-জীবনটা আজো আমার সামনে প'ড়ে আছে, আমার চোখের বাইরে, জানার বাইরে, আমার ধারণার বাইরে, আমার সেই ভবিষ্যৎ জীবনটারই বা তাতে কী? হয়তো জোদ্দার বিয়ে করা হ'য়ে ওঠেনি এতদিন, আজ তাই বিয়ে করতে চলেছে, তাতেই বা কী? কিম্বা হয়তো বিয়ে হয়েছিল যথা সময়েই, প্রথম বউটি ম'রে গেছে, তাই আজ বিয়ে করতে চলেছে। হয়তো দুটি একটি ছেলেমেয়ে আছে, তবুও আবার বিয়ে করতে চলেছে, কিম্বা হয়তো সেই ছেলেমেয়েগুলির তত্ত্বাবধানের জন্যেই আবার বিয়ে করতে চলেছে, তাতেই বা কী?

কিন্তু এত প্রশ্ন করাই বা কাকে? নিজেকে? এর দরকারটা ছিল কী? তুমি না চেয়েছিলে তোমার একলার ঘরটি, তোমার একলার মুহূর্তটি একটুক্ষণের জন্যে? অন্য কোনো প্রশ্ন যেন করার ছিল না তোমার নিজেকে। যেন এই পৃথিবী ভ'রে হাজার রকমের প্রশ্নে ইতিমধ্যেই উত্যক্ত হ'য়ে ওঠোনি তুমি। এবং সেই সব হাজার রকমের প্রশ্ন একেবারে তোমারই নিজের, তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে, তাদের সমাধান বা উত্তর পেতে না-পেতে নতুন সমস্যা এসে ক্রমাগতই হাজির হয়, এবং যারও সমাধান খুঁজতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। পরের জন্যে অনাবশ্যক ভাবে ভাবতে চাওয়া এত নিরর্থক এই ছোট্ট জীবনে—তার সময় কোথায়? এই জোদ্দা এতকাল বিয়ে করেনি, কেন করেনি, সে প্রশ্ন তার, রাখালের নয়। কিন্তু জোদ্দা তো তার প্রশ্ন নিয়ে রাখালের মাথাটা ঘামাতে আসেনি—সে তো চ'লেই যাচ্ছিল, নীরবে, নির্ঝঞ্ঝাট শান্তির মধ্যে রাখালকে আবার ডুবতে দিতে চেয়ে। এমন কি সে তার নিজের পরিচয়ও দিতে আসে নি যেচে, তাদের দুজনের কোনো পরিচিত এক অতীতকে বহু বছরের বিস্মৃতির কঠিন স্তর খুঁড়ে সে জাগাতেও চায় নি। সেরকম

কোনো পরিচিত একটি অতীত যে তার থাকতে পারে আজকের এই রাখাল চক্রবর্তী নামক ইনকামট্যাক্স অফিসারটির সঙ্গে, এমন চিন্তাও তার মনে আসে নি। চিন্তা তো দূরের কথা, প্রথম প্রথম সে তোমায় চিনে পর্যন্ত উঠতে পারে নি। তুমি তোমার নাম করলে, শ্যামনগরের প্রসঙ্গ পাড়লে, তবুও সে তাকিয়ে রইল, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। তখন তুমি রাখাল চক্রবর্তী, কবি রাখাল চক্রবর্তী, এক মুহূর্তের শান্তির জন্যে উন্মত্ত রাখাল চক্রবর্তী, তুমি কী করলে? তুমি হাজার অছিলা পাড়লে, সুপ্ত দিনগুলোকে কান ধ'রে ঘুম থেকে তুললে, লোকটাকে জোর ক'রে ঘাড় ধ'রে আবার ঘরে এনে বসালে, এমন ভাব দেখালে যেন তুমি তার পরম বন্ধু, যেন জন্ম থেকে তোমরা দুজনে একাত্ম, যেন তার বিপদে সাহায্য করাই তোমার জীবনের একমাত্র অভিপ্রায়।

অতএব ঠেলা সামলাও এখন, প্রশ্ন যখন করেছ, তখন উত্তরটিও শুনতে হ'ল, লোকটা বিয়ে করতে চলেছে। এখন জড়িয়ে পড় তার সঙ্গে, তার বিয়ের সঙ্গে, তার ভাবী বধূর সঙ্গে। নিস্তার কোথায়? অন্য লোককে দোষ দিতে লজ্জা করে না? নিজের বিকেলটাকে নিজে ইচ্ছে ক'রে খোয়ালে। সবই ঠিক ছিল— লোকটা এসেছিল, ঘরে ব'সে ছিল, তারপর চ'লে যাচ্ছিল। এবং একবার চ'লে গেলে সে আবার ফিরে আসতও না। কেন সে এসেছিল, কেনই বা গেল, মন্টুবাবু বা সৌরেন সেনের সঙ্গে তার দরকারটাই বা কী ছিল, এ-সব জানার কোনো অবকাশই ঘটত না রাখালের। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটার এই আসার ব্যাপারটা ভুলেই যেত সম্পূর্ণভাবে—কত লোকই তো আসছে এই আপিসে। তারপর লোকটা চ'লে গেলে সে পেতে পারত তার ঘরটিকে আবার একলা ক'রে, কারণ মন্টুবাবু তো নেই, এখনো ফেরেন নি, এবং দেখে শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক হয়তো ফিরবেনও না তাড়াতাড়ি। তবে?

যাক গে, মরুক গে। যা হবার হয়েছে, এবং যা হবার হবে—আর সেইটেই বড় কথা। তা ছাড়া, এতদিনের একটা বন্ধু, তার সঙ্গে এমনি ক'রে আজ হঠাৎ দেখা এ্যাদ্দিন বাদে, আর লোকটা বলে কিনা সে বিয়ে করতে চলেছে। তাই রাখাল একটু আগ্রহ দেখিয়েছে, এই বই তো নয়। অবশ্য, ব্যাপারটা এতদূর গড়াতেই পারত না যদি সে কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রে লোকটাকে নির্বিঘ্নে চ'লে যেতে দিত। হয়তো ভালোই হত তা হ'লে। কিন্তু কোন্‌টা মন্দ, সে বিচার করার রাখাল কে? আর জোদ্দার সঙ্গে এমনি ক'রে তার আবার দেখা হ'য়ে যাওয়াতে যে শুধু মন্দই ঘটতে পারে, তাই বা সে ধ'রে নিচ্ছে কেমন ক'রে? এবং এই দেখা হওয়াতে তার কিছু ভালো হ'তে পারে বা কিছু মন্দ হ'তে পারে, এ-রকম কোনো ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে চাওয়াটাও কি পাগলামি নয়? একজন বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল বাদে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হ'য়ে গেছে, তাই রাখাল সেই বন্ধুটির খবরাখবর জানতে চেয়েছে। এ ছাড়া আর কী?

হঠাৎ রাখালের মনে হ'ল, সে বড্ড হীন, বড্ড অতি মাত্রায় আতঙ্কেন্দ্রিক, ভয়ঙ্কর ভাবে স্বার্থপর, মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে বাঁচবার অযোগ্য। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া ভাবনা তার মনে জাগে কেমন ক'রে?

'বিয়ে করতে যাচ্ছিস?' প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল রাখাল।

'হ্যাঁ, বিয়ে করতে যাচ্ছি। কেন, বিশ্বাস হয় না?'

'না-না, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। তবে, মানে, এখনো বিয়ে করিস নি?'

'হ'য়ে ওঠেনি, এই আর কি। যাকগে ভাই, বড্ড তাড়া। এখন কী করি বল তো?'

'দাঁড়া দাঁড়া, ব্যাপারটা বুঝতে দে একটু ভালো ক'রে। আমাদের তো কবে বিয়ে-টিয়ে হ'য়ে গেছে, ছেলেপিলে পর্যন্ত হ'য়ে

গেছে। আর তুই এখনো বিয়ে না ক'রে আছিস? শেষকালে এই বুড়ো বয়সে······'

কথাটা ব'লেই রাখালের কেমন একটু খটকা লাগল। ছি ছি, এটা বলার কী দরকার ছিল? কী আর এমন বুড়ো সে? নিজেকেই কি রাখাল বুড়ো বলতে পারবে? বা তাকে যদি কেউ বুড়ো বলে, সেটা কি তার তেমন ভালো লাগবে? তাই প্রশ্নটাকে একটু ঘুরিয়ে আবার বলল:

'না না, বুড়োর কথা নয়। দেখতে শুনতে তুই দিব্যি জোয়ানই আছিস। তবে বয়সটা তো আমার মতনই হ'ল। তাই বলছিলাম, এখনো বিয়ে না ক'রে রইছিস কেন?'

'আর তো রইব না রে। এই তো তোদের দলে ভিড়তে চলেছি।'

'উত্তম কথা। ক'রে ফেল। শুভস্য শীঘ্রম্।'

'হ্যাঁ, কিন্তু···একটা বড্ড মুশকিল হ'য়ে গেছে।'

'মুশকিল আবার কী। তুই ভাই তোর হেঁয়ালিটা রাখ তো একটু এবার। বল না, ব্যাপারটা কী, হয়েছেটা কী। তোর সব মুশকিল এক্ষুণি আসান ক'রে দেব। আমি এখানে রয়েছি কী করতে? আর ছ্যাখ, এ্যাদ্দিন বাদে তোর সঙ্গে এমনি ক'রে আজ হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। এটা করতে গেলেন কেন বিধাতা? এর কি কোনো অর্থ নেই? তবে?'

রাখাল যেন দেখতে পেল, লোকটার চোখে একটা অদৃশ্য জ্যোতি হঠাৎ এসেই মিলিয়ে গেল। যেন ঘোর অন্ধকারের সমুদ্রপাড়ে লাইটহাউসের আলো একটা বোঁ ক'রে ঘুরে বেরিয়ে গেল। যেন প্রশান্ত কোন সমুদ্রের একটি ছোট্ট জায়গায় মুহূর্তের জন্যে ঢেউ-এর একটু আলোড়নের আভাস মাত্র জাগল, ও তা জাগতে না-জাগতেই বিপুল জলধির মধ্যে বিস্তারিত হ'য়ে হারিয়ে গেল। কিন্তু জানে রাখাল, বাইরে থেকে দেখতে যেমনই হোক,

ও চোখ দুটি ধীর স্থির শান্ত সমুদ্র নয়, তার অন্তর উদ্বেলিত। সেখানে তুফান চলছে। একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই, তা রাখাল আঁচ করতে পেরেছে। ঠিক কী যে হয়েছে, তা সে জানে না, কারণ জোদ্দা তো এখনো তাকে খুলে কিছু বলে নি।

তবু রাখাল একটু আশ্বস্ত হওয়ার ভাব অনুভব করল। তার মনে হ'ল, সে যে জোদ্দাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে, তা শুনে জোদ্দার ভালো লেগেছে, লোকটা যেন একটু বল পেয়েছে।

'ধীরে সুস্থে একটু ব'স না,' হেসে বলল রাখাল।

'আর কত বসব বল? ইতিমধ্যেই তোর কত সময় আজ নষ্ট করলাম।' একটু ক্ষীণ হাসি টেনে জোদ্দা চেয়ারটাকে এগিয়ে আনল।

'আবার ঐ সব আবোল-তাবোল বকছিস? বলে, কত যুগ বাদে দেখা তোর সঙ্গে, তার কাছে···যাকগে, কাজ আমি এমনিতেই করব না ভাবছিলাম আজ—এখন তো করবই না।'

আবার চোখে জ্যোতি খেলল জোদ্দার। এবার আর ভুল হবার নয়। বলল:

'সত্যিই কাজ করবি না আজ? তা হ'লে চল না একটু আমার সঙ্গে—সত্যি, বড্ড উপকার হয়।'

'চল কোথায় যাবি, আমি প্রস্তুত। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কী, একটু জানতে দে।'

'সব বলছি, দাঁড়া। আমার যে এক মুহূর্ত সময় নেই। তার আগে দয়া ক'রে আর একবার ছাখ না ভাই সৌরেন সেন ফিরলেন কি না।'

'যদি ফেরে তো ফোন আসবে এখানে সঙ্গে সঙ্গে।'

'তবু, তবু ছাখ না।'

অগত্যা আবার ফোন ধরল রাখাল, সৌরেন সেনের নম্বরটা চাইল, ও জানল যে ভদ্রলোক এখনো ফেরেন নি। জোদ্দার চোখ

ছুটিতে জ্যোতির বদলে খেলল অন্ধকার—রাখাল যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। লোকটাকে এতক্ষণে একটু ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করতে আরম্ভ করেছে সে, তাই যেন বুঝতেও পারছে।

'অত মুষড়ে পড়ছিস কেন, ভাববার কী আছে এত?'

জোদ্দা একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কপালে হাত দিল, চোখ ছুটো বন্ধ ক'রে যেন কী ভাববার চেষ্টা করল। হঠাৎ ব'লে উঠল:

'তাহ'লে তুই-ই চল না, আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবি পনের মিনিটের জন্যে।'

'যাব তো বলেছিই তোকে। আগে ব্যাপারটা বল। এই নিয়ে যে কতবার তোকে বললাম জানি না। এবার দেখছি হাতযোড় করিয়ে ছাড়বি।'

জোদ্দা বলতে প্রায় উদ্যত, এমন সময় রাখাল আবার প্রশ্ন করল:

'আগে বল, তোর এই বিয়ের ব্যাপারটা কী? কাকে বিয়ে করছিস? আর সেই বিয়ের মধ্যে মণ্টুবাবু আর সৌরেন সেন এল কেমন করে? তারা তোর কী করবে, তাদের তুই চিনলি কেমন করে? আর এ্যাদ্দিন বিয়ে করিসই নি বা কেন?'

এবার জোদ্দা যেন ক্ষেপে উঠল:

'তা' শুনে তোর কী হবে? আমারই বা কী হবে বল তো?' পরক্ষণেই নিজেকে যেন একটু সামলে নিয়ে বলল:

'বিয়ে করতে পারিনি, করা হ'য়ে ওঠে নি, কারণ পেছনে অনেক বাধা ছিল। কারণ বাবা মারা যান, সমস্ত সংসার আমার ঘাড়ে। তারপর মালতীর বিয়ে না দিয়েই বা নিজে বিয়ে করি কী ক'রে?'

'মালতী?' প্রশ্নটা না ক'রে পারল না রাখাল। যদিও একটু ভয়ের ভাব জেগেছে এবার মনে, পাছে জোদ্দা আবার ক্ষেপে ওঠে।

'হ্যাঁ, মালতী, আমার বোন। মনে পড়ছে না? ও, তুই তাহ'লে বোধ হয় দেখিস নি তাকে—আমাদের শ্যামনগর ছেড়ে যাওয়ার পর তার জন্ম হয়।'

'ও, তা এত কথা আমি কী ক'রে জানব বল? এ্যাদ্দিন বাদে দেখা, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। একটু কৌতূহল হয়ই তো। তা কাকে বিয়ে করছিস?'

'আবার ত্থাখ, তুই তো মহা মুস্কিলে ফেললি ভাই।'

'অত চটছিস কেন?' একটু না হেসে পারল না রাখাল

'না-না-না, চটব কেন, চটবার তো কথা নয়। তোর এই সব জানতে চাওয়া, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত সময় নেই, আমার যে ভয়ঙ্কর তাড়া, এ-কথাটা তোকে বোঝাই কী ক'রে

'তাড়া, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু বিয়ে তো আর এক্ষুণিই করছিস না, এক মিনিট তো ব'সে যেতে পারিস।'

'এক মিনিটও বসতে পারি না। এক্ষুণি বিয়ে করতে চলেছি, একেবারে এই মুহূর্তে।'

'এই মুহূর্তে? সে কী রে? এখন আবার বিয়ে হয় না কি, এই দিন দুপুরে?'

'কেন হবে না? রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ হয় না?'

'রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ? সে কী রে? রেজিষ্ট্রী ক'বে বিয়ে করবি?'

'হ্যাঁ, অত চমকে যাচ্ছিস কেন? রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করতে নেই না কি?'

'না-না, থাকবে না কেন, আজকাল তো সে রকম বিয়ে কত লোকেই করছে। কিন্তু তুই……'

রাখাল যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না কথাটা। সেই জোদ্দা যার সঙ্গে ছেলেবেলা কেটেছে শ্যামনগরে, সেই মুখ চোরা ভালোমানুষ জোদ্দা, তার বাবা-মা, আরো কত কী, একেবারে রাখালদেরই মত গোঁড়া পরিবার, সেই জোদ্দা আজ রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করবে?

'কেন, তোর বউ খ্রীষ্টান না কি?' আবার প্রশ্ন করল রাখাল।

'খ্রীষ্টান হ'তে যাবে কেন? হিন্দু। একেবারে তোর আমার মতনই হিন্দু।'

'তবে? কায়স্থ নাকি? কিন্তু কায়স্থ হ'লেও তো আজকাল·

'যাক গে ভাই, সে অনেক কথা, সব কথা বলার সময় নেই, পরে তোকে বুঝিয়ে বলব। এখন আমার একটা সুবাহা কর, আমি তো আর পারছি না। তা ছাড়া, ওকে সেই তখন থেকে বাইরে দাঁড করিয়ে রেখে এসেছি।'

'কাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস?'

'ওকে, মানে আমার ভাবী স্ত্রীকে। ফিয়াসে, না কা যেন বলিস তোরা?' একটুখানি হাসির ভাব টেনে বলল জোদ্দা।

'তাকে, মানে তাকে তুই বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস? কোথায় তিনি?'

'এই তো, তোদের শেডটার ঠিক বাইরেই।'

'সে কী রে, আচ্ছা আহাম্মক তো তুই।' বাখাল হন্তদন্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে তুই তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস? তা নিয়ে আসতে কী হয়েছিল? তোর বউকে, মানে তাঁকে কি আমরা খেয়ে ফেলতাম?'

'আহা, আমি কি জানতাম যে···

'যাক গে, যা করেছিস করেছিস। এখন চল, তাকে নিয়ে আসি আগে। পরে কথা হবে।'

ঘরের বাইরে দালান, দালান পেরিয়ে মুক্ত অঙ্গন, রোদ্দুর আর গাছের ছায়া, তখনো রোদ্দুর, সমানই কাঠফাটা রোদ্দুর, যেন গায়ের যেখানটায় লাগে সেখানে ফোস্কা পড়িয়ে দেয়—আর ঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের জগতের বহুবিধ শব্দ, দূরে পথচারীদের খাপছাড়া কোলাহল, মোটরগাড়ির শব্দ, কাকের হঠাৎ ডেকে-ওঠা কর্কশ আওয়াজ। সে-আওয়াজে এই ঘোষণা:

ভালো লাগছে না, ম'রে গেলাম, একটু শান্তি দাও, একটু ছায়া দাও, এত আলোর এত রৌদ্রের দরকার কী এই জগতে, বেশ হত যদি একটু বৃষ্টি পড়তে পারত। একটা মেঘ, একটা প্রকাণ্ড কালো কুচকুচে মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছেয়ে ফেলে এখনি এই মুহূর্তে গম্ভীর নিনাদে কালবৈশাখী ঘনাতে পারত। ধুলো উড়ত, এই সহরের যত ধুলো, যত পাপ, নোংরা, গ্লানি—সব উড়ে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করত, এই পঙ্গু, জর্জর, অসুস্থ মেদগ্রস্থ সহরটা হয়তো তাহ'লে একটু ন'ড়ে চ'ড়ে উঠত, একটু প্রাণের আভাস পেত। আর তারপর নামত বৃষ্টির প্লাবন—বৃষ্টি তো নয়, শুভ্র শান্তির বারি, পাপক্ষরা।

যেতে যেতে বলল রাখাল ঃ 'উঃ, কী রোদ দেখছিস !'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক।'

পরেই যেন একটু কৈফিয়তের সুরে জোদ্দা না ব'লে পারল না ঃ

'সত্যি, ওকে এতক্ষণ এই রোদ্দুরে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত হয় নি। একেবারেই হয় নি। কিন্তু কী ক'রে জানব বল ? কথা ছিল, মণ্টুবাবু আর সৌরেন সেনকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরব। অন্তত সেই রকম প্রতিশ্রুতিই তো তাঁরা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঘরেই থাকবেন, এলেই পাব, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। কিন্তু ওঁরা যে এমন করবেন···'

কৃষ্ণধনটা আঙিনা পেরিয়ে উল্টো দিকের দালানটায় আড্ডা মারছে, বেঞ্চির ওপর ব'সে উদয় সিং-এর সঙ্গে বিড়ি ফুঁকছে। এ-দিকের দালানটায় একটা পিওন নেই, শ্রীনিবাসেরও কোনো পাত্তা নেই এখনো। সব খালি আছে। এ-দেশের, এ-জাতির হবে কী ? খালি প্লান নিয়ে বড় বড় কথা আওড়ে তো লাভ নেই। নিজেদের কর্মঠ হ'তে হবে আগে, লোকগুলোর ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে একটা কর্তব্যের চেতনা, একেবারে ইনজেক্শন দিয়ে, গ'ড়ে তুলতে হবে জাতির মেরুদণ্ডটা। রাখালের একবার মনে

হ'ল, হাঁক দেয় কৃষ্ণধনকে। পরক্ষণেই একবার মনে হ'ল, কী দরকার? মরুক গে। ফাঁকি খুঁজছে সবাই, সে নিজেই কি খুঁজছে না? আজ সারা দুপুর ধ'রে কী কাজটা সে করেছে এখনো পর্যন্ত?

ওরা চলেছে হন হন ক'রে গেটের দিকে। ঘর থেকে ঠিক এক মিনিটের পথ। কিন্তু কৈ, এখনো তো তাকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো গেটের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, ভাবল রাখাল। সত্যিই, কী অপদার্থ এই জোদ্দাটা, আপিসটার ভেতরে পর্যন্ত আনেনি ওকে। কিন্তু রাখালই বা কেন মাথা ঘামাচ্ছে? যাক গে, এখন তো জড়িয়ে পড়লই, অন্তত সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। সম্পূর্ণ যেচে, নিজে থেকে, এত আগ্রহ দেখিয়ে পরে তো আর বলা যায় নাঃ যাও, জাহান্নমে যাও তোমরা, তোমাদের আমি জানি না, চিনি না, চিনতে চাইও না, বিয়ে করছ কর, ভালো কথা, সুখী হও, সংসারী হও, ছেলে-পিলে হোক, তোমাদের প্রতি আমার অতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল, কিন্তু দয়া ক'রে আমাকে এ-সব বিয়ে-ফিয়ের মধ্যে টেনো না। কিন্তু কীই বা হয়েছে এমন, এত ঘাবড়াচ্ছেই বা কেন রাখাল? না, ঘাবড়াচ্ছে ঠিক নয়, তবে কোথায় যেন একটু গোলমাল আছে, একটা কিছু আছে এই ব্যাপারের মধ্যে। যাক গে, যা আছে থাকুকগে, ব'য়ে গেল।

গুর্খা দারোয়ানটা টুলের ওপর ব'সে, রাখালকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল। এরা তবু ভালো, খানিকটা কর্তব্যের জ্ঞান অন্তত আছে। বাঙালীদের মত নয়। গেট পেরোতেই নজরে পড়ল তাঁকে। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, গাছের ছায়ায়। কিন্তু কতটুকুই বা সেই ছায়া, রোদ্দুরের ঝাঁঝটা এড়াবে কেমন ক'রে? রাস্তার ওপরেই একটা কাপড়ের দোকান, কতকগুলো লাল নীল শাড়ি ঝুলছে। ওর মাথা পেরিয়ে সেই কাপড়গুলোর দিকে দৃষ্টি যায়, যেন সে দাঁড়িয়ে আছে এক রঙ্গমঞ্চে, নিশ্চল নির্বিকার, আর

তার পিছনে ঐ কাপড়গুলো যেন রঙ-বেরঙের পর্দা। সে নিশ্চল, কিন্তু তার সামনে দিয়ে আর সকলে চলছে, একটা চলমান জগত ছুটছে। রাখাল দেখল, হাতে তার একটা বড় চামড়ার থলি, পুরোনো, রং চটে-যাওয়া, নানা স্থানে কুঁচকে যাওয়া। তবু পাছে ধুলো লাগে, সেটিকে সে তাই মাটিতে নামিয়ে রাখেনি, কাঁকালের ওপর রেখে বাঁ-হাত দিয়ে ধ'রে আছে, ঠিক যেমন ক'রে ছোট ছেলেমেয়েকে মা কোলে নেয়। এ-ধরনের চামড়ার থলির আজকাল খুব চল হয়েছে কলকাতায়, আগে বড় একটা দেখা যেত না তেমন। থলিটার মধ্যে কী আছে ভগবান জানেন, কিন্তু কিছু নিশ্চয়ই আছে, ও যা' আছে তার ভারও আছে, নইলে এ-ভাবে কাঁকালের ওপর রেখে তাকে ধ'রে থাকতে হবে কেন? হয়তো আগে হাতেই ঝুলিয়ে রেখেছিল, পরে কষ্ট হওয়াতে এখন কাঁকালে নিয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটিই তো সেই? নিশ্চয়ই, আর কে হবে?

সন্দেহের অবকাশও রইল না। জোদ্দা তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে বলল:

'নীলু, ওরা নেই, বেরিয়েছে। কোথায় গেছে, কেউ জানে না। কখন আসবে, তাও জানা নেই। এখন···ও, আগে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি···দাও ব্যাগটা, দাও দাও, আমাকে দাও, তুমি কষ্ট ক'রে এটাকে বইছ এতক্ষণ।'

ব'লে হাত বাড়িয়ে চামড়ার থলিটা নিয়ে নিল জোদ্দা। রাখালের দিকে চেয়ে বলল:

'জানিস, আসলে এ-ব্যাগটা আমার। ঢোকার সময় ওর হাতে দিয়ে বলি, তুমি একটু দাঁড়াও এটাকে নিয়ে, আমি এখুনি আসছি ওদের দুজনকে সঙ্গে ক'রে। এত দেরী হবে কী ক'রে জানব? এদিকে ব্যাগটার কথাও একেবারে ভুলে গিছলাম। এই রোদ্দুরে তোমাকে নীলু, ছি-ছি-ছি, আমার বড্ড লজ্জা করছে। হ্যাঁ, তোমাদের আলাপটা করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন রাখাল চক্রবর্তী,

এখানকার ইনকামট্যাক্স অফিসার, আমার বাল্যবন্ধু। আমরা যখন শ্যামনগরে থাকতাম, আমার সঙ্গে ইনি এক ক্লাসে পড়তেন। আমাদের বাড়িও ছিল ওঁদের বাড়ির পাশে। আশ্চর্য নয়? এ্যাদ্দিন বাদে হঠাৎ দেখা এর সঙ্গে আজ—আগে তো চিনতেই পারি নি...'

রখাল থামিয়ে বলল: 'থাক, ও-সব কথা পরে হবে। আপনি আগে ভিতরে আসুন। আমি জানতুমই না। এইমাত্র শুনলাম, আপনি নাকি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—তাই ছুটে এসেছি। ক্ষমা করবেন, বড্ড অপরাধ হ'য়ে গেছে।'

নীলু শুধু একটু মৃদু হাসল। সেই হাসিতে আভাস কৃতজ্ঞতার, এত রোদ্দুর সত্ত্বেও একটি আশ্চর্য স্নিগ্ধতার, ও সবার ওপরে এক নামহীন মধুর লজ্জার। রাখাল তাকে আগে নমস্কার করেছিল হাত যোড় ক'রে, সেও নমস্কার জানাল রাখালকে হাত দুটি বুকের কাছে তুলে ঠেকিয়ে।

'আর ইনি হচ্ছেন নীলাঞ্জনা দাশ,' জোদ্দা বলল, 'যার কথা বলছিলাম। জানো নীলু, আমি এর ঘরেই বসেছিলাম, কারণ এরই ঘরে মণ্টুবাবুও বসেন। সে-ভদ্রলোক এদিকে বেরিয়েছেন। ফোন ক'রে জানা গেল, সৌরেন সেনও নাকি নেই। আমি ব'সেই আছি, অপেক্ষা ক'রেই চলেছি—উঠতে পারি না। কারণ ভয়, পাছে আমার বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা এসে হাজির হন। এদিকে...যাক গে, এখন তো রাখালকে পাওয়া গেছে, আর ভয় নেই। কী বলিস রাখাল?'

কী বলবে রাখাল? তোমার ভয়টা ঠিক কী বা কোন জাতীয়, তা একটু বুঝতে দাও আগে, তবে তো রাখাল কিছু বলতে পারবে। যাক গে, রাখাল কথাটা শুনেও না শোনার ভান করল। বলল:

'আসুন আসুন, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

জোদ্দাও বলল, 'চল। এসো নীলু।'

লোকটাকে আগে থেকে যেন অনেক আশ্বস্ত ব'লে মনে হচ্ছে। কেন, তা রাখাল জানে না। হয়তো রাখালের পরিচয়টা পাওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিত কোনো আশার লক্ষণ দেখতে পেয়েছে—বিশেষ ক'রে রাখাল যখন তাকে স্পষ্টই বলেছে, সে থাকতে জোদ্দার ভাবনাটা কী? কিন্তু কিছু না জেনে-শুনে আগে থেকে এমন একটা কথা দিতে গেল কেন রাখাল, কে জানে তার কাছে কী আশা করছে জোদ্দা। পয়সা কড়ির ব্যাপার নয় তো? তাহ'লেই তো সেরেছে। মরুক গে, দেখাই যাক না। অথবা তার এই হঠাৎ আশ্বস্ত হওয়ার ভাবের পেছনে এও থাকতে পারে, মেয়েটাকে ফিরে পেয়ে মনে খানিকটা বলের সঞ্চার হয়েছে। এতক্ষণ একলা মনে মনে যুদ্ধ করছিল হয়তো নানান আজগুবি বা সত্যি বিপদের সঙ্গে, এখন সাথীটিকে পেয়েছে ফিরে, যুদ্ধ আর তাই তার একলারই নয়, তাদের দুজনের। অথবা মেয়েটাকে এতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, বিশেষত ঐ থলিটা পর্যন্ত তাকে দিয়ে বইয়েছে এতক্ষণ, তাই ভেবেও হয়তো মনে একটা অস্বস্তির ভাব ছিল।

ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে মনে হ'ল রাখালের, হাসিটি বেশ কিন্তু। আর দেখতেও তেমন একটা আহা মরি সুন্দরী না হ'লেও বেশ একটি লালিত্য আছে চেহারায়। নিকষ কালো গায়ের রঙ, চোক চকিত হরিণীর। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এমনি একটি মেয়েকে মনে ক'রেই কৃষ্ণকলি কবিতাটি লিখেছিলেন। বয়স অবশ্য একটু হয়েছে, অন্তত তিরিশ তো হবেই, কিন্তু তা আর হবে নাই বা কেন, জোদ্দার বয়সটাই কি কম হ'ল? হ্যাঁ, লালিত্য আছে, আর মুখের গড়নটাও মন্দ নয়—বিশেষ ক'রে ঐ লজ্জা-লজ্জা ভাবটি ভারী মিষ্টি। এত বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকেও কোনো মেয়ে এমন লাজুক থাকতে পারে, বিশেষত আজকালকার দিনে? ভারী আশ্চর্য। কিন্তু একটিও কথা বলল না কেন?

ঘরে এনে রাখাল তাদের বসতে দিল। জোদ্দা একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল :

'আবার তোর ঘরে।'

'তো হয়েছে কী?' ব'লেই রাখাল একটু হেসে তাকাল নীলুর দিকে। ভারী সাধারণ মেয়ে, অন্তত বেশ-ভূষায়। একটি আট-পৌরে শাড়ি পরা, সাদার ওপর লাল ডুরে কাটা, হয়তো ধনেখালি, হয়তো শান্তিপুরী, রাখাল ঠিক বলতে পারবে না। শাড়িটির উপরের অংশ গায়ে এমন ক'রে ভাঁজ ক'রে টানা যে ব্লাউজটি দেখাই যাচ্ছে না। ঠিক যেভাবে মেয়েরা যখন পূজো করতে বসে, যেন সেইভাবে কাপড়টা গায়ে জড়ানো। হাতে দুয়েকটি কাঁচের চুড়ি, অন্য কোনো অলঙ্কার নেই। হাতের আঙ্গুলগুলি লম্বা লম্বা, হয়তো তারা তেমন নরমও নয়। চেহারাটাই যে ছিপছিপে। তেমন লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। আর কী অগাধ ঘন কৃষ্ণ চুল, হয়তো খোঁপাটা খুলে দিলে জানু পর্যন্ত গিয়ে পড়বে। খোঁপায় শুধু একটি লাল জবাফুল থাকলে ছবিটি যেন পূর্ণ হত।

'একটু চা আনতে বলব?' নীলুকে প্রশ্ন করল রাখাল।

চকিত হরিণীর চোখ খেলল আবার, এবার জোদ্দার দিকে। যেন জোদ্দার মতের অপেক্ষা। সে-দৃষ্টিতে প্রশ্ন, কুণ্ঠা, লজ্জা। এ-চোখ কথা বলতে জানে। এতক্ষণে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘামে নিশ্চয়ই সমস্ত শরীরটা ভিজে। তবু বোঝবার যো নেই, শুধু কপালের ওপর দিকে একটি দুটি অলকের কাছে কয়েক বিন্দু ঘাম এখনো সঞ্চিত রয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া চেহারায় বা হাবে-ভাবে কোনো ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। হয়তো এত কালো হওয়ার এই একটা গুণ, রাখালের মনে হ'ল।

'কী?' নীলুর দিকে চেয়ে জানতে চাইল জোদ্দা।

নীলু মাথা নেড়ে জানাল, না। রাখালের মনে হ'ল, হয়তো

সে 'না' কথাটা উচ্চারণও করল, কিন্তু নীরবে। এবং অপ্রতিভ, লাজুক হাসিটি সমানই রয়েছে।

'জোদ্দা তো তাড়া-তাড়া ক'রে আমাকেও ক্ষেপিয়ে তুলেছে। কতবার সেধেছি, এ্যাদ্দিন বাদে দেখা, এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়ার সময় নেই।' রাখাল বলল নীলুর দিকে তাকিয়ে।

'না ভাই, দেখছিসই তো সময় নেই। পরে অনেক চা খাওয়া যাবে তোর সঙ্গে। এখন তো আলাপ হ'য়েই গেল,' জোদ্দা বলল।

'থাক, জোর করব না।' পুরোনো প্রশ্নে আবার ফিরল রাখাল: 'কিন্তু ব্যাপারটা কী বলত? একটু বুঝতে দে। আর সৌরেন সেন বা মণ্টুকেই বা তোরা চিনলি কী ক'রে? তাঁরা কী করবেন?'

'শোন, ব্যাপারটা অতি সংক্ষেপে এই। মণ্টুবাবু আমার অনেকদিনের পরিচিত, কারণ তিনি সিউড়িতলার লোক—যেখানে আমি মাস্টারি করি।'

'আচ্ছা? এখন তুই সিউড়িতলায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে। তোকে বলেছি, রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়েব কথা। তিনজন সাক্ষী চাই। তিনজনের একজন সটান রাইটার্স বিল্ডিং-এ হাজির হবে ব'লে কথা দিয়েছে। আর দুজন হচ্ছেন মণ্টুবাবু আর সৌরেন সেন। সৌরেন সেনকে মণ্টুবাবুই ঠিক ক'রে দেন।'

'হরিবোল। এতক্ষণে মনে হচ্ছে বুঝতে আরম্ভ করছি তোর হেঁয়ালির ব্যাপারটা। এই ব্যাপার? তা' এ তো অতি সহজ জিনিস। এর জন্যে এত ভনিতা করার দরকারটা কী ছিল?'

রাখালের ঘাড় থেকে যেন একটা বিষম দুর্ভাবনার ভার নেমে গেল। যাক বাবা, তাহলে টাকা-কড়ির কোনো ব্যাপার নয়। এবার বেশ একটু কৌতুকের সঙ্গে তাকাল সে দুজনের দিকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে এক কণা রোদ নীলুর হাতে এসে পড়েছে।

মেয়েটা সমানেই নিশ্চল, কিন্তু নির্বিকার নয়। তার একটি অনস্বীকার্য ব্যক্তিত্ব আছে, একটি বেশ মধুর ব্যক্তিত্ব, অথচ সে-ব্যক্তিত্বটির ঠিক কোনো সংজ্ঞা যেন খুঁজে পাচ্ছে না রাখাল।

'তা বিয়েটা কখন?' জোদ্দার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রাখাল।

'বললামই তো। এখুনি, আজ।'

'আজ, তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু এখুনি মানে ঠিক কখন?'

'মানে, সাড়ে চারটের আগে আমাদের রাইটার্স বিল্ডিং-এ পোঁছোতেই হবে।'

'সাড়ে চারটে? সে তো অনেক সময়। তবে তাড়া-তাড়া ক'রে এতক্ষণ আমার মাথা খারাপ করছিলি কেন?'

'বাঃ, তাড়া নয়? আর কত সময় আছে?'

'অজস্র সময় আছে। আরে বাবা, যাবি তো রাইটার্স বিল্ডিং-এ? হেঁটে গেলেও মাত্র কয়েকমিনিটের পথ।'

'কিন্তু কথা তো তা' নয়, আরো অনেক কাজ যে আছে ইতিমধ্যে।'

'যেমন?'

'সব তোকে কী ক'রে বলি এখন? এই যেমন···এই ধর না, ঘড়িটাকে তুলে নিতে হবে ঘড়ির দোকান থেকে। আর···'

'কিন্তু ঘড়ি তো বিয়ের পরেও নিতে পারিস। ঘড়ি না প'রে কি রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ করা যায় না? এ-রকম কোনো নিয়ম আছে না কি?'

'না, না,' হেসে উঠল জোদ্দা, 'সে-রকম নিয়ম নেই। তবে আরো এট-ওটা দরকারী কাজ আছে।'

'সেগুলো বাদ দিয়েও তো বিয়ে করা চলে? সবচেয়ে দরকারী তো বিয়েটাই, না কি?'

'হ্যাঁ, সবচেয়ে বিয়েটাই। অন্য যা-কিছু, তা বিয়ের পরে করলেও চলে। কিন্তু কথা ছিল, এই দুটো-একটা ছোটখাটো খুঁটী-নাটী সেরে নেব মণ্টুবাবুর সঙ্গে। তাই জন্যেই একটু আগে থাকতেই এসেছিলাম। আর ভদ্রলোক নিজেই আমাকে এই সময়টা দেন। আর এই সময় ব্যাপারটা সম্বন্ধেও তাঁকে পয়-পয় ক'রে জিজ্ঞেস করেছি, শুধু একবার নয়—কিন্তু প্রতিবারই ভদ্রলোক ···যাক গে। তাই বুঝতেই পারছিস, 'একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি।'

নীলুর দিকে তাকাল রাখাল। তার কনুই দুটো চেয়ারের হাতার ওপর, দুটি হাত মিলিত হ'য়ে চিবুকে ঠেকানো। শূন্য দৃষ্টি, মুখখানা যেন মেঘলা আকাশ।

'এত তোদের চিন্তা করার আছে কী, তা তো বুঝছি না,' বলল রাখাল। 'ধর এট-ওটা দুয়েকটা কাজ যা করবি ঠিক ক'রে রেখেছিল বিয়ের আগে, তা না হয় নাই ক'রে উঠতে পারলি। না হয় এখান হ'তেই সটাং গেলি রাইটার্স বিলডিং-এ। তা যদি হয় তো এখান থেকে স' চারটেতেও বেরোস যদি তোরা, তোদের রাইটার্সবিল্ডিং-এ যথাসময়েই পৌছে যাবি। নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা পৌছে যাব না কেন?' খুব একটা ি সাহের সঙ্গে যে এ-কথা বলল জোদ্দা, তা মনে হ'ল না।

'তবে?'

'না···কিন্তু মণ্টুবাবু···'

'মণ্টুবাবু নিশ্চয়ই এসে পড়বেন, কথা যখন দিয়েছেন। স'চারটে বাজতে এখনো তো অনেক দেরী।'

'আর সৌরেন সেন? তিনিও তো বেরিয়েছেন।'

'বেরিয়েছেন তো কী? ফিরে ' াসবেন। না ফিরলে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। কেবল সাক্ষীদেওয়াই তো? না অন্য কোনো ধরনের গণ্ডগোলও কিছু আছে?'

'না না—শুধু সাক্ষী দেওয়া। ব্যস। তাঁদের কাজ হ'য়ে গেলেই তাঁরা ফিরে আসবেন।'

'তো এ-ই যদি হয়, এত মুষড়ে পড়ছিস কেন? ওঁরা বেরিয়েছেন, কারণ হয়তো না বেরিয়ে থাকতে পারেন নি ব'লে। কিন্তু তোর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। তোকে এই রকমের একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা করবেন, এমন লোক মণ্টুবাবু নন। তাঁকে তুইও জানিস, আমিও জানি। আর সৌরেন সেনও একেবারেই ছ্যাবলা প্রকৃতির লোক নয়।'

''হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হয়েছিল। এদিকে ছ্যাখ, এক ঘণ্টার ওপর হ'তে চলল এসেছি···'

'না-না, এই নিয়ে আর অনর্থক মাথা ঘামাস নে। একটু স্থির হ'য়ে বস, সময়ে সবই ঠিক হ'য়ে যাবে। কী বলেন? আপনি অন্তত এই লোকটাকে একটু···'

নীলু মৃদু হেসে একবার রাখালের দিকে, একবার জোদ্দার দিকে তাকাল। তাকে দেখে তেমন বিচলিত ব'লে মনে হয় না। অবশ্য তার ভেতরের ভাব বোঝা শক্ত, হয়তো অসম্ভব। রাখাল তো তখন থেকেই কেবল আন্দাজ ক'রেই চলেছে। কিন্তু মেয়েটা কথা কয় না কেন? রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করতে চলেছে, আজকালকার মেয়ে, নিশ্চয়ই শিক্ষিতা মেয়ে। আর আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের মত বাচাল বস্তু ভূভারতে আর কী আছে? অবশ্য কথা বলার হয়তো তেমন দরকারও হয় না এর। এর চোখ কথা বলে, এর প্রত্যেকটি হাবভাব কথা বলে।

জোদ্দাও যেন খানিকটা বল পেয়েছে ব'লে মনে হল। বলল:

'তবে আরও কিছুক্ষণ দেখেই যাই মণ্টুবাবুদের জন্যে, কী বলিস? এখান থেকেই সটাং যাওয়া যাবে রাইটার্সবিল্ডিং-এ।'

'সেই তো বুদ্ধিমানের মত কথা।'

রাখাল দেখল, নীলু হাসল—সেই একই হাসি।

'হ্যাঁ, আর তোদের সেই তৃতীয় সাক্ষীটি, সে বললি সটাং যাবে রাইটার্সবিল্ডিং-এ ?'

'হ্যাঁ।' জোদ্দা বলল।

'সে তোদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবে তো, না তোদের না দেখতে পেয়ে পিটটান দেবে ?'

'কী যে করবে, ভগবান জানেন। অবশ্য তাকে আসতে বলেছি চারটে নাগাদ। একটু আগেও যদি এসে হাজির হয়, আশা করি অপেক্ষা করবে। করি কী বল ? এখানে দু-দুজন সাক্ষী পাওয়ার কথা, তাদের না নিয়ে কী ক'রে যাই ?'

'কেনই বা যাবি ? সাক্ষী নিয়েই যাবি।'

'হ্যা, তোর ঘড়িতে ঠিক ক'টা বাজল বল তো ?'

'দাঁড়া···তিনটে একুশ। প্রায় বাইশই বলতে পারিস।'

'সর্বনাশ। তার মানে একঘণ্টাও নেই আর।'

'একটা ঘণ্টা কি কম সময় ? তুই হাসালি, সত্যি। এক ঘণ্টায় কত কী ঘটে যেতে পারে, পৃথিবী পর্যন্ত উল্টে যেতে পারে, আর তুই তোর দুজন সাক্ষী পাবি না ?'

'না, ভাবনা হচ্ছে শুধু এই ভেবে যে ওঁরা দুজনেই কথা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ? ধর যদি সময় মত এসে না পৌঁছোন, তখন ?'

নীলুর মুখ অন্ধকার।

'নিশ্চয়ই ফিরবেন,' রাখাল জোর দিয়ে বলল। 'আরে, এখনো তো এত সময় রয়েছে রে বাবা।'

'যদি না ফেরেন।'

'তখন দেখা যাবে, বলেইছি তো তোকে। আমি কি এখানে অমনি অমনি ব'সে আছি না কি, তোর সঙ্গে আমার এইভাবে হঠাৎ দেখাটা হ'তে গেল কেন ?'

যেন এই কথাটি শোনারই অপেক্ষা করছিল জোদ্দা। কথাটা শুনে যে তার খুব ভালো লেগেছে, তা আর ব'লে দিতে হবে না। বলল :

'না না, তা তো জানিই—এখানে তুই রয়েছিস, আমরা তো আর জলে প'ড়ে নেই। তা হ'লে, যতক্ষণ পারা যায়, নিশ্চিন্তে অপেক্ষাই করা যাক। কী বলো নীলু?'

নীলু যেন হঠাৎ জেগে উঠল, যেন এই ব্যাপারে তার মতেরও দরকার হ'তে পারে, তা সে ভেবে উঠতে পারে নি। কিন্তু মেয়েটা বোধ হয় হাসি ছাড়া বিশেষ কিছু জানে না। আবার হাসল। এবং একটু দীর্ঘ নিশ্বাসও যেন লুকোবার চেষ্টা করল, কিন্তু খুব লুকোনো গেল না সেটা বোধ হয়। দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? ভয়? না এই অপরিচিত ঘরে আরো কিছুক্ষণ ব'সে থাকার চিন্তাটা তার মনঃপূত হচ্ছে না?

'কী, আপনার আপত্তি আছে?' যথাসাধ্য নরম স্বরে, ও একটু হেসে, প্রশ্ন করল রাখাল।

উত্তরে নীলু আরো একবার হাসল, সেই নীরব সলজ্জ মৃদু হাসি। একটু ন'ড়ে চ'ড়ে ঠিক হ'য়ে বসল চেয়ারে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। আচ্ছা মজার মেয়ে তো, রাখালের মনে হল। দিনটাও মজার, এ-রকম অভিজ্ঞতা রোজ হয় না। অথচ জোদ্দা যখন প্রথম টোকা মারে দরজায়, কী রাগটাই না হয়েছিল রাখালের!

'ব'সেই যাই,' জোদ্দা বলল নীলুর দিকে একবার আড়চেখে তাকিয়ে নিয়ে।

'তা হ'লে কিন্তু এক কাপ চা অনায়াসেই চলতে পারে, নইলে আমি রীতিমত দুঃখিত হব। এ্যাদ্দিন বাদে দেখা আর এই রকম একটা প্রচণ্ড উপলক্ষ্য—আসলে তোদের খুব ভাল ক'রেই খাওয়ানো উচিত ছিল আমার—বেশ ভাল রসগোল্লা সন্দেশ। আনিয়ে রাখতাম ঠিকই যদি শুধু জানিয়ে আসতিস।' একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল রাখাল।

'আরে খাওয়াটা তো আর পালাচ্ছে না···'

'না, নিশ্চয়ই না, বিয়েটা কোনো রকমে ক'রে নে, পরে খুব

ভালো ক'রে একটা ভোজের বন্দোবস্ত করা যাবে। হ্যাঁ, তবে এক কাপ চা ? বাঙালী প্রথা ভাই, না বললে চলবে না।'

'জোদ্দা ও নীলু পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। হাসি, কুণ্ঠা নীলুর চোখে।

'কিন্তু শুধু চা।' জোদ্দার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধুই চা। রাজভোগ চাইলেও কি পাচ্ছ নাকি ? তার জন্যে আগে বলতে হত।'

রাখাল ক্যান্টিনে ফোন ক'রে তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

এতক্ষণে মনে হচ্ছে যেন আড়ষ্ট ভাবটা কেটেছে, প্রত্যেকেরই। রাখালও একটু এলিয়ে বসল চেয়ারে, বলল :

'কিন্তু যাই বল ভাই, আমার এই রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ-ফ্যারেজ ভাল লাগে না।'

'ভালো লাগে না ? কেন, অনেক রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ দেখেছিস নাকি ?'

'আজ পর্যন্ত একটাও না। এবং দেখতে চাইও না।'

কথাটা ব'লেই রাখালের মনে হল, এ-রকম খামাখা রূঢ় হওয়ার দরকারটা কী তার ? বিশেষ ক'রে এরা যখন দুজনে রেজিষ্ট্রী ম্যারেজই করতে যাচ্ছে ? আড়চোখে একবার বোঁ . র তাকিয়ে নিল নীলুর দিকে—মেয়েটা যে কী ভাবল কে জানে।

'না,' রাখাল কথাটাকে ঘুরিয়ে নিল, 'ঠিক যে দেখতে চাই না তা নয়। দেখতে হ'লে নিশ্চয়ই দেখব, নতুন জিনিস দেখা হবে। তবে কি না···আমাদের হিন্দু বিবাহ-অনুষ্ঠান আরো কত সুন্দর। তার একটা ঐশ্বর্য আছে, তার মধ্যে একটা কাব্য আছে, একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে।'

'তা তো অস্বীকার করছি না, কি· সকলের পক্ষে তা ক'রে ওঠা সম্ভব হয় না সব সময়। সেটাও তোর বোঝার দরকার।' একটু গম্ভীর মুখে বলল জোদ্দা।

নীলুর চোখ স্থির, অথচ কিছুই দেখছে না, শূন্য দৃষ্টি। ভাবছে।

'হ্যাঁ,' বলল রাখাল। 'সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু তোর পক্ষে···অবশ্য জানি না, তুই হয়তো অতি মাত্রায় প্রগতিপন্থী, হয়তো এ-ধরনের বিয়ে অনেক দেখে দেখে তোর খুব ধাতস্থ হ'য়ে গেছে···'

'কী, রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ? মোটেই নয়। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হ'বি, আমার জানাশোনার মধ্যে কেউ কখনো রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করে নি। আমিই প্রথম করছি। এ-ধরনের বিয়েতে কী যে ঠিক ঘটে, তাও জানি না। এইবারই দেখব।'

'হ্যাঃ,' রাখাল যেন তার তাচ্ছিল্যটা না দেখিয়ে পারলো না, 'না আছে সানাই, না আছে মঙ্গলঘট, না আছে হুলুধ্বনি, না আছে স্ত্রী-আচার, শালীর কান মুলে দেওয়া, না আছে সাত পাক ঘোরা, না আছে শুভদৃষ্টি, কিচ্ছু নেই। সে বিয়ে আবার বিয়ে নাকি?'

একটু কেমন দুঃস্থের মত তাকাল জোদ্দা নীলুর দিকে (নীলু সমানেই ভাবছে, ভেবেই চলেছে, কে জানে কী পাহাড়-পর্বত সে ভাবছে এমন), পরে বলল:

'মানি সব মানি। কিন্তু আমাদের সত্যিই উপায় ছিল না, তুই বুঝবি না।'

রাখালের হঠাৎ মনে হ'ল, সত্যি তো, মেয়েটা তো ব্রাহ্মণ নয়—হয়তো সেই কারণে···নীলুর দিকে একটু লজ্জিতভাবে তাকিয়ে বলল:

'তাতে আর কী হয়েছে? উনি ব্রাহ্মণ নন ব'লে? আরে, এ-সব কী আর আজকাল কেউ ভাবে না কি?'

'আরে দূর,' হেসে উঠল জোদ্দা। 'তা' ভেবে তো আর আমাদের ঘুম হচ্ছে না!'

'তবে?'

'রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ ছাড়া আমাদের উপায় নেই—নানা কারণে।'

'যেমন ?'

'যেমন···প্রথমত, হিন্দুমতে বিয়ে করার মত পয়সা আমাদের নেই।'

'যাঃ, সেটা আবার একটা যুক্তি হ'ল!' পরে একবার জোদ্দার দিকে, আর একবার নীলুর দিকে তাকিয়ে (নীলু সমানই নিশ্চল, যেন আগের থেকেও আরো নিশ্চল মনে হচ্ছে, হয়তো এতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ক্লান্ত—তাই চুপচাপ) আবার বলল রাখাল :

'কত পয়সা লাগে হিন্দুমতে বিয়ে করতে ? আর সে পয়সা···'

'তোমার তো শুধু হিন্দুমতে কোনো রকমে নমো-নমো ক'রে বিয়ে হলেই চলবে না, তোমার সানাই চাই, তোমার মঙ্গলঘট চাই, স্ত্রী-আচার চাই, হুলুধ্বনি চাই, তোমার এটা চাই, ওটা চাই। তা এত আব্দার মিটোনোর মত পয়সা কোথায় পাচ্ছি ভাই ?'

'দ্যাখ'—হঠাৎ রাখাল যেন খুব আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠল—'ঠাট্টা রাখ। আমি কিন্তু একেবারেই ঠাট্টা করছি না। তোদের যদি সে-রকম কোনো আপত্তি না থাকে তো তোদের বিয়ে আমি দেব, আমরা দেব। তোর আরো তো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে কলকাতায় নিশ্চয়ই। মণ্টুবাবু আছেন, সৌরেন সেন আছেন। সকলে মিলে এক সঙ্গে জড়ো হ'য়ে বিয়ের বন্দোবস্ত করা যাবে। খরচ···'

জোদ্দা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে রাখাল বলল :

'দাঁড়া, আগে আমাকে শেষ করতে দে। ভালো না লাগে, করবি নে। কিন্তু আমার কথাটা শোন অন্তত শেষ পর্যন্ত। সত্যি, এ-সব রেজিষ্ট্রী-ফেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করিস নে—ভালো দেখায় না। কী জানি, আমার তো একেবারে ভালো লাগছে না। এসব ইউরোপ আমেরিকায় হয়, আমাদের দেশে নয়। কেন, আমাদের কি নিজেদের ধরনের বিয়ে নেই নাকি ? তোর-আমার বাবা-ঠাকুর্দাদের কে কবে রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করেছে বল তো ?'

'আহা, তুই বুঝছিসই না আমার কথাটা, বলছিলাম…'

'খুব বুঝছি।'

'আগে শোন তো আমাদের বক্তব্যটাও।'

'কিন্তু আগে আমার কথাটা শেষ করতে দে,' শান্তভাবেই বলল রাখাল। 'তুই বলবি, ইউরোপ-আমেরিকাকে কি আমরা স্বীকার না ক'রে পেরেছি? মেনে নিচ্ছি, স্বীকার নিশ্চয়ই করেছি। এবং তার দ্বারা প্রভূত ভাবে প্রভাবান্বিতও হয়েছি। এবং সেই প্রভাবটা যে আমাদের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়েছে, তাও নয়। বরং তা উল্টে আমাদের অজস্র ভালোই করেছে, তার প্রচণ্ড দরকার ছিল আমাদের। সেই প্রভাব বাদ দিয়ে আমাদের সাহিত্য দাঁড়াবে কোথায়, আমাদের চিন্তাধারা হবে কী? কিন্তু তার মানেও আবার এই নয় যে আমাদের সামাজিক বা অন্য ধরণের ঐতিহ্যগত যা কিছু আদর্শ বা ঐশ্বর্য আছে, সে-সব বিসর্জন দিয়ে অবিলম্বে অন্ধের মত সব কিছুতেই ইউরোপ-আমেবিকাকে অনুকরণ করতে হবে।'

'আচ্ছা ঝামেলা তো। এ-সব কথা তোকে কে বলেছে রাখাল? আমি বলেছি? আমি তোর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু কথা তো তা নয়। কথা হচ্ছে খরচেব ব্যাপারটা।'

'খরচ…'

চা এসে হাজির। বেয়ারার প্রস্থান। নীলু হাত লাগাল চা তৈরি করতে। কত চিনি দেবে? নীরবে ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল জোদ্দার দিকে। অতএব জোদ্দাকেই জিজ্ঞেস করতে হ'ল:

'কি রে, কত চিনি নিস তুই?'

'এক চামচ।'

কিন্তু এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে না মেয়েটা? এ কী মেয়ে রে বাবা? এত লজ্জা! না বোবা, কথা বলতে পারে না? কেমন একটু অস্বস্তি বোধ জাগল রাখালের। অবশ্য মুখে সে-ভাব

কিছু দেখাল না। সকলেই চা খেতে সুরু করেছে। রাখাল বলল ঃ

'না, এটা তোদের বিয়ে, আমার নয়। তাতে আমার হ্যাঁ-না বলার কী আছে, আর আমার কিছু বলার থাকলেও তা শুনতে তোরা বাধ্য নস। তবে বন্ধুলোক, বাল্যবন্ধু, সেইজন্যেই সম্পূর্ণ অজাচিতভাবে এত আগ্রহ দেখাচ্ছি, এই আর কি।'

'আরে, সে কি কথা,' জোদ্দা কিছুটা সান্ত্বনার সুরে ব'লে উঠল —যেন তার মনে হয়েছে, হয়তো রাখাল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'তুই তো আগ্রহ দেখাবিই, নিশ্চয়ই দেখাবি, আর সেটাই তো স্বাভাবিক। তুই আমাদের ভালোও চাস, তাও জানি। কী ভাবে এই বিয়েটা করলে তোর মতে শোভন হয়, তাই ভেবেই তুই এত কথা বলছিস, তাও খুবই ভালো ক'রে জানি। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কিছু গণ্ডগোল আছে, যেটা তুই জানিস নে।'

'সেই খরচের ব্যাপারটা? বলেইছি তো, সেটা কোনো কথাই নয়—সে ভার দরকার হ'লে আমরা নেব—আমরা, অর্থাৎ তোর বন্ধুরা। না, মিস দাশ—আমার কথা শুনুন, এ-রকম বিয়ে করবেন না। এ কী সব সাক্ষী-ফাক্ষীর কথা আপনারা বলছেন! সাক্ষী শুনলেই তো আমার চোর-ডাকাতি খুন-জখমের কথা মনে আসে। বিয়ের জন্য আবার সাক্ষী কী, আদালত কি বিয়ের জায়গা? রামো রামো। না-না-না, এ্যদ্দিনই যখন বিয়ে না ক'রে থাকতে পেরেছেন তখন কোনো রকমে আরো দুটো দিন সবুর করুন না—বেশ ভালো ক'রে হিন্দুমতে বিয়ে হবে। অবশ্য অল্পের মধ্যে, কিন্তু যথাসাধ্য ভালো ক'রে।'

নীলুর চোখ দুটো যেন এক মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ জ্ব'লে উঠল— হয়তো আশায়, আকাঙ্খায়, আশ্বাসে, স্বপ্নে। কিন্তু তা শুধু মাত্র এক মুহূর্তের জন্যেই, পরমুহূর্তেই আবার সেই পূর্বভাব মুখের, ও যেন একটা অস্ফুট দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল।

'না-না-না,' জোদ্দা বলল, 'এখন আর পিছোনো যায় না। সে-চিন্তা করাই অসম্ভব।'

'খরচ……'

'আরে দূর, তা কখনো হয়? আর তা আমরা মেনে নেবই বা কেন? আমার বিয়ের জন্যে তোরা কেন খরচ করবি? খরচ দরকার হ'লে আমিই করব, আমরাই করব। যেটুকু পারি, তাই করব। হিন্দুমতে বিয়ে করা যদি সম্ভব হত তো নিশ্চয়ই করতাম, তার জন্যে যা খরচ লাগত দিতাম। কিন্তু তা তো কথা নয়—কথা হচ্ছে, তা সম্ভবই নয়।'

'বেশ তো করিস নে,' একটু হাসির ভাব টেনে বলল রাখাল। 'খামাখা উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? আমি তোদের বিয়ে ভাঙছি না। তোদের বিয়ে তোরা করবি, যেমন ভাবে চাস, সেইভাবে করবি, বলেইছি তো।'

খানিকক্ষণ থেমে আবার বলল রাখাল—যেন না ব'লে পারল না, যেন আগ্রহ তাকে দেখিয়ে চলতেই হবে, তা ইচ্ছা থাক আর নাই থাক :

'কিন্তু তোদের অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরা, আত্মীস্বজন? তারা কেউ কোনো আপত্তি করে নি এই রেজিষ্ট্রি ব্যাপারে?'

'আত্মীয় স্বজন? কেউ নেই, আমারও নয়, ওর-ও নয়। আমার অবশ্য একটা বোন আছে—কিন্তু তার বিয়ে হ'য়ে গেছে, থাকে বনগাঁয়। নীলুর আবার তাও নেই।'

'ও', রাখালের মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোল না।

'হ্যাঁ, বুঝলি তো? ও-ও ইস্কুল মাস্টারি করে, আমিও ইস্কুল মাস্টারি করি। আমাদের কেউ নেই।'

'কেউ নেই? এই বিশ্বসংসারে তোরা তাহলে একেবারে একলা?'

'যা বললি। একেবারে একলা। এই বিশ্ব-সংসারে একেবারে একলা।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল জোদ্দার। পরে বলল :

'আর সেটাও একটা কারণ। কন্যা সম্প্রদান করবে কে? হিন্দু-মতে বিয়ে হবে কী ক'রে? আর তা ছাড়া অন্যান্য কারণও আছে। আরো কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে থাকবার মত সময়ও আমাদের নেই।'

রাখাল এখন অনেকটা নিস্পৃহ হ'য়ে এসেছে। এত আগ্রহ দেখিয়ে লাভ কী, কী দরকার? বলল:

'তা শুনেছিলাম রেজিস্ট্রী ম্যারেজে নাকি কী সব নোটিশ-ফোটিশ লাগে? সে সব করেছিলি?'

'নিশ্চয়ই। না ক'রে উপায় কী?'

'এক মাসের নোটিশ, না? না তার চেয়েও বেশি?'

'না, এক মাসেরই।'

ব'লেই জোদ্দা একটু অপ্রতিভের মত হাসল, তাকাল নীলুর দিকে। পরমুহূর্তেই কী যেন বলতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু বলল না।

'হাসলি কেন?' রাখাল জিজ্ঞেস করল।

'না, কিছু নয়।'

'ও।'

'না—তবে তোকে···' কেমন যেন ইতস্তত একটা ভাব জোদ্দার। আবার তাকিয়ে নিল একবার নীলুর দিকে। পরে বলল:

'তবে তোকে বলতে আর লজ্জা কী? কিন্তু কাকে বলিস না যেন ভাই। অবশ্য মন্টুবাবুকে আগেই বলেছি—তিনি সবই জানেন।'

'কী?' আবার যেন একটা প্রচণ্ড কৌতূহল চেপে ধরল রাখালকে।

'না, তেমন কিছু নয়, শুধু···আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস? এক মাসের নোটিশ লাগে, সেইটেই নিয়ম। কিন্তু অত সময় আমাদের হাতে ছিল না। এ মাত্র দিন পাঁচেক আগে নোটিশটাকে টাঙানোর বন্দোবস্ত করেছি। অবশ্য তারিখটাকে পঁচিশদিন পিছিয়ে দিয়ে।'

'অর্থাৎ ?' রাখাল হঠাৎ রীতিমত সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

'ঘুষ,' বোকার মত হাসল জোদ্দা। কালো হ'লেও দেখা যাচ্ছে, কান ছুটো তার লাল হ'য়ে উঠেছে। আর নীলু ? তার চোখ ছুটি নামানো, হাতের এক বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে সে এখন হঠাৎ আরেক বুড়ো আঙুলের নখের ভিতর নোংরা খুঁজে বার করবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আবার বলল জোদ্দা :

'ঘুষে কী না হয় ? আর তেমন একটা মারাত্মক কিছু ঘুষও নয়, এক টাকা। ব্যস্, তাইতেই কাজ হাঁসিল।'

মানে ? রাখালের ভিতরটা যেন কেমন ক'রে উঠল। অবশ্য ঘুষের কথাটা শুনে নয়। ভগবান জানেন, ঘুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয়ের কোনো অভাব তার আছে কি না—সে ইনকাম ট্যাক্স আপিসে কাজ করে। কিন্তু জোদ্দার কথাটার মধ্যে সে যেন একটা ইংগিত দেখতে পেল, এবং সে-ইংগিতটাকে তার খুব ভালো ব'লে যে মনে হ'ল, তাও নয়।

এত বছর অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারলে, আর পঁচিশটা দিন অপেক্ষা করতে পারলে না ? কেন, এই পঁচিশটা দিন কোনো রকমে অপেক্ষা ক'রে থাকলে হত কী ? মা-বাবা বাদ সাধতেন ? কিন্তু মা-বাবা তো নেই। আর তাঁরা থাকলেও তাঁদের কথা কি তোমরা শুনতে ? আজকাল আর সে-সব চলে না। ছুজনেই বড় হয়েছ—বড় কেন, বিয়ের বয়স পর্যন্ত পেরিয়ে গেছে। ছুজনেই চাকরী কর, স্বাধীন। তবে ? আর মা-বাবা তো তোমাদের কারুরই নেই—মা-বাবা কেন, কোনো আত্মীয়স্বজনই নেই বললে। সুতরাং ?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন কে জোর ক'রে রাখালের চোখ ছুটোকে টেনে নিয়ে গেল নীলুর দিকে। রাখাল তাকাবার চেষ্টা করল মেয়েটার পেটটার দিকে। হঠাৎ যা করছে, তা ভেবে নিজেরি এমন লজ্জা হ'ল যে চোখ ছুটোকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে নিল। মেয়েটা

যদি ধরতে পেরে থাকে? ছি-ছি-ছি। কিন্তু কই তেমন কিছু তো দেখা গেল না? আর দেখা যাবেই বা কেমন ক'রে? যেভাবে বসেছে, যেভাবে শাড়িটাকে গায়ের সঙ্গে জড়িয়েছে, তাতে কিছু আঁচ করবার যো আছে কি? বলা যায় না, হয়তো সেই কারণেই শাড়িটাকে জড়িয়েছে এমন ক'রে' যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। এবং হয়তো সেই কারণেই মেয়েটা এসে এসতোক একটা কথা পর্যন্ত বলছে না। কারণ ভেতরে-ভেতরে একটা লজ্জার ভাব তো আছে। ও, এই বুঝি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। আর হবে না-ই বা কেন? এ্যাদ্দিন বিয়ে না ক'রে থাকা সইবে কেন? তাই প্রথম অবকাশেই বহুদিনের সঞ্চিত আকুলতা ও ব্যর্থতাটাকে···যাকগে। আমার কী, ভাবল রাখাল।

কিন্তু দাঁড়িয়ে যখন ছিল, সন্দেহ করার মত কিছু দেখেছে কি? রাখাল মনে করার চেষ্টা করল। কই, না তো। এতটা হেঁটেও এল বেশ, তখনো কিছু নজরে পড়ে নি। বলা যায় না, হয়তো প্রথম অবস্থা মাত্র। খবরটা জেনেছে যেই, সঙ্গে সঙ্গে দুজনে বিয়ের জন্যে লেগেছে—আর এক মুহূর্ত তর সয় না। কিন্তু মন্টুবাবুকে এটাও বলেছে নাকি?

বলুক আর নাই বলুক, তাতে রাখালের কী? সেও কি পীড়া-পীড়ি ক'রে সত্যি কথাটা জেনে নেবে নাকি? কী দরকার? এবং কেনই বা সে জানতে চাইবে এসব কথা? ছি-ছি-ছি। আর ওরা বলবেই বা কেন? কিন্তু মন্টুবাবুকে তো বলেছে। না-না-না, মন্টুবাবুকে নিশ্চয়ই বলেনি—তবে মন্টুবাবু আঁচ হয়তো করেছেন, যেমন রাখালও করছে। কম ধড়িবাজ লোক নাকি মন্টুবাবু?

যাক গে, করেছে তো করেছে, তাতে হয়েছে কী। শেষে বিয়েটা তো করছে, আর সেইটেই বড় কথা। বিয়ে করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এমন অবস্থায় অনেকে তো আবার বিয়ে পর্যন্ত করে না—কাণ্ড-কাণ্ড ক'রে মেয়েটাকে ছেড়ে দেয়, গা ঢাকা দেয়। জোদ্দা

তো সেটা করে নি। আর তাছাড়া রাখাল তো শুধু অনুমানই ক'রে চলেছে, সত্যিকারের ব্যাপারটা তো সে কিছু জানে না। বলা যায় না, আসলে হয়তো কিছুই হয় নি। আশা করা যাক, কিছুই হয় নি।

কিন্তু রাখালের আগ্রহের আতিশয্যটা বেশ একটু দ'মে গেছে, সন্দেহ নেই। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে তেমন ভরসা পাচ্ছে না। কে জানে বাবা, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়।

'কিন্তু কথাটা যেন কাউকে বলিস না, ভাই,' অনুনয়ের সুরে বলল জোদ্দা।

'কী কথা?' রাখাল চমকে উঠল।

'বললাম না? এই নোটিশের ব্যাপারটা। কাউকে বলিনি আমরা, শুধু মণ্টুবাবুকে। আর এই তোকে বললাম। এটা নিয়ে যেন কোনো জানাজানি না হয়।'

'খেপেছিস? আমি কাকে বলতে যাব? আর কেনই বা বলব? আসলে আমাকেও না বললে পারতিস।'

'কেন বল তো? ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়েছে, না?'

'না, খারাপ আর কি। তবে ঘুষ-ফুষের ব্যাপার জানাজানি না হওয়াই ভালো। বিশেষ ক'রে, আদালত-সংক্রান্ত জিনিস তো।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সেইজন্যেই তো কথাটা চাপতে চাই। তোকে বললাম, কারণ তুই বন্ধু লোক, বহুকালের বন্ধু। জানি, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমাদেরও উপায় ছিল না, বুঝলি।'

'বুঝছি', গম্ভীর ভাবে বলল রাখাল।' 'এখন তাড়াতাড়ি বিয়েটা ক'রে নে, সেইটেই একমাত্র কাম্য।'

'নিশ্চয়। তাই তো এত তাড়া করছি। এবার বুঝেছিস তো? তোকে সব খুলে বললাম, কারণ মনে হচ্ছিল তুই হয়তো ব্যাপারটা ধরতে পারছিস না। ভাবছিস, কী এত তাড়া রে বাবা। এই দিন দুপুরে বিয়ে, এ্যাদ্দিন বাদে বিয়ে—একটা বাল্য বন্ধুর সঙ্গে

দেখা, এত যুগ বাদে হঠাৎ দেখা, অথচ ছেলেটার এক মুহূর্ত বসার সময় নেই, একটি কথা কওয়ারও…'

রাখালের কানে যেন আর কিছুই ঢুকছে না। সে কেমন উদাস হ'য়ে গেছে হঠাৎ। নীলু সেই সমানেই ব'সে আছে, চুপ ক'রে। আর তার পাশেই জোদ্দা। তাদের সামনে রাখাল, মুখোমুখি। যেন এদের দুজনের একটা গূঢ় সত্যের সামনেও আজ সে হঠাৎ মুখোমুখি, দৈবের এক আশ্চর্য প্রহসনে। এখন এদের দুজনকে সে করবে কী? এই সত্যের সামনে মুখোমুখি হ'য়ে কতক্ষণই বা সে ব'সে থাকবে? তাদেরই বা কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? মণ্টু-বাবুরা যদি না আসে? সত্যি, কী আশ্চর্য ভদ্রলোক। আর সৌরেন সেনটাই বা কী! কী ঝামেলা রে বাবা! এর চেয়ে কাজ করা ছিল ভালো। আর্জেন্ট ফাইলগুলো অনায়াসেই আজ শেষ ক'রে ফেলা যেত। কানোরিয়ার কেসটা এখনো চলছে, কিন্তু তার সেক্রেটারী অবশেষে কবুল করেছে জাল সই-এর ব্যাপারটা। ফাইলটা রয়েছে একেবারে চোখের সামনেই—তার মতামতের প্রয়োজন আছে। নতুন তথ্য তো হাতে এসেছে কিছু, সেটা জানাতে হবে অবিলম্বে। এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার এবার কী বলবেন? এটাও একটা কম রোমাঞ্চকর কাণ্ড হয় নি। এখন কানোরিয়া বাছাধন যাবে কোথায়? ব্যাটাকে হাতে-নাতে ধরা গেছে। অবশ্য একদিনে নয়—কত ফন্দী-ফিকির করার পর। সেক্রেটারীটা কি সহজে কবুল করে? শেষে পুলিসের ভয় দেখাতে হ'ল। ভয়ে কী না হয়। জোদ্দা বলছিল, ঘুষে কী না হয়। হ্যাঁ, সেটাও সত্য।

হঠাৎ মণ্টুবাবুর বিরুদ্ধে একটা বিজাতীয় আক্রোশ আবার জেগে উঠল রাখালের মনে। আক্রোশটাকে বার বার নতুন ক'রে তাকে আরো কতবার জাগাতে হবে? এসে যান না ভদ্রলোক—তাঁর সমস্যা তিনি ঘাড়ে নিন। তাহ'লেই তো ব্যাপারটার ইতি, জোদ্দা ও নীলুর হাত থেকে তারও নিষ্কৃতি। কিন্তু কেনই বা

মেয়েটার ওপর খাম'খা রাগ করা? আহা বেচারা। কিন্তু বেচারা কেই বা নয়? রাখাল নিজেই কি কম বেচারা? কী দরকার ছিল তার এই সব ঝামেলার মধ্যে জড়িত হওয়ার? রাস্তায় নিশ্চয়ই অজস্র লোক, যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে। কী প্রচণ্ড গরম রে বাবা। একটা সুখও নেই এই হতভাগা সহরে। অবশ্য ঘরটা ঠাণ্ডা এই যা রক্ষে।

'ওদের তো আসবার নামও নেই, কী করি বল তো?' জোদ্দা জিজ্ঞেস করল।

'এখনো তো সময় যায় নি—ছাখ না।'

'সময় অবশ্য আছে, এখনো কিছুটা আছে। কিন্তু···ধর যদি ওরা শেষ পর্যন্ত নাই এল, তখন?'

'আরো তুজন সাক্ষীর তোদের দরকার, এই তো?'

'হ্যাঁ, মাত্র তুজন। ভাবছিলাম, এখন থেকেই একটা আলাদা রকমের ব্যবস্থা ক'রে রাখা যাক না কেন, তারপর যদি ওরা এসে পড়ে সময় মত তো ভালোই, ওদের নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। আর যদি না আসে ধর, তখন···'

'এখান থেকে তুজন সাক্ষী নেওয়া?'

'হ্যাঁ, তার একজন তুই হ না? যাবি আর আসবি, এই এখানে তো।'

'আমি? হ্যাঁ···' একটু ইতস্তত ভাব রাখালের। পরে বলল:

'কিন্তু তাহ'লে তো তোদের আরো একজন চাই?'

'একজন পেলে আরো একজনও মিলে যাবে। প্রথম যা দরকার তা হচ্ছে অন্তত একজনকে পাওয়া। আর তোকে ছাড়া আর কাকেই বা বলি ভাই, বল? আর কাকেই বা চিনি এখানে?'

কী করবে রাখাল? নীলুর দিকে চেয়ে দেখে, তার চোখে ব্যগ্র প্রতীক্ষা। এখন কী বলে রাখাল, যাবে? না গিয়েই বা

উপায় কী? এতক্ষণ ধ'রে এত আশ্বাস দিয়েছে, এখন পেছোয় কী ক'রে? মণ্টুবাবুটা একটা আহাম্মক, একটা অপদার্থের শেষ। কী অনাবশ্যক ঝামেলা বলতো! অবশ্য এতদিনের একটা বন্ধু। কিন্তু···হঠাৎ রাখাল ব'লে ফেলল ঃ

'তোদেব সঙ্গে যেতে পারলে তো ভালোই হত। যাব ব'লে ঠিকও করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, একটি ছোট্ট তদন্তের কাজে আমাকে এখুনি বেরোতে হবে।'

'এখুনি?' জোদ্দার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে।

সত্যি, কষ্ট হয় দেখতে—বেচারা এত আশা ক'রে আছে। কিন্তু রাখালই বা করে কী?

'এখুনি মানে এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই', বলল রাখাল।

'ঘণ্টাখানেক তো অনেক সময়, তার মধ্যে তোকে খালাস ক'রে দেবই। তার আগেই তুই রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ফিবে আসতে পারবি এখানে।'

'না ভাই, এ বড্ড জরুরী কাজ। সময়ের একটু এদিক-ওদিকের জন্যে যদি ব্যাটার দেখা না পাই তো পরে এখানে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে। জানিস না তো, কী হতচ্ছাড়া আপিস। আসলে আমি এখুনি বেবোতে চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কেবল তোদের একটা সুরাহা প্রথমে ক'রে দেওয়া···।'

কী ভাবে বললে কথাটা ধাপ্পাব মত না শোনায়, তাবই প্রাণপণ চেষ্টা কবছে রাখাল। অথচ জানে সে, কত বড় মিথ্যা এই অজুহাত।

বেবোনোর কথা উঠতেই প্রথমে তাব মনে হয়েছিল, যাবে চ'লে ওদের সঙ্গে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে, কী দরকার, এই রোদ্দুরে, ঘামে? বেশ তো আছি ব'সে। অবশ্য রোদ্দুরটা এড়ানো যায়, ফুটপাথের ছায়ায় ছায়ায় দোকান দেখতে দেখতে চ'লে যাওয়া যায়, কাছেই তো। কিন্তু গরমের ঝাঁঝটা, সেটা এড়াবে কী ক'রে?

দ্বিতীয়ত, ও প্রধানত, ব্যাপারটাকেও বেশ একটু গোলমেলে ঠেকছে। জানে না, শোনে না, কোথায় যাবে সাক্ষী দিতে? তারপর এই সব সাক্ষী-ফাক্ষী দিতে গিয়ে শেষে একটা বিপদে পড়ুক আর কি। ছেলেটাকে অবশ্য চিনত একদিন, কিন্তু তা বহুকাল আগে। তারপর সে-ছেলেটা কী করেছে, কী হয়েছে, শেষে আজ একটা দুশ্চরিত্র বদমায়েশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, এ সবের সে কিছুই জানে না। আর মেয়েটাকে তো জীবনে আগে কখনো দেখেনি পর্যন্ত। এমন অবস্থায় হুট ক'রে আদালতে গিয়ে সাক্ষী-টাক্ষী দেওয়াটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে? তারপর ঐ ঘুষের ব্যাপাটাও শুনেছে জোদ্দার কাছে, সেটাও তাকে কম ভড়কিয়ে দেয় নি। না বাবা, সে সরকারী চাকরি করে, কত সাধ্য-সাধনার এই চাকরিটি। তার নামে আজ পর্যন্ত কোনো কলঙ্ক ওঠেনি, কখনো তাকে আদালতে দাঁড়াতে হয় নি। শেষে আজ একটা ছেলেবেলা-কার বন্ধুর মুখ রাখতে গিয়ে একটা মিথ্যা চক্রান্তে লটকে পড়ুক আর কি। তারপর তাকেই একদিন দাঁড়াতে হবে আসামীব কাঠ-গড়ায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে এত সাধের এই চাকরিটিকে শুভ বিদায় জানানো। না বাবা, ওটি হচ্ছে না!

চুনী সান্ন্যালের কী হয়েছিল? এই তো সেদিনকার ঘটনা। চুনীর এক সরকারী আপিসে ছোট কেরানীর কাজ। সেও এই রকম একটি বন্ধুর মুখ রাখতে গিয়ে কী ফ্যাসাদেই পড়েছিল। বন্ধুটি প্রভাত মজুমদার, তার কি এক কনট্রাক্টের চাকরী এক বিদেশী ফার্মে। প্রভাত একবার দুশো টাকা ধার করে এক মহাজনের কাছ থেকে, বছর তিনেক আগে। সেই ঋণের ব্যাপারে চুনী জামিন দাঁড়ায়। কী করবে? প্রভাতকে সে অবিশ্বাস করতে পারে নি। আর তার এই ভুলের প্রায়শ্চিত্তও প্রভাত তাকে করিয়ে ছাড়ে। টাকা শোধ দেওয়া তো দূরের কথা, প্রভাত কাউকে কিছু না ব'লে হঠাৎ উধাও হ'য়ে যায়, লক্ষ্ণৌ না আমেদাবাদ, কোথাও। তার

পাত্তা নেই। তখন মহাজন কঁ্যাক ক'রে ধরেন এই চুনী সান্ন্যালকে। ঋণের তুশো টাকা ততদিনে সুদে-আসলে চারশোর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। অত টাকা চুনোপুঁটী চুনী পাবে কোথায়? তখন তার এ-দরজা থেকে ও-দরজায় ছুটোছুটি। এই রাখালের কাছেই সে কতবার এসেছে। এবং শেষ পর্যন্ত রাখালই তাকে বাঁচায় সুবুদ্ধি দান ক'রে, আইনের নানান ফন্দী-ফিকির শিখিয়ে। ইন্‌কাম-ট্যাক্স আপিসের অভিজ্ঞতা তো কম নয়। সে যাই হোক, চুনীর সেই মরিয়া ভাবটার কথা মনে পড়ছে রাখালের, গলার স্বরটা যেন কান্নার মত: 'দাদা, দয়া ক'রে বাঁচান। টাকাটা বড় নয়। টাকা থাকলে দিয়ে বাঁচতাম। ভয় পাছে এই আদালত-ফাদালতের কথাটা জানা-জানি হ'য়ে যায় আমাদের আপিসে। তাহ'লে আমার এই সামান্য চাকরিটাও থাকবে না, জীবন নিয়ে টানাটানি হবে।'

কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে। চুনী ঠেকে শিখেছিল, রাখাল দেখে শিখেছে, চুনীকে দেখে। সমস্ত ঘটনাটা যেন এক ঝলকে মনে প'ড়ে গেল তার। না বাবা, এ-সব ব্যাপারে তার মাথা গলানোর কোনো দরকার নেই। মুখে বলল:

'ভাবনা কী? তুজন সাক্ষী চাই তো? অনায়াসে জোগাড় ক'রে দেব। তুজন কেন, দশজন বলিস তো দশজনই জোগাড় ক'রে দেব।'

'বলে একজনই পাই না, দশজন,' হেসে (যেন একটু জোর করে হেসে) বলল জোদ্দা। 'তো জোগাড় করে দিবি তো ভাই? মানে তুজন?'

'নিশ্চয়। কথা দিচ্ছি। তোদের তো চারটে চারটে-দশ নাগাদ...'

হঠাৎ রাখাল দেখে, এক কণা রোদ এসে পড়েছে নীলুর মুখের উপর। তাড়াতাড়ি বলল:

'ও হো, আপনার মুখে রোদ লাগছে। পর্দাটা টেনে দেব ভাল ক'রে?'

'চেয়ারটা একটু সরিয়ে বোসো নীলু।' বলা বাহুল্য, জোদ্দাই উত্তর দিল।

'নীলু একটু স'রে বসল।'

ভালো রে ভালো, এ-মেয়েটা কি কিছুতে কথা বলবে না? না কথা বলতে পারে না, বোবা? হয়তো বোবাই, জোদ্দা তাই সহজে পেয়েছে। কে জানে, হয়তো এ-বিয়ের মধ্যে আরো কোনো গভীর রহস্য আছে। কিন্তু বোবা যদি হয় তো শুনতে পায় কী ক'রে? শুনতে যে পায় তাতে তো সন্দেহ নেই। হয়তো বোবার ইস্কুলে লোকের ঠোঁট নাড়া-টাড়া দেখে শুনতে শিখেছে। কিন্তু জোদ্দা যে বলল, মেয়েটাও নাকি মাস্টারি করে? বলা যায় না, হয়তো বোবার ইস্কুলেই মাস্টারি করে। কিন্তু সে-ধরনের কোনো ইস্কুল সিউড়িতলার কাছে আছে নাকি? রাখাল তো শোনে নি।

কিন্তু রাখালও নাছোড়বান্দা, মেয়েটাকে দিয়ে কথা ও বলাবেই। নীলুর দিকে চেয়ে বলল:

'এতক্ষণ এসেছেন, আপনি একটাও কথা বললেন না। কেন বলুন তো? লজ্জা? আমাকে লজ্জা করবেন না দয়া ক'রে। আমি জোদ্দার অনেক কালের বন্ধু। আপনি···আপনি ওকে কবে প্রথম দেখেন?'

নীলু কিছু একটা বলতে উদ্যত ব'লে মনে হ'ল, এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

'যাক, অন্তত সৌরেন সেন এসে গেছে।' জোদ্দা যেন লাফিয়ে উঠল।

নীলুর চোখেও এক হঠাৎ আশার দীপ্তি।

যাক বাবা, বাঁচা গেল, রাখালেরও মনে হল। 'চক্রবর্তী কথা বলছি,, ফোন তুলে বলল। তারপর ফোনের কথা শুনতে শুনতে ও থেমে থেমে: 'হ্যাঁ, স্যার···হ্যাঁ স্যার···এক্ষুণি আসছি স্যার।'

ফোন নামিয়ে রাখল রাখাল।

'স্যার' শুনেই চোখে যে-দীপ্তির আভা জেগেছিল এক মুহূর্ত আগে তা তখুনি নিবে গেছে--জোদ্দারও, নীলুরও।

'নয় ?' আকুল কণ্ঠ জোদ্দার।

'এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার। আসছি এক্ষুণি। তোরা একটু বস। ভাবিস না, তোদের সাক্ষী যোগাড় করার ভার আমার।'

এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার ফোন ক'রে ভালোই করেছেন, রাখালের মনে হ'ল। সে আপিসে শুধু ব'সেই থাকে না, ব'সে ব'সে গল্পই করে না, মাঝে মাঝে কাজও করে—সেটা তো দেখানো গেল। আর এখন এই দুজনের চোখে তার বাইরে যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতটাকেও আরো সহজে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলা যাবে। ফিরে এসে না হয় সেই অজুহাতটাকেই আরো ভালো ক'রে পাড়বে।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে একবার ভালো ক'রে নীলুর দিকে না তাকিয়ে পারল না রাখাল।

মেয়েটার সেই একই শান্ত, অর্ধ সমাহিত ভাব। যদিও সেই চকিত হরিণীর চোখ দুটি আর তত খেলছে না। এবং সমস্ত মুখখানায় যেন কী এক দুশ্চিন্তার মেঘ।

পাঁচ ॥ অন্তর্লীনা

অত কী ভাবছে নীলু? কেন এসে এস্তোক একটি কথাও বলল না? কিন্তু কথা তো সে তেমন কোনোদিনই একটা বলে না, আর আজ বিশেষ ক'রে এত ব্যাপারের পরে···এবং তা ছাড়া, কথা বলার আছেই বা কী? অন্তত তাকে, জোদ্দাকে, দোষী সাব্যস্ত নিশ্চয়ই করছে না নীলু? আর তা কেনই বা করবে? কেন, ওর কি চোখ নেই, ও কি দেখতে পাচ্ছে না, ও কি বুঝতে পারছে না যে এতে জোদ্দার কোনো হাতই ছিল না, জোদ্দা কোনো দোষই করে নি, অন্তত ইচ্ছে ক'রে করেনি? জোদ্দা চেয়েছিল যা নীলুও চেয়েছে। এবং তা জোদ্দা এখনো চায় সমানই একাগ্রতার সঙ্গে।

কিন্তু নীলু তার হাবেভাবে আচরণে এমন কোনো ইঙ্গিতই এখনো পর্যন্ত দেখায় নি যাতে মনে হ'তে পারে, অন্তত মনে একটা সন্দেহ উঠতে পারে যে হয়তো সে জোদ্দার ওপর রাগ করেছে। সুতরাং জোদ্দা কেন আবার আগে থেকে মিছি-মিছি একটা ভয় পেয়ে যাবে, কেন সে আবার আকাশ-পাতাল ভাববে? রাগ তো করেই নি, বিরুদ্ধতার কোনো ভাব তো দেখায়ই নি, বরং সেই একই স্নিগ্ধ সস্নেহ চাওয়া তার চোখ দুটির। কেবল যা একটু ক্লান্ত। এবং যেন একটু ঘাবড়েও গেছে। কিন্তু রাগ? না, রাগ সে করে নি। হয়তো, কে জানে সেই চিন্তাটা আবার হঠাৎ হঠাৎ জাগছে মনে, সেই স্মৃতিটি মাঝে মাঝে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। নইলে হঠাৎ হঠাৎ কেন ওর চোখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন চোখের দীপ্তি নিবে যাচ্ছে, যেন ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠছে, ঠিক সেই আগের মতনই বিহ্বল হ'য়ে উঠছে? অন্তত সেই রকমই তো মনে হচ্ছে জোদ্দার।

তবে কি জোদ্দা কাছে যাবে, ওর কাঁধে একটু হাত রাখবে কিন্তু সাহস নেই যেন, যেন ঘরটার নীরবতা ভাঙতে ভয় করছে। যেন তাদের এতদিনের পরিচিত জগত হ'তে ওরা হঠাৎ এসে পড়েছে আজ এক সম্পূর্ণ অন্য জগতের এই ঘরে, এবং এই ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে জানলায়-জানলায় টেবিলে-চেয়ারে যেন নীরব ফিস্‌ফিস কানাকানি চলেছে জোদ্দা-নীলুর এবার কী হবে বা হওয়া উচিত, তাই নিয়ে। যেন ঠিক এই মুহূর্তে, এবং এই ঘরেতেই, নিয়ন্ত্রিত নিরুপিত নির্দিষ্ট হ'তে চলেছে তাদের দুজনের নিয়তি, তাদের অলক্ষ্যে, তাদের অজান্তে, তাদের কানেব অগোচরে। এক মহান মন্ত্রণাসভা যেন বসেছে এই ঘরটাতে, এবং সেই সভার কার্যক্রমে কোনো রকমে কোনো ব্যাঘাত ঘটানো কিছুতেই চলবে না। তাই কথা বলবে না জোদ্দা, কারণ কে জানে, কথা বললে পাছে চ'টে যায় এই দেয়াল, এই জানলা, এই টেবিলে-চেয়ার, পাছে তারা রেগেমেগে ব'লে ওঠে: 'যাঃ ব্যাটা: তোর আর তোর ঐ মেয়েটার নিয়তির খাতার পাতায় বসিয়ে প্রায় ফেলেইছিলাম একশোর মধ্যে একশো, এখন বসাব গোল্লা।'

মূলত অঙ্কের মাস্টার তো, তাই অঙ্কটাই মনে পড়ছে। হাসি পেল জোদ্দার।

রাখাল এখনো ফেরেনি। সে অন্তত ফিরবে আশা করা যাক, সে অন্তত মণ্টুবাবুর মত করবে না, সৌরেন সেনের মত করবে না। এ কার ঘরে, কাদের ঘরে, ওরা দুজনে আজ এই দুপুরটা কাটাতে এল? যাদের ঘর, তাদের দুজনের একজনও নেই, তাদের বদলে আছে সিউড়িতলার জয়দ্রথ খাঁ ও নীলাঞ্জনা দাস। খাসা। আবার হেসে উঠতে ইচ্ছে করল জোদ্দার। পরক্ষণেই, এক বিজাতীয় ভয়ে গলা যেন শুকিয়ে এল। না, দেখে যাও শুধু টিপ্পনী কেটো না, টিপ্পনী কাটার কোনো অধিকার তোমার নেই, নিজে বলল জোদ্দা যেন নিজেরি মনকে।

নীলুর সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হ'য়ে গেল, এবং মনে হ'ল নীলু হাসল। এই চাওয়ার মধ্য দিয়েই। তবে? কেবল যত বাজে ভাবনা জোদ্দার। এখন রাখালটা এলেই সব ঠিক হ'য়ে যায়। আপিসের কোন কর্তা, কোন বড়বাবু না ছোট বাবু, যে ওকে ডাকল, সে ওকে ছেড়ে দেবে তো, তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেবে তো? দূর, আবার সেই আবোল-তাবোল ভাবছে জোদ্দা।

যাক গে।···নীলাঞ্জনা, সত্যিই, কী সার্থক নাম। ঐ চোখ দুটো দেখলেই বর্ষার মেঘের কথা মনে পড়ে। কী স্নিগ্ধ, সুন্দর। আবার যখন দুর্ভাবনার কোন ঝড়ে তাদের আকুল করে, চোখ দুটি তখন হঠাৎ কী করুণ, কী ত্রস্ত। নীলুর সান্নিধ্যে যেন কাজল মেঘের স্পর্শ, বার বার মনে হয়েছে জোদ্দার। ঐ এক ফালি স্নিগ্ধ করুণ কাজল মেঘের দরকার ছিল তার আজীবন পুড়ে-যাওয়া দিগন্তের আকাশটায়। তাই তো জোদ্দা এত আকুল হয়েছে এই এক মাস ধ'রে, যেন আর তর সয় না। অথচ নীলুও সমানই আকুল। মিলেছে বেশ।

ঐ চোখ দুটোর সঙ্গে বর্ষার কী আশ্চর্য এক সম্পর্ক। মনে পড়ছে সেই বর্ষার দিনটা—মনে করতে ভালো লাগছে এই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের অপরাহ্নে, এই ঘাম প্যাচপেচে নোংরা কলকাতায়, এই বন্ধ ঘরের স্তব্ধ মুহূর্তে—আর নীলুও তো ব'সে সামনেই, সেই একই নীলু, সেদিনের নীলু, সেই ঝমঝম বর্ষার দিনের, ও তার পরে আরো কত দিনের, কত আপন হ'য়ে-ওঠা নিবিড় মধ্যাহ্নের, অপরাহ্নের, সন্ধ্যার, সেই নীলু।

ঝম ঝম বর্ষার দিনটা। যেন সব মুছে গেছে সিউড়িতলায়, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার টিনের চালাটায় জলের গোটা গোটা দানার শব্দের একটানা ঐকতানে কানে তালা ধ'রে যাবার যোগাড়—শোনাও যাচ্ছে না কিছু। তবু, তবু শুনতে পেয়েছিল তো নীলুর গলাটা, সেই অস্ফুট, তখনো অনিশ্চয়, দ্বিধাগ্রস্ত, অত্যন্ত

লাজুক কণ্ঠস্বর। আর সেই ভীষণ ইতিবৃত্ত তার, ঐ কাজলচোখ করুণ স্নিগ্ধ মেয়েটার, তাও তো শুনতে পেয়েছিল জোদ্দা।

'তারপর?' প্রশ্ন করেছিল জোদ্দা।

'তারপর?' হেসে বলেছিল নীলু তার স্বাভাবিক আস্তে গলায়, 'তারপর আর কী? এই এখানে।'

চুপ ক'রে বসেছিল জোদ্দা, বাইরে তাকিয়ে। সব ঝাপসা বৃষ্টিতে। নীলুই ব'লে ওঠে আবার:

'থাক, শুনলেন তো? এখনো চান?'

মনে আছে, উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে মুখে আসেনি জোদ্দার, একটু সময় নিয়ে তাকে বলতে হয়:

'চাই, আর আপনি?'

'চান? সত্যি চান?' যেন বিশ্বাস হয় না নীলুর।

'হ্যাঁ, এখনো চাই। কিন্তু আপনি, আপনিও কি চান?'

'আমি? জানি না।' ব'লেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল নীলু।

পরক্ষণেই, ঐ আশ্চর্য কালো ডাগর দুটি চোখ তুলে স্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জোদ্দার দিকে। অথচ শুধু হাসিই ছিল না চোখে, ছিল যেন অপ্রকাশ্য অনির্দেশ্য আরো অনেক কি —ছিল ভয়, আশা, দ্বিধা, করুণা, প্রত্যাশা, এবং হয়তো কিছুটা বিশ্বাসও জোদ্দার উপর। জোদ্দা তো জানে না, কী ক'রে জানবে? সে তো তার এই রকম ডাগর ডাগর দুটি চোখের সম্মুখীন হয় নি আগে কখনো, মেয়েদের মনের অলিগলি বোঝবার বাসনাও জাগে নি তার কোনোদিন। সে-অবকাশও আসে নি। ঐ যা এক সুরভি লাহিড়ী···থাক গে, আবার সুরভি কেন।

কিন্তু সেই বহুকাল আগের একটা ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে প্রেম, আর এখনকার এই ব্যাপারটা, এ-দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, মনে হয়েছিল জোদ্দার, সেদিনকার সেই ঝম ঝম বর্ষায়।

নীলু বলছে, সে জানে না। তার মানে কি সে চায় না? কী ক'রে বুঝবে জোদ্দা? না জোদ্দারও একটু জোর করা উচিত, একটু পীড়াপীড়ি করা উচিত, তাহ'লেই মেয়ে রাজী হ'য়ে যাবে? সোজাসুজি রাজী হ'তে হয়তো লজ্জা করছে। কিন্তু সে-ধরনের খুব একটা লজ্জা থাকলে তাকে এত কথা খোলাখুলি বলতে পারতও না নীলু এমন ক'রে—এত কথা অতীতের, লজ্জাহীনতার, নৃশংসতার।

এবং নীলুর ওপর জোর সে করতে যাবে কেন, পীড়াপিড়ি করবে কেন? পীড়াপীড়ি ক'রে, জোর ক'রে কি কিছু হয়? অন্তত তার তো কিছু হয় নি আজ পর্যন্ত। কতবারই তো জোদ্দা জীবনটার ওপর জোর করতে গেছে, জীবনটাকে গড়তে চেয়েছে তার মনের মতন ক'রে, আর প্রতিবারই সেই প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এলোমেলো মরণ নেচেছে, সব তছনছ হ'য়ে গেছে। অতএব, এখন কর্তব্য কী? বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি সমানেই প'ড়ে চলেছে।

'যা হয়েছে, তা হয়েছে। তা ভয়ানক, মানি, কিন্তু যা হ'য়ে গেছে তা নিয়ে অত ভাবছেন কেন?' তবু বলল জোদ্দা, নীরবতা ভেঙে। সে যে মানুষ, বাঁচবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে তার জন্ম এই ধুলোর ধরনীতে, কী ক'রে আশা না ক'রে সে থাকবে, কী ক'রে থাকবে সে ব'সে সব হাল ছেড়ে দিয়ে?

'ভাবতে কি চাই? কিন্তু···ভাবনাটা যে আসে। আর, তখুনি তখুনি সব যেন গোলমাল হ'য়ে যায়, আমার ভেতরটা কেমন করতে থাকে, চোখ ঝাপসা হ'য়ে যায়···'

'ঐ দেখুন, আপনি আবার ভাবছেন···' ব'লে খপ ক'রে নীলুর হাতটা চেপে ধরে জোদ্দা, মনে পড়ে। সেই প্রথম তাকে স্পর্শ করে, তার নিজেরি অজান্তে, অতর্কিতে, যেন স্পর্শ না ক'রে উপায় ছিল না। মেয়েটাকে সে রক্ষা করতে চায়, বাঁচাতে চায়। কোনো মেয়ের জন্যে এইভাবে ভাবতে

পারার বা এই রকম অনুভব করতে পারার ক্ষমতা, এ-অভিজ্ঞতাও জোদ্দার জীবনে এই প্রথম।

কিন্তু মনে পড়ে, সেই খপ ক'রে হঠাৎ হাত ধরার ফলটা হয় প্রচণ্ড। নীলু 'আঁ' ক'রে ছোট্ট একটু শিহরিত আর্তনাদ তোলে, কিন্তু হাত সরিয়ে নেয় না জোদ্দার হাতের তলা থেকে। এবং এমন বিহ্বল ভাবে জোদ্দার দিকে তাকায় যে জোদ্দাও ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই তাড়াতাড়ি নীলুর হাতটা ছেড়ে দেয়।

তারপর বুকটা তোলপাড় করতে থাকে। এবং, মনে আছে, হঠাৎ নীলু তাকায় তার দিকে···সে এক আশ্চর্য আনন্দিত চাওয়া, যেন অনেক তৃষ্ণার, অনেক অপেক্ষার পর সদ্য স্নানের প্রাচুর্যে মুখরা পৃথিবা তাকাল তার বৃষ্টি শেষের রৌদ্র ঝলকিত দৃষ্টি নিয়ে। এবং ঐটুকু দুরু দুরু বুকে জোদ্দার, তার ভয়ে ও সংশয়ে, মনে হল যেন সে অকুল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ এখুনি অদূরেই এক ঘনশ্যাম দ্বীপের দেখা পেয়েছে।

এখন এই রাখালের ঘরে ব'সে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ছে, মানুষের মনটা বোধহয় কোনকালেই বুড়ো হয় না, চিরকালই ছেলেমানুষ থাকে, অন্ততত জোদ্দার মন তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এতটুকুও বুড়োয়নি। নইলে ছেলে বয়সে সুরতি লাহিড়ীকে যা করতে গিয়েছিল সে, সেই গঙ্গা তীরের প্রথম সন্ধায়, আর বহু বছর পরে এই প্রায় বুড়ো বয়সে তাই কী করে করতে গেল নীলুকে নিয়ে?

মনে আছে, আবার সে নীলুর হাতটা চেপে ধরতে গেল, শুধু দেখতে চেয়ে এবারও নীলু আঁ ক'রে ওঠে কিনা, বা এবারও সে তার নিজের হাত না সরিয়ে চুপ করে থাকে কিনা। ছুঁলো হাত, যেন এক কৃষ্ণ পদ্ম, মৃণালবাহুর ডগায়। আর সেই রকমই কোমল, থরো থরো যেন অজস্র স্বপ্নের রাত্রির কথা ভরা নিস্তব্ধতার আবেগে। প্রথমবার যখন খপ্ ক'রে হঠাৎ হাতটা ধরে, তখন সেই হাত সম্বন্ধে

এত বোঝার বা ভাবার বা কল্পনা করার প্রশ্ন ছিল না, কারণ সে জানতে পারে নি, আগে থেকে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে নি এমন কোনো চিন্তায় যে সে এক প্রিয়া নারীর হাত ধরতে উদ্যত হচ্ছে এই প্রথম। কিন্তু দ্বিতীয়বার, অর্থাৎ এইবার, জোদ্দা যা করল, তা তো জেনে শুনে, ইচ্ছে ক'রে, তাই এত কল্পনা।

এবারও হাত সরিয়ে নিল না নীলু। ওর হাতটাকে যেন কেমন ভিজে ভিজে ঠেকল। ঘামটা কার হাতের, জোদ্দার না নীলুর, না দুজনের?

হাতটার ওপর আস্তে একটু চাপ দিল জোদ্দা, তার সাহস বাড়ছে, যদিও এখন বোঁ ক'রে একবার নীলুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখার সাহস তার নেই। কে জানে সে কী ভাবছে, ভাবুকগে। হাতটা ধ'রে একটু টান দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এল নীলুকে। তখনো নীলু একটি কথা বলে না, আড়চোখে তাকিয়ে দেখে জোদ্দা, নীলু মুখ ফিরিয়ে রয়েছে অন্যদিকে। তারপর হঠাৎ, সেই একই পাগলামী······না, জোদ্দা বুড়ো হয় নি, অন্ততঃ তার মনটা বুড়ো হয় নি, সে ঠিক সমানই ছেলে মানুষ আছে।

হঠাৎ মনে হ'ল, নীলু বোধ হয় কাঁদছে, নইলে জোদ্দার গাল বেয়ে ঠোঁটের কাছে নোনতা জলের স্বাদ সে পাচ্ছে কী ক'রে? চোখ তুলে চেয়ে দেখে, সত্যিই, নীলু কাঁদছে।

ছেলেমানুষের মত, একটা পুঁচকে অসহায়, ছেলের মত জোদ্দা তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে, বিহ্বল হ'য়ে। তা' দেখে হয়তো মায়া হ'ল নীলুর, বলল ঃ

'এসব কেন করতে গেলেন?'

চোখে তার সমানই জল, দুকুল ছাপানো। জোদ্দা ভেবে পায় না, কী উত্তর দেবে।

এই কলকাতা সহরের দুপুরে, এই রাখালের ঘরে বসে এসব কথা ভাবতে বড় লজ্জা করে। সত্যিই, বুড়ো বয়সেও কী ছেলে-

মানুষিতেই না পায় মানুষকে মাঝে মাঝে। আর এই সামান্য ক্ষণের নিবিড়তার, অন্তরঙ্গতার কোণটুকুর কথা সর্বক্ষণ মনে করাই বা কেন? কী লাভ স্মৃতির রোমন্থনে? বিয়ে করতে হবে না? কত কাজ রয়েছে···বেলা যে যায়।

কিন্তু ওদের কেউ তো এখনো এল না। রাখালটাও সেই গেছে, ফেরার নামও করে না। নীলুকে অনেকটা কম ক্লান্ত মনে হচ্ছে যেন। ভালো। আহা বেচারা। ওকে রক্ষা করতেই হবে, ওকে বাঁচাতেই হবে। ওকেই কি কম আশা দেখিয়েছে জোদ্দা, ওকেই কি সে কম নাচিয়ে তুলেছে? কী দরকার ছিল তাকে এইভাবে জোর ক'রে জাগানোর, তার সকল বাসনাহীন প্রতীক্ষাহীন নিস্তরঙ্গ জীবন হ'তে? তার এই চৌত্রিশ বছর বয়সে তার?

নাঃ, কাজটা হয়তো ভাল হয় নি। কিন্তু উপায়ই বা ছিল কী জোদ্দার? এবং সে যা করেছে, তা ভাল ভেবেই করেছে। এখন নীলুকে বাঁচাতেই হবে, নীলুর কাছে নিজের মুখটা রাখতেই হবে। এবং নীলুকেই বা কেন, তার নিজেকেও তো বাঁচানো দরকার, তার সেই নিজের জীবনটাকেও তো রক্ষা করতে চেয়েছিল জোদ্দা। এই বিয়েটা এমন একটা ব্যাপার যাতে দুজনেই বাঁচবে, এবং সেটার সম্ভাবনা যখন একবার জেগেছে মনে, তখন তা দুজনকেই আকুল ক'রে তুলেছে, যেন তাদের দুজনেরই মিলেছে এতদিনে তাদের সকল সমস্যার সমাধানের শেষ চাবিটি হঠাৎ।

'আজ বাজার করতে গিয়ে একটা নতুন মুখ দেখে এলাম!' ফোটন বলছে, গজাননের রেষ্টুরেন্টটে ব'সে।

কী করবে জোদ্দা, স্মৃতির রোমন্থন ক'রে লাভ নেই জানে, সে-সময় এটা নয়, এখন অন্য কর্তব্য আছে সব জানে, তবু খালি কথা ভেসে আসছে, চোখে ছবি জেগে উঠছে।

'নতুন মুখ সিউড়িতলায়?' মন্টুবাবু একটু খাড়া হ'য়ে ব'সে

বললেন। 'ও, বুঝেছি, কার কথা বলছ। তর্কালঙ্কার ঠাকুরের নাতি তো, যে কাশী থেকে এসেছে ?'

'তারে দূর মশাই, আমার আর খেয়ে দেখে কাজ নেই এই রবিবারের হাটে তর্কালঙ্কারের নাতিকে খুঁজে বার করি ব'সে। আর সেই গল্প ক'রে আপনার ছুটির বিকেলটা মাটি করি।'

'তবে কে ?' বেশ একটু নিস্পৃহভাবেই বললেন মণ্টুবাবু।

'সরোজিনী মৃণালিনী কাদম্বিনী নিতম্বিনী···,' সুর ক'রে হাত নেড়ে নেড়ে হঠাৎ আবোল তাবোল গান ধরল ফোটন।

'সে কি বাবা, এ কি ব্যাকরণ কৌমুদির পাঠ দিচ্ছ নাকি ?'

'মিস দাস ফিসফাস হাঁসফাঁস বারুদ পটাশ······,' গেয়েই চলল ফোটন।

'আরে রাখো তোমার ছ্যাবলামো। কে ?'

'সরোজিনী হাই স্কুলের কোনো সাম্প্রতিক খবর রাখেন ?' গান থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল ফোটন। বেচারার অবশ্য গলা গম্ভীর নয় কী করবে ? তবু যতটুকু পারে, গলাটাকে একটু অনাবশ্যক মোটা করার চেষ্টা করল।

'সরোজিনী হাইস্কুল ?' মণ্টুবাবুর চোখে মুখে হঠাৎ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সরোজিনী হাইস্কুল, সিউড়িতলার সরোজিনী গার্লস হাইস্কুল, যার প্রধান শিক্ষয়িত্রী হচ্ছেন শ্রীমতি তরুবালা সেন, যার ভূঁড়ির ও বুকের পরিধি······'

বেশ একটা নাটকীয় ভঙ্গীতে ব'লে যাচ্ছিল ফোটন, কিন্তু মণ্টুবাবু তাকে থামিয়ে দিলেন ঃ

'সে কি হে, বালখিল্য পাকামোতে তোমায় পেল নাকি ? বলি, সে-বয়সটা কি আর আছে ?'

আসলে মণ্টুবাবু ভেতরে ভেতরে বেশ একটু চ'টে গিয়েছেন। এ-সব রসালো চুটকি-চাটকি খবরে-গল্পে তাঁর ওপর টেক্কা দেয়

কেউ, সেটা তিনি পছন্দ করেন না। এবং এবার দেখে শুনে মনে হচ্ছে ফোটন তাঁর ওপর টেক্কা দিয়েছে, সে এমন একটা খবর জানে যেটা তিনি জানেন না। তাই এক চাপা রাগ ফোটনের ওপর হঠাৎ।

ফোটনও টিপ্পনীটা শুনে যেন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে মনে হ'ল। চুপ ক'রে রইল। আর জোদ্দা তো প্রথম হতেই চুপ ক'রে ব'সে আছে এক কোণে, এসে এস্তোক রা-টি কাড়ে নি। ফোটন আর মণ্টুবাবুর কথাবার্তা শুনছে, তার স্বাভাবিক ও আন্তরিক নিস্পৃহতার সঙ্গেই।

'হ্যাঁ, এবার চট ক'রে ছাড়ো তো খবরটা দেখি, মণ্টুবাবু বললেন।

'আগে কী খাওয়াবেন বলুন।' মণ্টুবাবুর আগ্রহ দেখে ফোটনও আবার শক্ত হ'য়ে ওঠার ভান করল।

'ম'লো যা। এই সামান্য খবরটার জন্যে তোমায় খাওয়াতে হবে?'

'এতই যদি সামান্য তো না হয় না-ই শুনলেন।'

কম ওস্তাদ কি এই ফোটন, জোদ্দার মনে হ'ল। ভেবে হাসি পেল জোদ্দার, কী তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে এরা এত লাফায় ঝাঁপায়, এত আগ্রহ দেখায়, আনন্দ পায়।

'আচ্ছা বেশ, আজকের চা'টা না হয় তোমরা দুজন আমার মাথায় হাত বুলিয়েই খাও—হবে তো, এবার খুশী তো?' মণ্টুবাবু যে একটা আপোষ চান, যথাশীঘ্র খবরটা না পেলে যে তাঁর আর চলছে না, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'বা-বা, আমার দৌলতে দেখছি জোদ্দাদাও এক কাপ চা মারলেন বিনা পয়সায়, সেটা কেমন হ'ল?'

ফোটন বয়সে হয়তো বছর খানেক-দেড়েকে ছোট জোদ্দা থেকে, অন্তত সেই রকমই তো বলে সে, যদিও দেখে বলা শক্ত কে বড় কে ছোট। কিন্তু ছেলেটার কেমন এক অদ্ভুত সখ জগৎসুদ্ধ লোককে দাদা-দাদা বলার। জোদ্দাকেও তাই দাদা বলে।

'মানে ?' ফোটনের প্রশ্নের উত্তরে মণ্টুবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'আরে, উনি তো আর খবরটা জানেন না।' ব'লেই কী মনে হ'ল, একবার জোদ্দার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাস করল ঃ

'কী দাদা, সরোজিনী ইস্কুলের খববটা শুনেছেন না কি ?'

'খবরটা কী, তা' না জানলে কেমন ক'রে বলব শুনেছে কি না-শুনেছি ?' জোদ্দা বলল।

'দেখলেন দাদা, মণ্টুবাবুকে বলছে ফোটন' 'এ-কর্তার কথাবার্তার ধরন। আমি এখন খবরটি ব'লে দিই ওঁকে, তারপর উনি জানাবেন সেটি আগে শুনেছেন কি না শুনেছেন। খাসা। মশাই, আগ্রহ তো আপনারও কিছু কম নয় দেখছি, কিন্তু হাবে-ভাবে সেটি জানতে দেন না, এই আর কি।'

বলা বাহুল্য, শেষের উক্তিটি জোদ্দাকে লক্ষ্য করেই। পাছে আবার কিছু ব'লে বসে ফোটন, জোদ্দা তাই সরাসরি জানাল ঃ

'না ভাই, আমি কিছু শুনিনি।'

এবং কথাটা সত্যি। সরোজিনী স্কুল সম্বন্ধে সে কিছুই শোনেনি, কারুর কাছে যায়ও নি সে-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে। একটা মেয়েদের ইস্কুল আছে জানে, এই পর্যন্ত। আগে শুধু প্রাইমারী ছিল, কয়েক বছর হ'ল পুরোপুরি হাই স্কুল হ'য়ে গেছে। এক কালে ইচ্ছে ছিল মালতীকে ভর্তি করানোর, কিন্তু তা হ'য়ে ওঠেনি পয়সায় কুলিয়ে ওঠেনি ব'লেই। কিছু সামান্য শিক্ষা অবশ্য সে মালতীকে দিতে পেরেছিল, নিজে নিজেই বাড়িতে পড়িয়ে। যাতে মেয়েটা একটু লিখতে পারে, পড়তে পারে। কিন্তু না, ইস্কুল সম্বন্ধে সে কিছুই জানে নি।

আর ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, ঠিক ঐ কারণেই ফোটনকে সে কোনোদিনই খুব একটা পছন্দ করে নি, ছেলেটার ঐ ইচ্ছে ক'রে ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলার জন্যে। অবশ্য অন্য নানান দিক দিয়ে মোটামুটি ছেলেটা···আর ছেলেটা করাই বা কেন, সে-বয়স কি

ওর আছে, না জোদ্দার নিজেরি আছে? বললেই হয় লোকটা এবং আর কয়েক বছরের মধ্যেই, বুড়োটা? কিন্তু ভাবতে যেন ভালো লাগে না। কারণ নিজেকে কেউ বুড়ো চায় না—জোদ্দা তো চায়ই না। আর তা ছাড়া সে কি বুড়ো নাকি, কে তাকে বুড়ো বলবে? এখনো তার বিয়ে করার বয়স আছে। হ্যাঁ, এখনো আছে—তবে সে-বয়স আর বেশিদিন থাকবে না। তাই তাড়া। বিয়েটা ক'রে ফেলতেই হবে, এখুনি ক'রে ফেলতে হবে, এখুনি ক'রে ফেলতে হবে, নইলে···

ওরা এখনো এল না কেন? রাখালও ফিরছে না। নীলু সেই সমানেই চুপ ক'রে বসে, সমানই স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার, এবং আগে থেকে অনেকটা কম ক্লান্ত। থাক, চুপ ক'রেই ব'সে থাক—একটু শান্তিতে ফ্যানের তলায়, ছায়ায় ব'সে আছে। থাকুক। কেবল, যেন আবোল তাবোল না ভাবে, যেন সেই বাউষখালির কথাটা আবার হঠাৎ ভাবতে না বসে নীলু, শুধু এইটুকুই চায় জোদ্দা।

আর সে নিজেই যেন কী ভাবছিল, ফোটিন, গজানন, নীলুদের ইস্কুল—সব যেন গুলিয়ে গেল। ভাবতে মন্দ লাগে না, বিশেষত সে ভাবনা যদি সুখের হয়, সে-দিবাস্বপন যদি দুঃস্বপন না হয়। কিন্তু স্বপন দেখার কি সময় এটা, অতীতের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করার মত কি কোনো যোগ্য অবসর এটি? কে জানে, হয়তো কপালে শেষ পর্যন্ত যা আছে, তাতে ঐ মধুর স্মৃতিকে একদিন তিক্ত ব'লে মনে হবে, ঠিক যেমন করে ঐ সুরভির···যাকগে, হয় হবে। কিন্তু আপাতত সেই মধুর স্মৃতির কথা ভাবতে দোষ কী, সেই মধুরকে আবার মনে মনে গ'ড়ে তোলায় পাপটা কোথায়? এখনো তো কিছুই হয় নি, না কিছু ভালো, না কিছু মন্দ। এখনো তো সকলই হওয়ার আছে। আর যা হওয়ার আছে, তাই যে মন্দ হ'তেই হবে, সেটারই বা তেমন নিশ্চয়তা কিছু আছে কি? বলা যায় না, ভালোটাও তো হতে পারে, তখন কি সেই অতীতের

মধুর স্মৃতিটা কোনো এক ভবিষ্যতে মধুরতর ঠেকবে না? সুতরাং ?

তা ছাড়া, এখন, ঠিক এই মুহূর্তটিতে, আর কী করার আছে তার ? কথা বলতে পারে নীলুর সঙ্গে, সত্যি তা, কিন্তু সে কথার ধরন ধারণও ঐ একই রকমের হবে, যে-একই কথা সে মনে মনে বলছে নিজের সঙ্গে, যা সে ভাবছে ও ভেবে আনন্দ পাচ্ছে, এবং যে-ভাবনা ও যে-কথা তার নীলুকে নিয়েই, তাকে বাদ দিয়ে নয়। অতএব ? এবং আরো, নীলুর সঙ্গে প্রকাশ্য জোর ক'রে কথা বলতে গিয়ে কে জানে, হয়তো কথোপকথনে কোথাও কোনো ছিদ্র বেরিয়ে বেরিয়ে পড়বে, এবং সেই ছিদ্র দিয়ে দুশ্চিন্তার হাওয়া হু হু ক'রে ঢুকে মনের সমস্ত এক মুহূর্তে ওলট পালট ক'রে দেবে! চুপ চাপ নীলুও বেশ আছে, সেও হয়তো ভাবছে এই মুহূর্তে কোনো একটা সখের কথাই, অন্তত তার মুখের হাবেভাবে তো তাই হচ্ছে। সে-শান্তি নষ্ট ক'রে না জোদ্দার কোনো লাভ, না নীলুর লাভ। এবং সে-শান্তি নষ্ট যদি না করে জোদ্দা, নীলুর সঙ্গে এই একলা ঘরে কথা বলতে যদি সে আরম্ভ না করে, তবে এই দিব্য স্বপন দেখা ছাড়া তার উপায় নেই। আর কী করবে সে ? সাক্ষীর জন্যে এই ইনকাম ট্যাক্স আপিসে এসেছে সে, এসেছে তারা দুজন, সাক্ষী নিয়েই তাদের যেতে হবে। এদিকে মণ্টুবাবুরও পাত্তা নেই, সৌরেন সেনেরও পাত্তা নেই। রাখাল চক্রবর্তী ঘরে তাদের থাকতে ব'লে একটু বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। অতএব ?

হঠাৎ মনে হ'ল জোদ্দার, সৌরেন সেন কি সত্যিই বেরিয়েছে, এবং যদিই বা সে বেরিয়ে থেকে থাকে, এখনো কি সত্যিই ফিরে আসে নি ? তার ঘরে গিয়ে তো সত্যটা যাচাই ক'রে দেখে আসা হয় নি। কেবল যা ফোনে রাখাল কথা বলেছে, এবং রাখাল তার পর জোদ্দাকে যা বলেছে, তাই সে জানে। অবশ্য, রাখাল মিথ্যা কথা নিশ্চয়ই বলেনি, এবং কেনই বা বলবে ? তবে ওপরে সৌরেন

সেনের ঘর থেকে ফোনে যে কথা বলেছে রাখালের সঙ্গে, সে তো মিথ্যা কথা বলতে পারে, নিশ্চয়ই পারে। সে সত্যি বলল, না মিথ্যা বলল, তা তো রাখাল আর যাচাই ক'রে দেখতে যাবে না, আর সে-কথা সে ভালো ক'রেই জানে, এবং তাই সে রাখালকে হয়তো বেমালুম একটা মিথ্যা কথা ব'লে দিয়েছে। রাখাল ভালো মানুষ, সেও বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, রাখালকে মিছিমিছি ধাপ্পা দিতে যাবে কেন সে-লোকটা, তার স্বার্থটা কী? বলা যায় না, হয়তো রাখালের সঙ্গে একদিন তার বচসা হয়েছিল, একটা প্রকাণ্ড কথা-কাটাকাটি গালি-গালাজ হয়, আস্তিন গুঁটিয়ে এ ওর দিকে এগিয়ে আসে, এবং সেই দিনের পর থেকে একে অন্যকে দেখতে পারে না, তাদের মুখ দেখাদেখি নেই। হ'তে কি পারে না? সবই হ'তে পারে।

অথবা এমনও তো হ'তে পারে যে সৌরেন সেন হঠাৎ আটকা প'ড়ে গেছে এক ভীষণ দরকারী কাজে, এই আপিসের মধ্যেই হয়তো কোনো জরুরী ইন্টারভিউ-এ, আর সে তার সেক্রেটারীকে তাই ব'লে দিয়েছে যেন তাকে বিরক্ত না করা হয়, যেন ফোন এলেও ব'লে দেওয়া হয় যে সে বাইরে বেরিয়েছে। এটাও হ'তে পারে, খুবই হ'তে পারে। কথা দিয়ে জোদ্দাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসতে ব'লে, লোকটা হঠাৎ বাইরে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে, এটা কী ক'রে সম্ভব? কোথাও যেন একটা গোলমাল আছে এই ব্যাপারে।

তবে কি সে দৌড়ে একবার দেখে আসবে সৌরেন সেনের ঘরটা? আর সৌরেন সেন তো তাকে ঘরে আসতেই বলেছিল, রাখালের ঘর থেকে তো ফোন করতে বলেনি। তবু কেন সে ফোন করিয়েছে রাখালকে দিয়ে, কেন সে নিজের চোখে দেখে আসতে যায় নি সত্যিই সৌরেন সেন ঘরে আছে কি না। বিশেষ ক'রে এই আপিসে, যেখানে সত্যাসত্য ভেদ ব'লে কিছু নাকি নেই,

অন্তত আপিসের কর্মচারীরাই এমন কথা ব'লে থাকে। মণ্টুবাবু নিজেই কি বলেন নি কত অজস্রবার, এ-আপিসে সব শালা শুয়োরের বাচ্চা ?

অবশ্য মণ্টুবাবু নিজেই যদি এমন একটা কাণ্ড ক'রে থাকতে পারেন, এই কথা দিয়ে কথার খেলাপ করা, তবে সৌরেন সেন কেন পারবে না ? আর মণ্টুবাবুকে সে চেনে কত অন্তরঙ্গভাবে, কত দিন ধ'রে—সৌরেন সেনকে সে জীবনে মাত্র একবার দেখেছে।

সৌরেন সেনের ঘর পর্যন্ত তার ছোটা উচিত হবে কিনা হবে, তা ভেবে জোদ্দার মাথাটা হঠাৎ আবার বেশ গরম হ'য়ে উঠেছিল প্রায়, আবার পাগলের মত আবোলতাবোল ভাবনা ঢুকছিল তার মাথায়, কিন্তু সে নিমেষে নিজেকে সামলে নিল। সত্যিই তো, টেলিফোনে সৌরেন সেনের সেক্রেটারী বা অন্য কেউ মিথ্যা কথা বলছে, বা সৌরেন সেন নিজেই এইভাবে কাউকে দিয়ে মিথ্যা বলাচ্ছে, এমন আকাশ-পাতাল কল্পনা করার দরকারটা কী জোদ্দার ? মণ্টুবাবু যদি বেরিয়ে থাকতে পারেন, সৌরেন সেনও বেরোতে পারে—মোদ্দা কথাটা এই।

আর সৌরেন সেনের ঘরে যে সে যাবে ভাবছে, তা যদি তাকে করতে হয় তো নীলুকে তো তাকে একলা রেখে যেতে হয়। সেটা কি খুব উচিত হবে ? একলা একলা হয়তো সে দিশেহারা বোধ করবে। না, হয়তো খুব একটা দিশেহারা বোধ সে করবে না, করা তার উচিত নয়, কারণ এই তো খানিক আগেই গেটের বাইরে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। শুধু কি একলা ? ঐ কাঠফাটা রোদ্দুরে এবং ভারী ব্যাগটাও ঘাড়ে ক'রে। আর এখানে তো দিব্যি ব'সে আছে আয়াসে। না, তার খুব খারাপ লাগার কিছু নেই···আর জোদ্দা যদি যায়ই, তো যাবে আর আসবে।

কিন্তু রাখাল ? সে যদি ইতিমধ্যে ফিরে আসে ? তাকে সে বলবে কী, কী কৈফিয়ত দেবে সে ? অবশ্য, কোন কৈফিয়ত এত

দেবারই বা কি আছে, সে তো তার রাখালের ঘরে বন্দী হ'য়ে ব'সে নেই, সে কি ইচ্ছে করলে একবার ঐ বাইরের দালানটাতেও পায়চারি ক'রে আসতে পারে না? হ্যাঃ, কী আজগুবি কথা। অবশ্য রোদ্দুর, দালানে বেরোতে যাবেই বা কেন? এটা তো আর মামার বাড়ি নয়, সিউড়িতলার চাটুয্যেদের তালবাগানও নয়, এমন কি কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কও নয় যে মনের সাধে পায়চারী করে বেড়াবে। এটা একটা সরকারী আপিস, যেখানে তুমি, শ্রীমান জয়দ্রথ খাঁ, ওরফে জোদ্দা, কেউ নও, যেখানে তুমি একটা চাপরাসীও নও। একজন পরিচিত বন্ধু পেয়ে গেছ, সে তোমায় তার ঘরে দয়া ক'রে বসতে দিয়েছে·· ব্যস্, এই পর্যন্তই।

অবশ্য রাখাল যদি আসতেই চায়, তাকে অনেক কিছুই বলা যায়···এই যেমন, জোদ্দা বাথরুমে গিয়েছিল। বাথরুমে তো সে দরকার পড়লে নিশ্চয়ই যেতে পারে। কিন্তু রাখাল যদি জেনে ফেলে যদি সৌরেন সেনের সেক্রেটারা বা অন্য কেউ তাকে জানিয়ে দেয় যে জোদ্দা নিজে সত্যাসত্য যাচাই করতে গিয়েছিল ওপরে? তখন রাখালের কি রেগে যাওয়া উচিত হবে না, সে কি ভাববে না যে জোদ্দা তার কথা ঠিক সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি, সে তার সততায় সন্দেহ করেছে?

আর, একবার যদি তার নিজের সম্বন্ধে এই রকম একঃ অবাঞ্ছনীয় ধারনা সে রাখালের মনে জাগিয়ে দেয়, তখন ফল তো বিষময় হবেই। এই যে রাখাল এত সহানুভূতির ভাব দেখিয়ে এসেছে এখনো পর্যন্ত, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওদের সব রকমে সাহায্য করার, সাক্ষী যোগাড় ক'রে দেওয়ার, তখন সে আর কি কিছু করবে না করতে চাইবে? এবং যদি সে তখন তার কিছু করতে না চায় তো তাকে দোষ দেওয়ারও কোনো উপায় থাকবে না। দোষ তো জোদ্দাই ক'রে বসেছে আগে···এবং তা রাখাল নীলুর চোখের সামনেই প্রকাশ ক'রে দেবে। হয়তো সরাসরিই সে জোদ্দাকে ব'লে বসবে:

'ও, তুমি তাহ'লে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিলে, আমি ধাপ্পা দিয়েছি কি না। বেশ, যাও মরগে এখন, আমি তোমাদের জন্যে কিছু করতে পারব না।'

তখন তাদের হবে কী ? এবং নীলুই বা কী ভাববে ?

এবং, বলা যায় না, জোদ্দা যখন এইভাবে ওপরে গিয়েছে চুপিচুপি, রাখাল হয়তো সাক্ষী-টাক্ষী যোগাড় ক'রে ঘরে ফিরে এসেছে। ঘরে থাকলে জোদ্দা নীলুকে নিয়ে তার সাক্ষীদের নিয়ে তখনি তখনি বেরিয়ে পড়তে পারত। সেই স্বুবর্ণ সুযোগটা তো হারাবে। না বাবা, ওসব ওপর যাওয়া-টাওয়া চলবে না, ওসব যাচাই-ফাচাই করার মত কোনো অভিসন্ধি পরে বিপজ্জনক কাণ্ড ঘটাতে পারে। আর তা ছাড়া সৌরেন সেন নিশ্চয়ই ঘরে নেই, থাকলে রাখাল জানতে পারতই। এবং জোদ্দাকেও সঙ্গে সঙ্গে জানাত।

যাক গে, এ কী সব ভাবছে জোদ্দা। অন্য কিছু ভাবা যাক। হ্যাঁ তারপর কী হ'ল, সেই গজাননের রেষ্টুরেণ্টটে, যেদিন প্রথম শুনল নীলুর নাম। সত্যি, কী একখানি গেজেট ঐ ফোটনটা। হয়তো ফোটনটাকেও ওর বলা উচিত ছিল, বলা যায় না, ফোটন হয়তো সানন্দেই সাক্ষী দিতে আসত কলকাতায়। আর ছেলেটা তো একেবারেই খারাপ নয়, মনটা তো বিশেষ ক'রে খুবই ভালো। কেবল ঐ যা মাঝে মাঝে বেফাঁস দুয়েকটা কথা ব'লে ফেলে, একটু ক্যাটকেটে কতকগুলো কথা। আর জোদ্দাকে চিবিয়ে চিবিয়ে অনেক কিছু শুনিয়েছেও কয়েক বার! সেইজন্যেই ওকে আর বলেনি।

হ্যাঁ, ফোটন তখন বলল : 'মিস দাস।'

'তিনি আবার কিনি ? ছুঁড়ী না বুড়ী আগে বল।' মন্টুবাবু প্রশ্ন করলেন।

'এ্যাঃ, রাম রাম মন্টুদা···আপনি কানে টকটক গন্ধ ধরিয়ে দেন।'

'কেন, কী বললাম এমন ?'

'বুড়ি ? বুড়ি হ'লে এতক্ষণ ধ'রে এত পাঁয়তারা কষছি আপনাদের কাছে ?'

'অতএব ছুঁড়ি। পুরো নাম ?'

'নীলাঞ্জনা দাস।'

'আ-হা। সুন্দরী নিশ্চয়ই ? এমন নাম যখন।'

'অত জানি না, তবে দেখতে বেশ কালো। মনে হয়, আর যদি কোনো রকমে একটু সামান্য ফর্সা……'

'তা আজ সকালে দেখা, এরই মধ্যে পুরো নামটা জেনে ফেলেছ ?'

'নাম কি দাদা, নামের সঙ্গে তার ধাম-কাম-দক্ষিণ-বাম কত কী জেনে বসে আছি। আপনি ফোটনকে মনে করেন কী ?'

'সে কী হে !'

'আবার কী। আমার কি চর অনুচরের অভাব আছে নাকি ?'

'গুপ্তচর বল। তা' মেয়েটি কে ?'

'সরোজিনী ইস্কুলে মাস্টারনী হ'য়ে এসেছে।'

'কী মশাই, ইস্কুল-ফিস্কুলের ব্যাপার, আপনার তো জানা উচিত ? জোদ্দার দিকে তাকিয়ে বললেন মণ্টুদা।

'উচিত ? কেন ?' হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল জোদ্দা।

'বাঃ, উচিত হবে না ? আপনি মাস্টার আর সে মাস্টারনী, তার কথা আপনারই আগে জানা উচিত।'

'এ তো আপনার ছেলেমানুষি যুক্তি হচ্ছে মণ্টুবাবু।'

'যাক গে মশাই, আপনার তো দেখছি একটা সুরাহা এতদিনে হ'য়ে গেল। এবার মেয়েটাকে একদিন ঘরে পুরে দরজা বন্ধ ক'রে দিন।'

মনে আছে, জোদ্দার কান দুটো লাল হ'য়ে উঠেছিল শুনে। এবং এটাও মনে আছে, ফোটনটা কী রকম নির্লজ্জ ভাবে হেসে উঠেছিল।

'হ্যাঁ, আর কী শুনেছ?' মন্টুবাবুর প্রশ্ন।

'আজ নিয়ে, এই সাতদিন হ'ল এসেছে।'

'সাতদিন? আর আজ তুমি তাকে বার করলে খুঁজে? ছ্যাঃ, অপদার্থ।'

'আরে বাড়ি থেকে বেরোয় না যে। জানেন, কেউ জানে না আর ভয়ঙ্কর নাকি চুপচাপ থাকে, কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।'

'একটু সবুর সইতে দাও, ঠিক বলবে। সবে এসেছে, তাই। বাচালের জাত, কথা না ব'লে যাবে কোথায়।'

'না দাদা, বড় একটা কথা-টথা নাকি বলেই না মেয়েটা, স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে কেমন হয়ে গেছে।'

'স্বামী? তবে এই যে বললে মিস দাস?'

'ঐ একই হ'ল। মিসেস আর মিস-এর তফাতটা কী বলুন না? বাল্যবিধবা তো। আর প্রথমেই যদি মিসেস ব'লে দিতাম, তাহ'লে কি আপনারা এতটা আগ্রহ দেখাতেন? সরি, আপনারা না, আপনি। উনি নন। উনি তো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না।'

'তা হলে মিসেস, ছুঁড়ি, ও স্বামীহীন···এই তো দাঁড়াল? আর দেখতে ঐ যা কেবল একটু কালো বললে, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? লেগে যান মশাই।'

ঠিক কী যে তিনি বলছেন, তা বুঝতে না পেরে জোদ্দা মন্টুবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

'কী, এমন হাঁ ক'রে তাকাচ্ছেন যে? লেগে যান। আরে মশাই, যুবতী বিধবার মতন জিনিস আর নেই, তার অমন সোজা জায়গাও তার নেই। একেবারে হাতের কাছে গরম গরম ফুলকো লুচি, মুখে পুরে দিন। শালীকে একদিন একটু বেকায়দায় ফেলে বেশ আচ্ছা ক'রে···—যাক গে, আপনারা তো আবার লজ্জাবতী লতা, বলতে সঙ্কোচ হয়। কিন্তু এতে খারাপ কিছু নেই, সব মানুষেই

ক'রে থাকে, আর আপনিই বা কেন না ক'রে থাকবেন, হ্যাঁ?'

'না ক'রে যে আছেন, তা-ই বা কী ক'রে ধ'রে নিচ্ছেন?' ফোড়ন দিল ফোটন।

'হ্যাঁ, সেটাও অবশ্য একটা কথা। কিন্তু ধ'রে নেওয়া যাক, করেন নি, অন্ততঃ দেখে শুনে মনে হয় করেন নি। ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই, পরে যদি ভালো লাগে তো বিয়ে ক'রে ফেলবেন।'

'বাঃ, খাসা যুক্তি। সব যেন আমারই হাতে, কেবল ইচ্ছেটি করলেই হ'ল।' জোদ্দা না ব'লে পারে নি।

'তা নয়তো কী? আলবৎ আপনারই হাতে, নয়তো ঐ বিধবাটার হাতে না কি? বিধবা যুবতী কী জিনিস জানেন, না কখনো জেনেছেন? আপনি একবার তেমন তেমন ইচ্ছে ক'রেই দেখুন না, দেখবেন ইচ্ছে করতে না-করতেই মেয়ে সুড় সুড় ক'রে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? বাজী ল'ড়ে যাবেন?'

'আহা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই বা উঠবে কেন,' জোদ্দা আপত্তি তোলে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে। 'আপনারা মশাই কী-যে যা-তা ব'কে সময় নষ্ট করেন, কেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু আলোচনা করার জিনিস নেই না কি?'

'বলি, চটেন কেন—বসুন। আমার প্রস্তাবটা যদি মনে না ধরে তো না হয় না-ই করলেন কিছু, না-ই ছুটলেন সরোজিনীর ঐ নতুন নিতম্বিনীর পেছনে। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।'

খানিকটা মুখ গোমরা ক'রে বসে থাকে জোদ্দা। পরে মণ্টুবাবু আবার বলেন:

'আরে মশাই, আমাদের এত মাথাব্যথা কেন। আপনি এ রকম একলা-একলা থাকেন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, সেটা ভেবে মাঝে-মাঝে আমরা একটু দুঃখ পাই,

এই আর কি। এক সকালে ঘুম ভেঙে হয়তো হঠাৎ আবিষ্কার করবেন, বয়সটা এত হ'য়ে গেছে যে জীবনটা গোছানোর আর কোন উপায় নেই। তখন? হয়তো তখন বলা যায় না, বাকী জীবনটা হা হুতোশেই কাটবে। তাই সময় থাকতে একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছিলাম, এই আর কি। কই হে গজানন, আর এক কাপ ক'রে লাগাও বাবা।'

অবশ্য ঐ কতকগুলো বাজে ঠাটা আর অশ্লীল ইঙ্গিত বাদ দিলে, মণ্টুবাবুর কথায় কিছু সায় নিশ্চয়ই আছে, এবং তা জোদ্দার বুঝতেও কষ্ট হলো না। এবং ভদ্রলোক কথাগুলো বললেন এমন এমন একটা আন্তরিক দরদের সঙ্গে যে জোদ্দার বুকের ভেতরটা হঠাৎ হু হু ক'রে উঠল। মনে হ'ল, সত্যিই তো, যদি একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে··· যাক গে। করার আছে কী? ঐ নিতম্বিনীর পেছন-পেছন দৌড়ানো? ধুর।

অবশ্য এ-কথা মনে হয়েছিল সেদিন, সেই গজাননের রেষ্টুরেণ্টে ব'সে আজ থেকে প্রায় মাস চারেক আগে। তবু মাত্র চার মাস। আর আজ? হাসি পায় নিজের অবস্থা দেখে। মণ্টুবাবুও প্রাণ খুলে হেসেছিলেন, যখন প্রথম শোনেন, যখন জোদ্দা বাধ্য হ'য়ে যায় তাঁকে সব খুলে বলতে। বলেছিলেন, 'সে কী মশাই, আমাকে যে ভয়ঙ্কর সম্মান করলেন আপনি দেখছি। একদিন ঠাট্টাচ্ছলে কী প্রস্তাব করেছিলাম, আর সেই প্রস্তাবটা আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে ছাড়লেন?'

মণ্টুবাবু বলেছিলেন ব'লেই যে কাণ্ডটা সে শেষ পর্যন্ত ক'রে ফেলল, তা নয়, নিশ্চয়ই নয়। পাকে-চক্রে ঘটনাটা কেমন যেন আপনা হতেই ঘ'টে গেল, এই আর কি। তবে মণ্টুবাবুরও কিছুটা দান নিশ্চয়ই আছে, কারণ তিনিই তো প্রথম জোদ্দার অবচেতন মনে নীলুর সম্বন্ধে চিন্তাটা ঢুকিয়ে দেন। এবং পরেও, ঐ গজাননের রেষ্টুরেণ্টে ব'সেই অজস্রবার, তাকে ও নীলুকে নিয়ে মণ্টুবাবু এত

হরেক রকমের ঠাট্টা ক্রমাগতই ক'রে গেছেন যে মেয়েটা সম্বন্ধে সচেতন না হ'য়ে জোদ্দার উপায়ই ছিল না। অনেকবার এই ঠাট্টা, বিদ্রূপের দৌড়টা এতদূর গেছে যে সে কখনো কখনো মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছে। কিছু পরে নিজেকে সামলেও নিয়েছে এই ভেবে যে, ছোট সহর, এখানে যেমন চিন্তার দৈন্য তেমনি বৈচিত্র্যের দৈন্য। এখানে এই ধরনের তুচ্ছ গল্প-গুজব ঠাট্টা-বিদ্রূপ অনিবার্য।

একদিন তো খানিকটা কৈফিয়তের সুরে মণ্টুবাবু সরাসরিই বলেন ঃ

'কী করি মশাই, ছাপোষা জীবন। কলকাতায় সারা দিন ঘুরতে হয় কলুর বলদের মত। মনের যত কথা, আনন্দ পাবার ইচ্ছা, ভাবনার তলায় প'ড়ে থাকে। ছুটির দিনে এখানে যখন আসি, এই সিউড়িতলার ফাঁকা আকাশের তলায়, তখন সেই সব চাপা-প'ড়ে-থাকা কথা হু হু ক'রে ওপরে উঠতে থাকে। সদ্য ছিপি-খোলা সোডার বোতল দেখেছেন তো? ঠিক সেই রকম। এদিকে হাতে সময় কম, সোমবার আবার কলকাতা, তাই তাড়াহুড়ো ক'রে খানিকটা আনন্দ পেয়ে নিতে হবে। আর সেইজন্যেই এই সস্তা ছ্যাবলামোগুলো করি। এতে পয়সা লাগে না, সময়ের দরকার হয় না। আর তেমন একটা মাথা খাটানো বুদ্ধিরও দরকার পড়ে না। অথচ মুখটা বেশ বদলে যায়। বুঝলেন তো এখন?'

গজাননের রেষ্টুরেণ্টটা তাই মণ্টুবাবুর সেই এলো-মেলো চিন্তার একটু আকাশ। এবং মুখ বদলানোর জায়গা। না, দোষ দেয় না সে মণ্টুবাবুকে। এবং নীলুর সঙ্গে তার মিলনের খানিকটা কারণও মণ্টুবাবু, একভাবে সে-কথাটাও সত্যি, ও তাই সে-কথাটা সে এক ধরনের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতেও প্রস্তুত। সামনে নীলুকে যতবার দেখা গিয়েছে, মণ্টুবাবু ততবারই কি ব'লে ওঠেন

নি ঃ 'ঐ দেখুন দেখুন, আপনার নিতম্বিনী চলেছে।' অবশ্য তখনো আলাপ হয় নি নীলুর সঙ্গে, এবং আলাপ যে একদিন হবে, বিশেষ ক'রে এই ধরনের এক আলাপ, তাও সে জানত না তখন। অনেক কাল আগেকার কথা যেন এ-সব, আজ ভাবতে গিয়ে মনে হয়। মনে হয়, নীলুকে সে যেন জানে যুগযুগান্তর ধ'রে।

আর সেই বালবিধবার ব্যাপারটা, সে-সম্বন্ধেও মনে পড়ে। সেই একই দিন, সেই ঝম ঝম বর্ষার বিকালটায়, যেদিন প্রথম তাকে নিবিড় ক'রে পেল জোদ্দা এবং অচিরেই সেই আপনি হ'তে প্রথম-প্রথমের হোঁচট খাওয়া তুমি সম্বোধনে নেমে এল তারা, জোদ্দা প্রশ্ন করে অস্ফুট গলায় ঃ

'তবে বিয়ে করলে কবে ? তুমি না বাল্যবিধবা ?'

নীলু শুধু মুখ তুলে অল্প একটু হেসেছিল।

'হাসলে যে ?'

'ওটা বাজে কথা।'

'বাজে কথা, না বলতে চাও না ?'

'এতই যদি বললাম তো শুধু এটুকু বলতে আমার বাঁধবে ? লজ্জার আমার আর আছে কী ? কিন্তু···এ-সব কথা কাউকেই আগে বলিনি, বিশ্বাস কর।'

'কিন্তু কেন তবে ওরা তোমাকে বাল্যবিধবা বলে ? তুমি নিজেই তো পরিচয় দাও মিসেস দাস ব'লে, নয় কি ?'

'ওটা বাজে কথা। ও-পরিচয় দেওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না।'

'কেন ?'

'সেটাও খুলে বলতে হবে ? নইলে কে আমাকে চাকরি দিত এখানে ? আমি চাকরির জন্যে যে-আবেদন করি এখানে, সে-আবেদনই গ্রাহ্য হ'ত না।'

'আর নিজেকে বালবিধবা বলেছিলে ব'লেই সেটা গ্রাহ্য হ'ল এত সহজে?'

'একদিক থেকে নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কেন, আমি তো কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।'

'এতে এত ভেবে পাওয়ার কী আছে? আমার চৌত্রিশ বছর বয়স হ'ল, বুঝলে?'

'তাতে আর কী, আমিও তো প্রায় চল্লিশে পা দিলাম।'

'তোমার কথা আলাদা, তুমি পুরুষ মানুষ। কিন্তু আমি মেয়ে। এত বছরের আইবুড়ো মেয়েকে আমাদের সমাজ কি খুব সহজে স্বীকার ক'রে নেয়? তা কি তুমি জানো না?'

একটু ভাবতে গিয়ে মনে হল জোদ্দার, কথাটা সত্যি। নীলু আবার বলল:

'ধর আমার আবেদনে যদি লিখতাম, আমি একজন চৌত্রিশ বছরের অবিবাহিতা, এখানে একটা মাস্টারনির চাকরি খালি যাচ্ছে শুনলাম, সেই পদের প্রার্থী আমি। তাহ'লে এরা আমায় চাকরিটা দিত? অবশ্য আবেদন করার সময় বয়সটা চৌত্রিশের কিছু কম ছিল, কিন্তু কয়েক মাসের এদিক-ওদিকে কী আসে যায়?'

জোদ্দা আবার চুপ, কী বলবে ভেবে পায় না।

'আর বললামই তো,' নীলু ব'লেই চলেছে, আজ ওর মুখটা যেন খুলে গেছে, 'চাকরী না পেয়েও আমার চলছিল না। তবুও কলকাতা হ'লে না হয় বুঝতাম। কিন্তু এই ছোট সহর, এখানকার এই ছোট সমাজ, এখানে আমার মতন একজন এখনো অবিবাহিত মেয়েকে কে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে? সকলেই বলত, নিশ্চয়ই আমি অসচ্চরিত্রা, অথবা আমার অন্য কোনো পাপ আছে। তাই নিজেকে মিসেস করতে হ'ল, বাধ্য হ'য়েই।'

একদিক দিয়ে জোদ্দা কিন্তু খুব আনন্দিত হয় কথাটা শুনে। মনে হ'ল, ভালোই তো, আরো ভালো, এখনো অবিবাহিত।

কিন্তু কিসে ভালো? বিয়ে না হ'য়েও তো এদিকে···হঠাৎ জোদ্দার বুকটায় যেন প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু ওর দোষ কী? অনির্দেশ্য কিছুর প্রতি একটা নপুংসক আক্রোশে জোদ্দাকে যেন চেপে ধরল। পারলে কিছুকে সে গুঁড়িয়ে পিষে মেরে ফেলত। অথচ তা পারার নয়, তাও জানে জোদ্দা। সে তো সর্বশক্তিমান নয়, সে একটা সামান্য লোক মাত্র।

জোদ্দার মনের কথাটা যেন ধরতে পারল নীলু। বলল ঃ

'কিন্তু আমার কী দোষ বল? আমি তো কোনো পাপ করিনি।'

'না-না-না মিস দাস, নীলাঞ্জনা, নীলু আমার, তুমি কোনো পাপ করনি। কোনো পাপ তোমাকে স্পর্শ কোনোদিন করবে না। পাঁক কি পদ্মকে স্পর্শ করে?'

অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলেছিল জোদ্দা। হৃদয়ের খিড়কিটা যেন খুলে গেছে আজ, বহু যুগে বাদে, খুলে গেছে এক প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায়, এই রিমঝিম ঘন বর্ষার আকাশে। তার এই আসন্ন চল্লিশেও যে এমন একটা হৃদয় লুকিয়ে ব'সে থাকতে পারে, তা যেন সে ভাবতেই পারে নি।

'আমার যে কিছু চাইতেও ভয় করে।' কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল নীলু।

'তুমি তো চাও নি, আমিই চেয়েছি। তবে ভয়টা কেন?'

'তবু। ভেতরে ভেতরে আমিও তো চাই, অত্যন্ত ভীষণ ক'রে চাই। আর যেই চাইতে যাই, বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। মনে প'ড়ে যায় অনেক কথা, চোখের সামনে জেগে ওঠে কত সব সাংঘাতিক ছবি······বাউষখালি ···–' আর বলতে পারে না নীলু, দুহাতে চোখ ঢাকে।

'ওসব কথা তুমি আর ভাববে না নীলু, আমাকে কথা দাও আর তুমি ভাববে না,' তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে জোদ্দা। 'এখন থেকে আমি আছি, মনে রেখো। এই তো আমি আছি। তোমার ঐ

অতীতটা আমাকে দিয়ে দাও, ভুলে যাও। এ-জগৎটা নীলু, এ-জীবনটা একটা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ব্যাপার·· দেখছ না, তা এগিয়ে চলেছে, ক্রমাগতই চলেছে, সে-গতি রোধ করবার সাধ্য তো তোমার নেই নীলু। আমারও নেই, কারুরই নেই। আর সেইটেই তো ভালো, নয় কি? বাউখালি কত দূরে হারিয়ে গেছে, কত পিছনে প'ড়ে তা, আজ তুমি সিউড়িতলায়, নয় কি? নীলু আমার নীলাঞ্জনা, সামনের দিকে তাকাও, আমাদের দুজনার সেই সামনের দিকে। হ্যাঁ নীলু?'

নীলু সমানই কাঁদতে থাকে, বলে:

'তুমি সত্যিই কী মহাপুরুষ। জানো, আমার প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে তুমি······'

'আবার ভয়।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তাই তো এতদিন চাই নি কিছুই। আমাকে যে কেউ গ্রহণ করতে রাজী হবে, তেমন কল্পনা করার স্পর্দ্ধা পর্যন্ত হয়নি কখনো। আর আজ·····'

'হ্যাঁ আজ। আমি চাইলাম। তোমাকে যে আমার দরকার নীলু, তোমাকে না হ'লে যে আমার চলছিল না। আর তাই তো ভগবান আমাদের মেলালেন, এই দুটি দুঃখী জীবকে। সর্বহারা, সকল আত্মীয়স্বজনহীন—যেমন আমি, ঠিক তেমনি তুমি। তবে তোমার দুঃখটা হয়তো আমার থেকে আরো অনেক বড়। দাও না সেই দুঃখের খানিকটা আমায়, দেবে না নীলু? বেশ এক সঙ্গে বহন করব?'

'দেব।'

ঝম ঝম বর্ষা তখনো। হয়তো সন্ধ্যা নামে নামে। কে বলবে? আকাশ দেখে তো কিছু বোঝবার যো নেই।

সত্যি, কত সাধারণভাবে তাদের আলাপের সুত্রপাত হয় একদিন। এবং সেই আলাপ কী সহজে, যেন আপনা থেকে,

কোনো বিশেষ চেষ্টা না ক'রে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রমশঃ গভীরতর হয়। জোদ্দা চিরকালই চাপা স্বভাবের, গায়ে প'ড়ে কারুর সঙ্গে আলাপ করতে সে যায় না কখনো। আর মেয়েদের সম্বন্ধে তো তার একটা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছেই, বিশেষ ক'রে সুরভির ঘটনাটা ঘ'টে যাওয়ার পর থেকে মেয়েদের সে এড়িয়েই চলতে চেয়েছে জীবনে। অবশ্য এড়িয়ে চলার প্রশ্নটা খুব একটা ওঠেনি, কারণ কোনো মেয়ের সঙ্গে তেমন একটা আলাপের অবকাশ কখনো আসেনি।

আবার নীলুরও স্বভাবও অনেকটা জোদ্দারই মতন। সেও একেবারেই মিশুকে নয়, বিশেষ ক'রে কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা চালানোর মত মেয়ে সে একেবারেই নয়। তবু তবু তাদের ভাব হ'ল, ভালোবাসা হ'ল, আশ্চর্য নয় কি? মনে পড়ে, সুরভি লাহিড়ীর বেলায় ঐ বহরের ননীটার দরকার পড়েছিল, গগন কবিরাজের সাহায্য অপরিহার্য হয়েছিল। কিন্তু নীলুর ক্ষেত্রে? কিছুরই দরকার পড়ল না। দুটি দুঃখী জীব, নিসঙ্গতার গ্লানি ও ক্লান্তীতে দুটি মরিয়া জীব, একে অন্যের মুখে নিজেরি প্রতিচ্ছবি দেখল। দুঃখ টানল দুঃখকে। একেই বলে নিয়তি।

মনে পড়ে, প্রথম থেকেই নীলুর সঙ্গে দেখা যখনই হয়েছে, জোদ্দা সব সময়ই কী রকম একটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট বোধ করেছে। কেবলি মনে পড়েছে, মেয়েটাকে নিয়ে মন্টুবাবুর ঠাট্টা-টিটকিরির কথা। নীলুকে তাই অন্য যে-কোনো মেয়ের মত ক'রে দেখতে সে কোনো কালেই পারে নি।

প্রথম আলাপ হয় সরোজিনী ইস্কুলের সেই পুরস্কার-বিতরণীতে, মনে পড়ে। অবশ্য আর তাদেরও নীলুকে সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে বহুবার। ছোট সহর তো, একজনের আরেকজনকে না দেখে উপায় কী?

কিন্তু মনে রাখবার মত প্রথম কথা হয় বাজারে একদিন।

স্পষ্ট মনে পড়ছে। পড়বি তো পড়, দুজনে একই আলুর দোকানে, একই সঙ্গে। এমন একটা অবস্থা যে কথা না ব'লে উপায় নেই।

'ভালো আছেন ?' বাধ্য হ'য়েই বলতে হয় জোদ্দাকে।

এবং যেন অনেকটা বাধ্য হ'য়ে নীলুও উত্তর দেয়ঃ

'এবং চ'লে যাচ্ছে আর কি।'

ব্যস, ঐটুকুই। আর কিছু হয় নি সেদিন। জোদ্দা পালিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

পরের বার যখন আবার বাজারে দেখা হয় একদিন, ঠিক এই ভাবেই, নীলু হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসেঃ

'আপনি তো শুনেছি একলা মানুষ। কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেন ?'

'এই দেখছেন না তরী তরকারী কিনছি, গিয়ে রান্না করব ?'

'সে কি ? সারা জীবন এই করছেন ?'

'আর কী করি বলুন। খাওয়াটা বাদ দিয়ে যদি বাঁচা যেত তো মন্দ হত না।'

'একদিন আপনাকে রেঁধে খাওয়াব। আপত্তি নেই তো আমার হাতে খেতে ?'

'কিসের আপত্তি ? অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কষ্টটা তো আর ঘুচবে না। সারাজীবন তো আর আপনি রেঁধে খাওয়াতে আসবেন না আমাকে।'

ব'লেই যা ব'লে ফেলল, আর গুরুত্ব সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। ছি ছি, এ কী বলল সে, এ-কথা বলার কী দরকার ছিল ? নীলুও যে উত্তরটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। কোনো রকমে তাড়াহুড়ো ক'রে জোদ্দা সেদিন পালিয়ে বাঁচে।

ঐ নিয়ন্ত্রণটা আর রাখা হয় নি। কারণ প্রথমত, নীলু দিন-টিন ঠিক ক'রে কিছু জানায়নি। দ্বিতীয়ত, এই সিঁড়িতলার মত

জায়গায় নীলুর কাছে খেতে যাওয়া অত সোজা নাকি? খেতে গিয়ে তারপর পাড়ায় পাড়ায় নানান কথা র'টে যাক আর কি। আর নীলু আবার থাকেও ওদের ইস্কুলটারই সংলগ্ন একটা ঘরে, সে-এলাকাটায় কোনো পুরুষ মানুষকে সচরাচর ঢুকতে দেখা যায় না।

পরে পথে অনেকবারই দেখা হয়েছে। বিশেষ কথা কখনো হয় নি। জোদ্দার আড়ষ্ট ভাবটা তো ছিলই, বিশেষ ক'রে সেদিনকার ঐ বাজারের ঘটনার পর থেকে মেয়েটি সম্বন্ধে তার মনে একটা স্পষ্ট দুর্বলতা ঢুকে গেছে। বহুবার মনে হয়েছে, ছি ছি, এখনো মেয়েদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় তা সে শিখল না, কী বলতে কা ব'লে ফেলে। ও তো নীলুকে এড়িয়ে চ'লেই, কিন্তু কয়েকদিন থেকে মনে হচ্ছে যেন নীলুও হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলে একটু পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে চায়। একদিন এইভাবে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়ায় শুধু 'ভালো আছেন?' বলতে গিয়েছিল জোদ্দা, আর মনে পড়ে নীলুর মুখখানা তখন। কেমন যেন লজ্জায় রাঙা। অন্তত সেই রকমই তো মনে হয়েছিল জোদ্দার।

তবু প্রথম উল্লেখযোগ্য কাণ্ডটা তো তখনো ঘটেনি। ঘটল অল্প দিনের মধ্যেই। তখন নীলু বোধহয় মাত্র মাস দুয়েক হ'ল সিউড়িতলায় এসেছে।

সহরের প্রান্তে মন্টুবাবুদের বাগানটা। সেটা ছাড়িয়ে গেলে একটা মন্দির পড়ে, গঙ্গার ধারেই। লোকে বলে, বুড়ো শিবমন্দির। বুড়োই বটে। একটা পুরোনো, জীর্ণ মন্দির, যা খ'সে খ'সে পড়ছে, এখান থেকে ওখান থেকে ইট সুরকি বেরিয়ে আসছে, চূড়ার কাছে একটা ফাটল ধরেছে, আর সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে একটি অশত্থ গাছ ইতিমধ্যেই বেশ মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

অনেকে যায় পুজো-টুজো দিতে। জোদ্দা সেদিন বিকেলে বেড়াতে গেছে, যেমন প্রায় রোজই যায়। আর ওদিকটা বেশ

ফাঁকা ফাঁকা তো, লোকজন বড় একটা নেই। প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়।

মন্দির পর্যন্ত এসে ফেরার পথ ধরতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ দেখে ঘাটে কেউ একলা ব'সে রয়েছে, পিছন দিক থেকে ঠিক নীলুর মতনই যেন মনে হচ্ছে। অথচ সাহস নেই গিয়ে দেখে আসার, আবার সাহস নেই না-দেখে ফিরে চ'লে যাওয়ারও। অগত্যা জোদ্দাকে ঘাটের কয়েকটা সিঁড়ি নামতেই হয়। কাছে এসে দেখে, হ্যাঁ নীলুই, কোনো সন্দেহ নেই। জলের দিকে চেয়ে আছে, যেন ধ্যান-মগ্না।

এক ঝলকে চোখের সামনে ভেসে উঠল বহুকাল আগেকার একটা ছবি, এই গঙ্গার ধারেই এই রকম আরেকটি সন্ধ্যায়। শুধু মাঝখানে পেরিয়ে গেছে যেন আগের নিঃশব্দ গতিতে···কত বছর? ভালো ক'রে মনে পড়ে না। মনে করবার চেষ্টা ক'রেই বা লাভ কী? থুতনির কাছে দাড়ির যে-বেশ কয়েকটা পাকা চুল আজকের তা সাক্ষ্য দেবে সেই অতিক্রান্ত সময়ের। দাড়িটা আজ কামিয়েছে তো? হাত বুলিয়ে দেখে নিল একবার গালে-থুতনিতে। হ্যাঁ, কামিয়েছে।

এমনি ভাবে স্বপ্নাবিষ্টের মত জোদ্দা দাঁড়িয়েই ছিল···হয়তো মিনিট দুয়েক, হয়তো মিনিট পাঁচেক, মনে নেই। হঠাৎ অদূরে মন্দিরটায় আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নীলুও চমকে পিছন ফিরে তাকাল। এবং পিছন ফিরেই যে-মুহূর্তে জোদ্দাকে দেখা, সে যেন নিঃশব্দে আঁতকে উঠল। আশা করে নি নিশ্চয়ই যে ঘাটে অন্য কেউ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তারি পিছনে। জোদ্দাকে চিনতেও পারেনি নিশ্চয়ই।

'নমস্কার মিসেস দাস।'

অপ্রতিভের মত অস্ফুট কণ্ঠে বলল জোদ্দা। তার মনে হচ্ছিল, ছি ছি, এমন একটা ঘটনা ঘটার আগেই তার পালানো উচিত ছিল।

এখন কী ভাববেন ভদ্রমহিলা? কারুর এমন একান্ত নির্জন, নিবিষ্ট মুহূর্তে অন্য কারুর এইভাবে উঁকি মারা যেন এক ঘৃণিত অশ্লীল ব্যাপার। মনে হ'ল জোদ্দার, নীলু যেন উলঙ্গ হ'য়ে স্নান করছিল মনের খুশীতে, আর জোদ্দা ব ন্ধ দরজায় ফুটো দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে তার সেই নগ্ন দেহ নিরীক্ষণ করছিল, এখন ধরা প'ড়ে গেছে।

'ও, আপনি।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল নীলু।

'আমিও বেড়াতে বেড়াতে চ'লে এসেছিলাম।'

'আচ্ছা মানুষ তো, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন?'

'বেশিক্ষণ নয়। আপনার ধ্যান ভাঙতে সাহস হচ্ছিল না।'

একটা সুবিধে এই অল্প আলোর···ভালো ক'রে মুখ দেখা যায় না। তাই নীলু দেখতে পেল না, কী রকম এক অপ্রস্তুত গাধার মত জোদ্দা দাঁড়িয়ে ছিল তার সামনে সেই সন্ধ্যায়। নীলুর মুখটাও দেখা হয় নি।

'এ কি, এ যে একেবারে রাত হ'য়ে গেছে প্রায়। ভাগ্যিস, আপনি এসে পড়েছিলেন, নইলে এতটা পথ এই অন্ধকারে ফিরতাম কী ক'রে জানি না।'

'ভয় নেই। আসুন আমার সঙ্গে। আমার কাছে টর্চ আছে। কেন জানে না, কথা যেন আটকে যাচ্ছে জোদ্দার।

'দেখুন তো, আমি কিছুই আনি নি সঙ্গে। জানতাম না তো এত দেরী হবে ফিরতে। আর, আগে কখনো আসিও নি এত দূরে। আজ ভাবলাম, মন্দিরটা দেখে আসি।'

'আমি প্রায় রোজই আসি এদিকটায়। অবশ্য ফিরতে এত দেরী হয় না সাধারণত। আজ আপনাকে দেখে আটকা প'ড়ে গেলাম।' শেষের কথাটা যেন অনিচ্ছা সত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল জোদ্দার।

'আমার তো ভালোই হ'ল।' আস্তে গলায় বলল নীলু।

'হ্যাঁ, সাপখোপের রাস্তা তো, অন্ধকারে পথ হাঁটা খুব বিপজ্জনক।'

নীলুকে নিয়ে ফিরছে। টর্চের আলোতে পায়ের একটুখানি পথ মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হচ্ছে। সন্ধ্যার কিছুটা আলো তখনো গাছের মাথায়, দূর আকাশের মেঘে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল কাছে দূরে এক একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। ভাগ্যিস, অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, মনে হ'ল জোদ্দার। নইলে কোনো চ্যাংড়া ছেলে কোথেকে দেখে ফেলত তাদের, আর সিউড়িতলায় টেঁকাই দায় হ'য়ে উঠত।

খানিক্ষণ চুপচাপ। জোদ্দাই নীরবতা ভঙ্গ করল :

'আপনি অত কী ভাবছিলেন তখন?'

অন্ধকারে বড় সহজে অন্যকে আপন ক'রে নেওয়া যায়। দিনের বেলা হ'লে হঠাৎ এই ধরনের একটা প্রশ্ন নীলুকে সে করতেই পারত না।

'কখন?'

'ঐ গঙ্গার ধারে?'

'ভাবব আবার কী। গঙ্গার ধারটা বেশ সুন্দর।'

আবার চুপ চাপ। কথাবার্তাটা ঠিক সহজে চলছে না যেন। নীলুর সাদা শাড়িটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে। চলতে চলতে মাঝে মাঝে শাড়িটার এক-আধটু কোণ জোদ্দার গায়ে এসেও পড়ছে। এবং নীলুর নিশ্বাস ফেলার শব্দ, তাও এত কাছে যে মনে হচ্ছে যেন তা পড়ছে জোদ্দার বুকের ওপরই। জোদ্দার শিরায়-শিরায় ধমনীতে-ধমনীতে আজ কী এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সুর, যেন হঠাৎ খুব ভালো লাগছে, আবার বুকের মধ্যে কোথাও একটু কষ্টও হচ্ছে, এবং ভয়ও করছে কেমন এক ধরনের।

একটি মাত্র টর্চ, তাই চলতে গিয়ে দুজনের পরস্পরের খুব কাছাকাছি না থেকে উপায় নেই।

কিন্তু ভয়ের এত আছে কী? জোদ্দা না পুরুষ মানুষ?

অবশ্য কোনো প্রাকৃতিক ভয়ের কথা সে বলছে না, আজকে নীলুর সঙ্গজাত এক হঠাৎ কষ্ট ও আনন্দ মিশ্রিত অজানা যে-ভয় তার, সেই ভয়েরই কথা তার মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই ভয়টাই বা জাগবে কেন, এবং যদিই বা জাগে, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া কেন ?

তাই যেন তার কোনো সংকোচই নেই নীলুর সঙ্গে কথা বলতে, এমন একটা ভাব জোর ক'রে দেখাতে চেয়ে জোদ্দা হঠাৎ ব'লে ফেলল :

'আজ খবরের কাগজটা দেখলেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'দেখেননি ?'

'দেখেছি। রোজই দেখি।'

'দেখেননি দাঙ্গার খবরটা ?'

'ও,' ব'লে চুপ ক'রে গেল নীলু।

কলকাতায় আবার হঠাৎ দাঙ্গা লেগেছে। কতকগুলো এলাকায় বহু লোক খুন হয়েছে। সিউড়িতলায় অবশ্য ভয়ের তেমন কিছু নেই, কারণ বাসিন্দাদের প্রায় সবাই-ই হিন্দু। দাঙ্গা লাগবে কেমন ক'রে ? কিন্তু ভয় আছে একেবারে পাশের সহরটাতেই, গঙ্গার ধারে একটা পাট কল আছে, সেখানে অনেক মুসলমান কুলিমজুর কাজ করে। তাদের নিরাপত্তা নিয়েই দুশ্চিন্তার অবকাশ থাকতে পারে।

'কী জঘন্য, নৃশংস কাণ্ড।' জোদ্দা বলল।

নীলু কোনো সাড়াই দেয় না। নীরবে চলেছে। এতক্ষণে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে।

'আমরা আর মানুষ হলাম না, হয়তো কখনোই হব না। আবার পোড়া ভারতবর্ষে আরেকটা গান্ধী আসবে। ঐ একই কারণে প্রাণ দেবে, আর আমরা চিরকাল যে-পিশাচ সে-পিশাচই থেকে যাব।'

নীলু কিন্তু এখনো চুপ। আশ্চর্য তো। হয়তো এই সন্ধ্যায়, এই গঙ্গার ধারের পরে, এমন একটা প্রসঙ্গ হঠাৎ এভাবে উত্থাপন করা উচিত হয় নি জোদ্দার। কী দরকার ছিল দাঙ্গা-ফাঙ্গার কথা তোলার? আর খুব একটা ইচ্ছে ক'রে বা ভেবে-চিন্তে বা মনে মনে অনেকক্ষণ অনেক পাঁয়তাড়া কষার পর যে জোদ্দা আর না থাকতে পেরে প্রসঙ্গটা হঠাৎ তুলে ফেলেছে, তাও নয়। আসলে সে কিছু ভাবেই নি। একটা কিছু বলতে হবে, তাই যা সঙ্গে সঙ্গে মনে এসেছে, বলেছে।

তবে সেও কি চুপ ক'রে যাবে, এ-প্রসঙ্গে আর এগোবে না?

'আপনি দেখছি একেবারে চুপ মেরে গেলেন। থাকগে এসব কথা।'

'না, চুপ নয়, খুব চিন্তিত ও গম্ভীরভাবে বলল নীলু।

মনে পড়ে, জোদ্দা এ-প্রসঙ্গ আর চালাতে চায় নি, তবু কথাটা যেন কে জোর ক'রে তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল:

'জানেন, মণ্টুবাবু, ঐ যিনি ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার, আজ এসেছেন কলকাতা থেকে, উনি বলছিলেন ওঁর স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনা। এই তো গতকালই ঘটেছে। একটা বুড়ো মুসলমান ডিমওয়ালা রোজ যেমন আসে, তেমনি সেদিনও এসেছে ডিম বিক্রী করতে। তাকে নাকি কতকগুলো ছেলে মিলে খুন করে। আর কী ভাবে খুন করে জানেন? কাঞ্চননগরের একটা অতি সাধারণ, ভোঁতা, পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে। বুড়ো চেঁচাতে থাকে, কিন্তু কে শোনে তার কথা।'

'বেশ করেছে।' নীলু যেন বলল মনে হ'ল।

সে কি? ভুল শোনেনি তো? তাই জোদ্দা জিজ্ঞেস করল:

'কী বললেন?'

'বলছি বেশ করেছে।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল নীলু।

এবার আর ভুল হওয়ার উপায় নেই। চমকে উঠল জোদ্দা।

'বেশ করেছে? কে বেশ করেছে?'

'মুসলমানদের নিয়ে দেখছি আপনার ভয়ঙ্কর মাথাব্যথা।'

জোদ্দা যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না নিজের কানকে। হয়তো অন্ধকারের দরুণ সে ঠিক আঁচ ক'রে উঠতে পারছে না নীলুকে। যাঃ, তা কী ক'রে হয়? এমন একটা শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাবের মেয়ে, তার পক্ষে···না-না-না, কোথাও একটা বোঝবার গণ্ডগোল হ'য়ে গেছে তার, মনে হ'ল জোদ্দার।

'কাদের নিয়ে মাথাব্যথা বললেন?'

'অতই যদি ওদের জন্যে ভাবনা আপনার, তো চ'লে যান না পাকিস্তানে। আপনার এখানে বাস করার দরকারটা কী?'

আর তো ভুল হবার নয়। যেন আঁতকে উঠে ব'লে ফেলল জোদ্দা:

'আপনি এসব কী বলছেন মিসেস দাস?'

'দয়া ক'রে আমাকে আর বেশী ঘাঁটাবেন না।' অনুনয়ের স্বর নীলুর কণ্ঠে, এক রুদ্ধ আবেগের সুর।

মনে পড়ে, জোদ্দা কী থতমতটাই না খেয়ে গিয়েছিল। তার চেয়ে যা বেশী, কী প্রচণ্ড কষ্ট তার হচ্ছিল।

ফেরার পথে সেদিন নীলুকে সে আর কোনো কথা বলেনি, নীলুও কিছু বলে নি। শুধু সেদিন বার বার মনে হয়েছিল জোদ্দার, শিক্ষিতদের মধ্যে তাহ'লে আজও এমন লোক আছে যারা মুসলমাদের এত ভীষণভাবে ঘৃণা করে। কেবল কি ঘৃণাই? এ তো পেলেই যেন ছিঁড়ে খাওয়ার প্রবৃত্তি।

এবং ভদ্রমহিলা শুধু শিক্ষিতাই নন, নিজেই একজন শিক্ষয়িত্রী। কী শেখাবেন তিনি তাঁর ছাত্রীদের? এই সর্বনাশা হিংসা, মুসলমানদের প্রতি এই অমানুষিক জাতক্রোধ?

মনে মনে আঁতকে ওঠে জোদ্দা। মেয়েটার প্রতি একটা দুর্বলতা জ'ন্মে গিয়েছিল, তাই কষ্টটা যেন আরো বেশী ক'রে বাজছে

তার বুকে। যাকগে, কী দরকার? এ-বয়সে আর মেয়ে-ফেয়ে কেন? বেশ তো আছে জোদ্দা, তার কেউ নেই সংসারে। এক যা একটা বোন, তারও আজ বিয়ে হ'য়ে গেছে, নিজের ঘর-সংসার আছে।

নীলুকে তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে নি সেদিন, কারণ তা দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ বহু আগেই রাস্তার আলো আরম্ভ হ'য়ে যায়। বড়রাস্তার মধ্যে দিয়ে অনেকখানি চলতে হয়, তারপর নীলু একটা ডান দিকের গলিতে বেঁকে যাবে আগে, জোদ্দা আর একটু গিয়ে ডানদিকের অন্য একটা গলিতে বেঁকবে। ওদের তাই অনেক আগেই পৃথক হ'য়ে যেতে হয়।

বড় রাস্তায় পৌঁছোনোর একটু আগেই দুটি হাত কপালে ঠেকিয়ে নীলুকে বলেছিল:

'আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।' অত্যন্ত অস্ফুট যে কথাটা শুনতে পেল কি পেল না, জোদ্দার পক্ষে তা হলপ ক'রে বলা সম্ভব নয়।

শুধু যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ল্যাম্পপোস্টের সেই দূরাগত আবছা আলোয় নীলুর মুখটার দিকে একবার হঠাৎ চোখ চ'লে যায়, মনে পড়ে জোদ্দার। এক কঠিন, ভীষণ গাম্ভীর্য নীলুর—অন্তত সেরকমই তার মনে হয়।

তারপর পুরো একটা দিন কাটে। পরের দিন সন্ধ্যায় নীলু এসে হাজির জোদ্দার ঘরেই। দরজা খুলে চমকে ওঠে জোদ্দা।

'সে কি? আপনি?'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে। এখানে বলব?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, ব্যাপারটা কী?'

'কিছুই নয়, শুধু কথা আছে।'

এখন যায় কোথায় নীলুকে নিয়ে? তার আলো-জ্বালা ঘরের দরজায় বেশিক্ষণ দুজনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, লোকে

দেখলে কেলেঙ্কারী হ'য়ে যাবে। আর বাইরেই বা যাবে কোথায়? রাস্তায়? সর্বত্রই তো আলো।

হঠাৎ মনে হ'ল, বুড়ো শিব মন্দিরের পথে যেতে রাজী আছে নীলু? একটা কিছু হয়েছে, নীলুর চোখ-মুখ দেখে তা সহজেই আঁচ করা যায়। সুতরাং বলা যায় না, হয়তো রাজী হ'তে পারে নীলু।

'কালকের সেই পথটায় যাবেন?'

'কালকের পথটায়?'

'হ্যাঁ, বুড়ো শিব মন্দিরের রাস্তায়?'

'চলুন,' কেমন এক ক্লান্ত স্বরে যেন বলল নীলু।

'তাহ'লে আপনি একটু এগিয়ে যান, ঐ শেষ ল্যাম্পপোস্টটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।'

পৌঁছোল যখন সহরের প্রান্তে, গ্যাখে নীলু দাঁড়িয়ে আছে, একটু দূরে, মাথায় কাপড় দিয়ে। তারপর সেই মেঠো পথ, যা গঙ্গার ধারের দিকে গেছে। অন্ধকারে একটু এগোতেই নীলু হঠাৎ ব'লে উঠল ঃ

'বেশীদূর যাব না, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আপনাকে শুধু একটা কথা বলার জন্যে এ্যাদ্দুর টেনে আনলাম।'

'আপনি কোথায় টেনে আনলেন? আমিই তো টেনে এনেছি আপনাকে।'

'কালকে আপনি আমার সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা নিয়ে ফিরেছেন।'

'কিসের ভুল ধারণা?'

'আমি মুসলমানদের ঘৃণা করতে চাই না। আজ যদি তাদের ঘৃণা করি, বা করতে বাধ্য হয়েছি, তো তার নিশ্চয়ই একটা ভীষণ সঙ্গত কারণ আছে। আর সেই কারণটা আমার কাউকে বলবার নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি মুসলমানদের ঘৃণা না ক'রেই

বাঁচতে চাই। তারা এভাবে খুন হয়, বা অন্য কেউ খুন হয়, তা আমি চাই না। আমি চাই না, চাই না।'

নীলুকে এত আবেগের সঙ্গে কথা বলতে আগে কখনো শোনে নি জোদ্দা। কেমন যেন ভয় ভয় করছে তার, বলল ঃ

'তা বেশ তো। এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? হয়তো আপনি পূর্ব পাকিস্তানের মেয়ে, বহু অত্যাচার উৎপীড়ন তাদের করতে দেখেছেন……'

'দয়া ক'রে এসব কথা তুলবেন না, পায়ে পড়ি আপনার। চলুন যাই, আমার যা বলার ছিল বলা হ'য়ে গেছে।'

'চলুন,' যন্ত্রচালিতের মত বলল জোদ্দা।

কিন্তু একটা জিনিস ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না,' জোদ্দা আবার বলল।

'কী?'

'শুধু এই কথাটা আমাকে জানানোর জন্যে কেন আপনি এত কষ্ট করলেন। ধরুন, এমন ধারণা যদি আমার মনে জন্মে গিয়ে থাকে যে আপনি মুসলমানদের অত্যন্ত ঘৃণা করেন, তাতেই বা কী? কত লোকেই তো ঘৃণা করে।'

'তা ঠিক,' একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল নীলু। 'তবু মনে হ'ল, আপনার এই ভুলটা শোধরানোর দরকার।'

'বাঃ, আপনি তো আচ্ছা লোক। আমার ভুল? কাল যা বলেছিলেন আপনি, একবার ভেবে দেখুন তো? বলেছিলেন, মুসলমানটাকে যদি ছেলেগুলো অমন নৃশংসভাবে খুন ক'রে থাকে তো তারা বেশ করেছে। বলেন নি?'

'বলেছিলাম। কিন্তু বললামই তো, তার কারণ ছিল।'

'কী কারণ?'

'সে অনেক ইতিহাস। আজ বলার সময় নেই।'

'একদিন বলবেন?'

'কী হবে আপনার শুনে?'

'এই যা হলো আজ, মুসলমানদের সম্বন্ধে আপনার সত্যকার ধারণা কী, সেই কথাটা শুনে।'

জোদ্দার কথাটা যেন শোনেই নি নীলু, এইভাবে বলল:

'আসলে জানেন, কাল কথাটা ঐভাবে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা এস্তোক বড্ড একটা অনুতাপে ভুগছি—কেবলি মনে হচ্ছে, কেন আপনাকে এমন একটা কথা খামখা বলতে গেলাম। কী দরকার ছিল। তাই আজ আর থাকতে না পেরে চ'লে এলাম।'

'কিন্তু কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ধরুন, এমনও যদি হয় যে কাল যা বলেছেন আপনি, তাতে আপনার সম্বন্ধে একটা খুব খারাপ ধারণা আমার মনে সত্যিই জ'ন্মে গেছে, তাতেই বা আপনার এত আসবে যাবে কেন?'

'সত্যিই আপনার খুব একটা খারাপ ধারণা জ'ন্মে গেছে।'

'আরে তা কি আমি একবারও বলেছি? শুধু একটা নিছক তর্কের খাতিরেই প্রশ্নটা তুলছি।'

'কিন্তু বলুন আমাকে—আপনাকে বলতেই হবে—এখন কি আমাকে খুবই একটা খারাপ মেয়ে ব'লে মনে করেন?'

'একেবারেই করি না, কী আশ্চর্য।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ রাতের একটা পাখি ডেকে উঠল কাছে কোথাও। নীলু বলল:

'ফেরা যাক এবার। এঁ্যা?'

'চলুন।'

সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে সারারাত জোদ্দার শিরায় শিরায় কেমন এক উন্মাদনার সুর। কী যে হ'ল, কিছুই বুঝল না, অথচ ভালো লাগছে ভাবতে। নীলুকে সে ভালো ভাবল না খারাপ ভাবল

তাতে মেয়েটার এত আসে যায়? না আসলে জোদ্দা যেভাবে দেখছে জিনিসটাকে, নীলু সেভাবে দেখছে না একেবারেই। হয়তো জোদ্দা কী ভাবল না ভাবল, তাতে ভিতরে ভিতরে নীলুর ব'য়েই গেল, এখানে জোদ্দা কোনো প্রশ্নই নয় তার কাছে। একমাত্র প্রশ্ন সে নিজে। তার সম্বন্ধে এ-পৃথিবীর কেউ একটা মিথ্যা ধারণা পোষণ করবে, এটা সে পারলে কিছুতেই সইবে না। হয়তো আসলে এইটেই নীলুর মনের কথা। হ'তে তো পারে, সবই হ'তে পারে।

কিন্তু এটা না হ'য়ে জোদ্দা আগে যেটা ভাবছিল, সেটাও তো হ'তে পারে। নয় কি?

কোনটা সত্য, কে জানে। এবং জানতে চেয়ে হয়তো লাভও নেই। শুধু এই প্রশ্নের, সংশয়ের, বেদনার, আনন্দের নিদ্রাহীন রাতটি সুন্দর, মনে হয়েছিল জোদ্দার। বুকের মধ্যে একটা দুরন্ত হায়েনাকে যেন পুষে এসেছে বহুকাল, আজ জন্তুটা হঠাৎ জেগে উঠেছে, খাবার চায়। এখন কী ক'রে তাকে শান্ত করবে জোদ্দা?

সারা রাত ভাবল সে, ভেবে কোনো কূল কিনারা পায় না। কখনো হঠাৎ হঠাৎ খুব ভালো লাগে, কখনো সংশয়ে মন দোলে। কখনো ভাবনা তাকে হু-হু ক'রে এগিয়ে নিয়ে যায়, কোন মধুর অচেনায় শিহরিত যাত্রায়, আবার কখনো তা তাকে হোঁচট খাইয়ে থামিয়ে দেয়।

পরের দিনটা ছুটি ছিল। র'ববার নয়, কিন্তু অন্য একটা ছুটি। রাতে তো ঘুম হয় নি, তাই দুপুরে খাওয়ার পরে প'ড়ে প'ড়ে ঘুম মারছিল। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে—বেলা তখন তিনটে সাড়ে-তিনটে হবে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এক প্রচণ্ড ঝড় যেন যেন উঠল ব'লে। কয়েকদিন ধ'রে অসহ্য গরম যাচ্ছিল, তাই এই মেঘ দেখতে এত ভালো লাগছে। পৃথিবীটার একটা অবিশ্বাস রং হয়েছে, এক গাঢ় বেগনি- সবুজের ওপর আলকাতরার পোঁচ। বিছানা থেকে লাফিয়ে

উঠে প্রাণ ভ'রে গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে জোদ্দা : 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে···' আরে ওটা কে রাস্তায়? মিসেস দাস নয়? সত্যিই তো। গানটা থামিয়ে ফেলে জোদ্দা। এবং এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এল—গুঁড়ি গুঁড়ি নয়, চুপি চুপি নয়, ঝম ঝম ক'রে, ঢাক পিটিয়ে।

একটা ছাতা হাতে নিলে ছুটল রাস্তায়, পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল :

'মিসেস দাস।'

নীলু ভিজে নেয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটা, কাল রাত্তিরে একলা জোদ্দার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে তার এতটুকু সংকোচ হয় নি, আর আজ এই ঝমাঝম বৃষ্টিতে একেবারে তার বাড়ির সামনে থেকেও তবু ঢুকল না। এমন একটা সময়ে এ-রাস্তায় এসেছিল কী করতে? কে জানে।

'আপনি তো খাসা লোক মশাই,' নীলুর কাছাকাছি এসে বলল জোদ্দা, কেন, এই গরীবের বাড়িটা কী দোষ করেছিল?'

'দোষ কিছু নয়—তবে ভাবছিলাম ছুটির দিন, হয়তো বিশ্রাম করছেন, খামাখা আপনাকে বিরক্ত করি কেন?'

'যাক, অনেক লৌকিকতা হয়েছে, এবার দয়া ক'রে ভেতরে চলুন তো।'

বাড়িতে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করতে করতে জোদ্দা বলল :

'দেখুন তো, নিজে তো ভিজলেনই, আমাকেও ভিজিয়ে ছাড়লেন।'

'কিন্তু দোষ তো আপনারই চোখের, আপনি কেন আমাকে দেখলেন রাস্তায়?

'কিন্তু তার আগে, দোষ আপনার পায়ের, আপনি রাস্তায় ঘেরোলেন কেন, আমার বাড়ির সামনে এলেন কেন?'

'তাহ'লে আমার পা দুটো কেটে ফেলে দিন, ল্যাটা চুকে যায়।'

হাসিচ্ছলে কথাটা বলতে বলতে যেন অন্য কিছু মনে প'ড়ে গেল নীলুর, হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

'অমন মুখ গোমরা করবেন না দয়া ক'রে। হাসুন, আপনাকে হাসতে দেখলে খুব ভালো লাগে আমার।'

'আচ্ছা হাসব।'

'একটু চা খাবেন, গরম গরম?'

'তাহ'লে তো আপনাকে রান্না ঘরে ঢুকতে হয়?'

'ঢুকব। ও দাঁড়ান—আপনাকে একটা গামছা দিই আগে, বড্ড ভিজে গেছেন।'

'থাক দরকার নেই,' ব'লে শাড়িটার আঁচল দিয়ে মাথার চুল মুছতে আরম্ভ করল নীলু।

চায়ের জল চাপিয়ে জোদ্দা ফিরে এল নীলুর কাছে। আজ তার ঘর শূন্য নয়, নীলু ব'সে আছে হাতল-ভাঙা চেয়ারটায়। খুশীর তরঙ্গে দুলছে মন, সে-খুশী নাচছে জোদ্দার চোখের চাওয়ায়, নাচছে তার পায়ে-পায়ের রক্তে।

তার পায়ের শব্দ শুনে নীলু ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল, একটু হাসল। মুখে চোখে জল আর নেই তার, কিন্তু চুলটাকে যেন খুব মসৃণ খুব কালো ঠেকছে, এই স্নানের পরে। কপালের ওপর গাঢ় কাজলের টিপটা এখনো মুছে যায় নি। আর তার একটু তলাতেই, টিকোলো নাকটা যেখান থেকে সুরু হয়েছে, তার দুই পাশে, দুটি গভীর ঘন কৃষ্ণপদ্মের মত চোখ। যেন পদ্মের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছে জোদ্দা, সত্যিই। গোলাপী রঙের মোটা সূতির শাড়ি, অতি আটপৌরে, রক্ত লাল পাড়। কালো হাত দুটি মৃণালের মত।

সব নিয়ে, কেমন যেন একটা বিহ্বল বোধ করছে জোদ্দা, চোখ সরিয়ে নিতে পারে না নীলুর ওপর থেকে।

নীলু ধরতে ঠিকই পেরেছে, হেসে বলল :

'কী, অমন হাঁ ক'রে দেখছেন কী?'

'আপনাকে। আপনি কী আশ্চর্য সুন্দর।'

'যাঃ, এ-সব কী বলছেন আপনি? এমন অসম্ভব কথা কেউ কখনো আমায় বলে নি।'

'আপনার স্বামীও বলেন নি?'

হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে যায় নীলু, বলেঃ 'না, কেউ না, কেউ বলেনি।'

এত সাহস জোদ্দা কোত্থেকে পেয়েছিল সেদিন জানে না, কিন্তু মনে আছে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

'আচ্ছা, মিসেস দাস, আপনার তো কেউ নেই এ-সংসারে, না?'

'কেউ নেই, আপনারই মত।'

মনে আছে, ঐ 'আপনারই মত' কথাটা শুনে জোদ্দার সাহস আরো তিনগুণ বেড়ে যায়ঃ

'আমাদের দুজনের অবস্থাই দেখছি একেবারে সমান।'

'অনেকটা তাই।'

'তবে পা দেওয়া যাক না কেন দুজনে একই নৌকোয়?'

'মানে?'

এইবার ভড়কে গেল জোদ্দা। যা ব'লে ফেলেছে, তার গুরুত্বটা যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। অথচ ব'লে-ফেলা কথা ছোঁড়া বাণ, তাকে তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু নীলুকে কী উত্তর সে দেবে এখন? আবার এমন একটা প্রচণ্ড প্রস্তাবের পরে হঠাৎ চুপ মেরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

'বলছিলাম আপনিও যখন একলা, আর আমিও একলা, তখন…'

গলা শুকিয়ে আসে জোদ্দার। বুকের মধ্যে কে যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে। নীলু বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে জোদ্দার দিকে।

'মিসেস দাস, বলছিলাম আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমরা…, তারপর যা থাকে কপালে এই মনে ক'রেঃ আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।'

'এ-সব কী বলছেন?' নীলু স্তম্ভিত!

তবে হয়তো নীলুর আপত্তি আছে, নিশ্চয়ই আছে। হয়তো সে ভাবছে, জোদ্দা হয়তো তার এই অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তার ওপর অত্যাচার করতে চায়, তাকে এই ঝম ঝম বর্ষায় বন্ধ ঘরের মধ্যে পেয়ে। যেন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল জোদ্দার।

'ও, আপনার তা'হলে মত নেই কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না, আমি আপনার কোনো অসম্মান করব না। বৃষ্টিটা একটু ধরলেই...'

'না, তা নয়। আপনি যা বললেন, তা সত্যি?'

নীলুর চোখে একটু জ্যোতির কণিকা যেন কোথাও দেখতে পেয়েছে জোদ্দা, মনে হ'ল তার। মনে হল তার, তার সমস্ত কথাটা শোনবার জন্যে যেন নীলু অপেক্ষা ক'রে আছে। যেন সে-কথাটাকে ব'লে ফেলতেই হবে এক্ষুণি, আজ এই ঝমঝম বর্ষায়। এই লগ্নটি হারিয়ে গেলে কথাটাও এ-জন্মের মত হারিয়ে যাবে, আর বলা হবে না।

'হঠাৎ মনে হ'ল তাই বললাম। কিছু মনে করবেন না। কিন্তু কথাটি সত্যি।'

নীলু স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে, যেন তার বাকশক্তি লোপ পেয়েছে।

'ক্ষমা করবেন, মিসেস দাস। ভুলে যান। আর কখনো এ-প্রসঙ্গ তুলে আপনাকে বিরক্ত করব না।'

'না না...বিরক্ত নয়। একটু দাঁড়ান, আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'আপনি কি তবে অন্য কারুর বাগদত্তা?'

'না। আসলে এমন প্রশ্ন আমাকে কেউ করে নি আগে।'

'তবে?' জোদ্দা যেন আশার আলো দেখল।

'কিন্তু আপনি তো আমাকে চেনেনই না এখনো, আমার তো কিছুই জানেন না। কেন এ-সব প্রশ্ন করছেন?'

'যেটুকু চিনেছি, আমার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। আপনি কি আপনার সেই পূর্ব জীবনের কথা বলছেন, বিবাহিত জীবনের কথা ? তা নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। বিধবাবিবাহ তো আজকাল······'

'না, সেসব নয়। অন্য জিনিস, সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তা শুনলে আপনি —··· না না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না।'

'কেন হতে পারে না ?' জোদ্দার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়। 'অবশ্য প্রস্তাবটা যদি আপনার পক্ষে এতই অগ্রাহ্য হয় তো অন্য কথা।'

'আমার অগ্রাহ্য হওয়া না-হওয়া নয়, আপনার নিজের কানেই অগ্রাহ্য ঠেকবে। একবার যদি শোনেন আমার কথা, আপনি এই ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যাবেন, আমার মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চাইবেন না আর।

'আগে বলুন, আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে আপনার আপত্তি আছে কি না।'

'তা এখুনি কী ক'রে বলি ? আগে আপনি আমার ইতিহাসটা শুনুন। তখনো যদি আপনার মনের অবস্থা একই থাকে তো··· তো তারপর দেখা যাবে।'

সে-ইতিহাস ভয়ানক, তবু তার মধ্যে নূতনত্ব তেমন একটা নেই। কারণ তা শুধু নীলুর একলার ক্ষেত্রেই ঘটেনি। ঘটেছে শত সহস্র মেয়ের জীবনে। ফরিদপুরের বাউষখালি গ্রাম। তার মা, বাবা, সে নিজে, এবং দুটি ছোট ছোট ভাই। সাধারণ কষ্টের সংসার, প্রাচুর্যও নেই, খুব একটা দুঃখ-দৈন্যও নেই। ১৯৪৪-এর দাঙ্গার সময় নীলুর বয়স পনের।

তারপর তো পড়া পাতা, আর বলার দরকার কী ? জোদ্দা শুনতেও চায় নি, বিশেষত সে যখন নিজের চোখেই দেখছিল, বলতে কী কষ্ট হচ্ছে নীলুর।

'আজ তাদের কেউ নেই, এই তো? আপনি কি একলাই কোনো রকমে প্রাণে বেঁচেছেন?'

'হ্যাঁ। জানেন, মার চোখের সামনে, আমাদের সকলের সামনে রুনুকে আছড়ে আছড়ে মেরে ফেলে। কিন্তু সে-স্মৃতি মনে করবার কেউ নেই আজ, একমাত্র এই অভাগী আমি ছাড়া। বাবাকে মারে সবচেয়ে আগে, তাঁর মাথায় হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে—আর আমরা সামনে পড়ে আছি, হাত-পা বন্ধ, মুখ কাপড় দিয়ে আঁটা। তারপর মাকে। মাকে কেমন ক'রে মারে জানেন? কাপড় খুলে, তাঁকে উলঙ্গ ন্যাংটো ক'রে, একটা শাবল ঢুকিয়ে দেয়। আর সে কী পৈশাচিক হাসি তাদের। কানে এখনো বাজছে।'

'থাক থাক, আর শুনে দরকার নেই। আর আপনিও এসব কথা ভাববেন না। ভুলে যান।'

'তবু তো আমার নিজের সম্বন্ধে কিছুই শুনলেন না এখনো।'

'কী দরকার? আঁচ করতে তো পারছিই। আপনার······ আপনার দেহের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, এই তো?'

'হ্যাঁ, আমাকে শুধু প্রাণে মারেনি, কিন্তু মারলেই ভালো করত।'

'থাক, এসব কথা আপনাকে বলতে হবে না। সবই বুঝেছি, সবই শুনলাম। আরো কিছু বলার আছে নিজের সম্বন্ধে?'

'জানেন, একটার পর একটা লোক, পশু, জানোয়ার, ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর সে কী কষ্ট আমার, চেঁচাতে পারি না, নড়তে পারি না। এদিকে লাগছে প্রচণ্ড। তৃতীয় কি চতুর্থ বারের সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'এসব কথা কেন ব'লে চলেছেন আপনি, কী দরকার?

'এই প্রথম বলছি। আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। আর এসব কথা কোনো মেয়ে তার নিজের সম্বন্ধে বলতেও পারে না, আমিও পারতাম না···কই, এ্যাদ্দিন পারিনি তো? আজ আপনি বলিয়ে

ছাড়লেন আমাকে। এখন বুঝছেন তো, কেন সেদিন মুসলমান সম্বন্ধে একটা কথা বলতে গিয়েছিলাম ?'

'বুঝেছি। এবং আপনাকে দোষ দেওয়ার কিছুই নেই আমার। বরং ক্ষমা চাওয়ার আছে আপনার কাছে।'

'ক্ষমা ? কেন ?'

'কারণ কিছু না জেনে শুনে সেদিন হঠাৎ একটা ভুল ধারণা ক'রে ফেলেছিলাম আপনার সম্বন্ধে।'

'তার জন্যে ক্ষমা ?'

'হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল নীলু, এভাবে তাকে আগে কখনো হাসতে দেখে নি জোদ্দা। মনে হয়, অনেক দুঃখের অনেক ক্রুদ্ধ রুদ্ধ বাষ্পের অনেক হাহাকারের আর সঞ্চিত অশ্রুজলের এই আকস্মিক বিস্ফোরণ, এই হাসি। নিজেকে শান্ত ক'রে নিয়ে বলল নীলু ঃ

'কত লোকে কত কী করল, কেউ ক্ষমা চায় নি, কখনো চায়নি, আর আজ মাত্র এইটুকুর জন্যে আপনি ক্ষমা চাইছেন ? সত্যি, আমার জীবনে দেখছি অনেক কিছুই আপনি প্রথম ঘটাচ্ছেন।'

'ও, চায়ের জলটা। এতক্ষণে বোধ হয় জল ফুটে শুকিয়ে গেছে।'

চা ক'রে নিয়ে ফিরে এসে দেখে নীলু ব'সে আছে সেই একই ভাবে, কালো পাথরে খোদিত কোনো নায়িকার মূর্তির মত। চোখ দেখে মনে হয়, খানিক্ষণ আগে কেঁদেছে খুব। তার অন্তরে কোথায় যেন এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। বাইরের বৃষ্টি তখনো থামার নাম নেই, যেন পৃথিবীটাকে ডুবিয়ে দেবে বলে পণ করেছে।

'আপনি আবার ভাবছেন তো ঐ সব ?' জোদ্দা বলল।

'না ভেবে উপায় কী ? শুধু যদি একটা ওষুধ জানতাম, যা খেলে সব ভুলে যাওয়া যায়।'

'কিন্তু উদ্ধার পেলেন কী ক'রে ?'

'কোত্থেকে ?'

'সেই সর্বনাশ থেকে ?'

'জানি না, আজো জানি না। অশোক কাকাদের কোনোদিন জিজ্ঞেসও করিনি, কেমন ক'রে ওঁরা আমায় খুঁজে পেলেন, কেমন ক'রে ঐ পশুগুলোকে তাড়ালেন, মা-বাবা-রুনু-সুনুর দেহগুলোরই বা কী হ'ল ?

'অশোক কাকা কে ?'

'আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, পাশের বাড়িতে থাকতেন।'

'বাউষখালিতে ?'

'হ্যাঁ। জ্ঞান হওয়ার পর চোখ খুলে ওঁদেরই দেখতে পাই। কাকীমা আমায় বাতাস করছিলেন, চোখে-মুখে জল দিচ্ছিলেন।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী ? দুতিন দিন বাদে ওঁরা চ'লে এলেন কলকাতায়, সব ছেড়ে ছুড়ে। আমার ওপর কী দয়া হ'ল, আমাকেও নিয়ে এলেন।'

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে নীলু, অত্যন্ত ক্লান্ত, কথা যেন বেরোচ্ছে না।

'আপনার কষ্ট হচ্ছে, থাক। নাই বা বললেন।'

'না, শুনুন। এটুকুই বা বাকী থাকে কেন। তারপর কলকাতার বস্তিতে। এক বস্তি থেকে আরেক বস্তিতে। কিন্তু সর্বত্রই ঐ একটা ক'রে ছোট ঘরই মিলেছে। আর আমরা তেরজন লোক, ভাবতে পারেন ? তবু থেকেছি, করব কী ? বাঁচতে তো হবে। মাঝে মাঝে মনে হত, এ বেঁচে থেকে লাভ কী ? বিশেষ ক'রে আমার বেঁচে থাকায় লাভটা কী ? অন্ততঃ আত্মহত্যা ক'রেও তো মরতে পারি। কিন্তু সে-চেষ্টা পর্যন্ত কোনো দিন করতে পারিনি। কেন জানি না অথচ জীবনে কোনো আশা

ছিল না, আকাঙ্খা ছিল না, কিছু করবার বা হওয়ার প্রবৃত্তিও ছিল না। শুধু কোনোরকমে বেঁচে গেছি, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আর সে কী কষ্ট, দিনের পর দিন, সে কী অভাবের সংসার, কী যন্ত্রণা। একটা আলু, একটা পটল নিয়ে একজনের সঙ্গে আরেক জনের সর্বক্ষণ মারামারি। আর আমি তো একটা বাড়তি লোক, আমি তো কেউ নয় ওদের। তাই খারাপ লাগত। ভাগ্যে পড়াশুনোটা চালিয়ে যাই, থামাইনি। উদ্বাস্তু ব'লে বিনা মাইনেয় পড়তে পেয়েছি, ম্যাট্রিক দিয়েছি, আই-এ দিয়েছি, বি-এ পর্যন্ত পাশ করেছি। কিছু সেলাই-এর কাজও শিখেছিলাম—এর-ওর সামান্য জামা-কাপড় ক'রে যা কিছু পেয়েছি কখনো, কাকীমাকে দিয়েছি। শেষে একদিন একটা চাকরি পেয়ে গেলাম, কলকাতাতেই। একটা সামান্য স্কুল মাস্টারী। তা পেলেও সেই কাকীমাদের গলগ্রহ হ'য়েই থাকা—শেষে যেন আর পারছিলাম না। তারপর, অনেক অপেক্ষা করার পর, এই সিউড়িতলার চাকরিটা পেলাম। পেয়ে যেন বেঁচে যাই। তবু, কাকীমাদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।'

তখনি জানতে ইচ্ছে হয় জোদ্দার, তবে নীলু বিয়ে করল কখন? কিন্তু তা জিজ্ঞেস করতে পারে নি। ভাবে, আবার কেন একটা দুঃখের স্মৃতি জাগিয়ে তোলা? সত্যি, নীলুর এই আগাগোড়া দুঃখের প্রচণ্ডতার সামনে যেন বোবা হ'য়ে যেতে হয়—এই দুঃখের কাছে তার নিজের দুঃখ কত তুচ্ছ ঠেকে। ভেবে খারাপ লাগে যে সেই তুচ্ছ দুঃখটা নিয়েও সে অনেক সময় কত বাড়াবাড়ি করেছে, মনে মনে সেটাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কত কষ্ট পেয়েছে।

'কিন্তু আপনার যা হয়েছে, সেটা ভয়ঙ্কর, মানছি, কিন্তু তা আপনার মতন আরো অনেক মেয়েদেরই হয়েছে, সেটা ভেবে এত দুঃখেও হয়তো খানিকটা সান্ত্বনা মিলতে পারে। আমি অবশ্য

নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি এদিককার হিন্দুরাও বহু মুসলমান মেয়ের ওপর ঐ একই ধরনের অত্যাচার করেছে।'

'তাতে আমার কী বলুন? আমার যা সর্বনাশ হবার তা তো হ'য়েই গেছে। একটা পাপ দিয়ে তো আর আরেকটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।'

'তা অবশ্য সত্যি, খুবই সত্যি।' জোদ্দা কী বলবে, ভেবে পায় না।

'আর এই স্মৃতি আমি বহন ক'রে চলেছি মনে মনে। নিস্তার নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো পাগল হ'য়ে যাচ্ছি; হঠাৎ হঠাৎ চোখে ভেসে ওঠে রুনুর অসহায় মুখখানা, তার সেই পা দুটো ধ'রে বাঁই বাঁই ক'রে···আরো কত কী মনে পড়ে, কত সাংঘাতিক সব ছবি। তখন যেন শ্বাসরোধ হ'য়ে আসে, ছুটে পালাতে চাই, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে চাই, তাড়াতাড়ি কোনো রকমে একটা কিছু ক'রে ফেলা, একটা ভেল্কিবাজী, যা দিয়ে নিমেষের মধ্যে ছবিটা চোখের সামনে থেকে মুছে যাবে। কিন্তু যায় না, বিশ্বাস করুন।'

হতভম্বের মত ব'সে থাকে জোদ্দা। ভাগ্যিস, বৃষ্টিটা এখনো থামবার নাম নেই, তাই তো নীলুকে ধ'রে রাখা গেছে, মনে হ'ল জোদ্দার।

'সেদিনও ঠিক এমনি হয়েছিল', ভাবাবিষ্টের মত বলল নীলু, 'তাই কী করব ভেবে না পেয়ে হন হন ক'রে হাঁটতে সুরু করি। কিছু খেয়াল ছিল না, হঠাৎ দেখি মন্দিরটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

'ও, তাই বুঝি। তাই আপনি অমন ধ্যানমগ্ন···'

'কিন্তু সেটা সঙ্গে সঙ্গে আসে নি। ··ঙ্গার ধারে ব'সে থাকতে থাকতে বেশ ভা'লো লাগতে সুরু করে, মনটাও শান্ত হ'য়ে আসে। তারপর, সব ভুলে যাই। শুধু চোখের সামনে ঐ জলটা থাকে, ঐ

বিরাট উন্মুক্ত আকাশটা থাকে। কোথা দিয়ে সময় কেটে গিয়েছে জানি না, জানতামও যদি আপনি না এসে পড়তেন।'

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে এল নীলুর, বলল ঃ

'থাক, শুনলেন তো আমার ইতিহাস, এখনো আপনি ঘর ছেড়ে ছুটে পালাতে চান না ?'

'যদি পালাই তো আপনাকে নিয়েই পালাব, আপনার এই দুঃখের জগতটা থেকে আপনাকে অন্য আরেক জগতে নিয়ে যেতে।'

'এসব আপনি কী বলছেন ? কেন এত আশা দেখাচ্ছেন ?'

ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদিন বৃষ্টি থামে সন্ধ্যের বেশ কিছু পরে, ঘরে আলো পর্যন্ত জ্বালায়নি জোদ্দা। আস্তে আস্তে দরজা খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে নীলুর হাতে টর্চটা দিয়ে দেয়। কী বৃষ্টি, ধন্বন্তরি, যুগান্তকারী, তিন ঘণ্টায় তার জীবনটা পাল্টিয়ে দিয়ে গেল। নামছে মেঘমুক্ত তারকাখচিত রাত, সুরভিত স্বপ্নের, মধুর চিন্তার, মনে মনে কত রোমাঞ্চকর জল্পনা-কল্পনার।

সেদিনের সেই ঘর জোদ্দার, আর আজকের এই ঘর রাখালের। কিন্তু কত তফাৎ। আজো নীলু একলা তার সঙ্গে, ঐ দু হাত দূরে, সামনে ব'সে। কেবল সিউড়িতলা নয়, কলকাতা। ঝমঝমে বর্ষা নয়, খটখটে রোদ! আর নীরবতার, এক অনিশ্চয়তার প্রাচীর, এই দেয়াল। সেদিন যা আরম্ভ হয়েছিল অতর্কিতে, অপ্রত্যাশিত ভাবে, আজ তার শেষ নাববে না কি—আজ, যখন প্রাণভরা প্রত্যাশায় প্রত্যেকটি মুহূর্ত পাগল। না না, তা হ'তেই পারে না। ঐ তো নীলু ব'সে আছে, প্রাণের প্রতিমা, জোদ্দার পরাণ-পাখি। রাখাল এসে পড়ল ব'লে, সে নিশ্চয়ই এল ব'লে।

হ্যাঁ, তারপর কী হল ? সেই ঝমঝমে বর্ষার দিনটার পরে ?

তারপর তাদের নিত্যই দেখা হয়েছে, কখনো সন্ধ্যায়, কখনো বিকেলে, কখনো সারা দিন ধ'রে। অবশ্য জোদ্দার ঘরে নয়,

সিউড়িতলায় নয়, ঐ একই মন্দিরের পথে। দেখা করার একটা নির্জন জায়গা ঠিক ক'রে নিয়েছিল ওরা, সেখানে কখনো জোদ্দা আগে পৌঁছে যেতো, কখনো নীলু এসে অপেক্ষা ক'রে থাকত। ছুটি-ছাটার দিন সকাল হ'তেই দুজনে এসে হাজির হত আম বনটার কাছে, ফিরত সন্ধ্যের দিকে। কিছু মুড়ি, কখনো বা কিছু চিঁড়ে ভাজা কিছু নারকেল নাড়ু সঙ্গে নিত। চিঁড়ে-ভাজা বা নারকেল নাড়ু, নীলুরই রান্না সব 'তা খেতে খেতে জোদ্দার মনে হত, সত্যিই নীলু রাঁধেও কী সুন্দর। নীলুর সবই সুন্দর ঠেকত তার কাছে। আশপাশের জগৎ, আমবনটা, হঠাৎ গঙ্গার ওপর দিয়ে চ'লে যাওয়া স্টীমারের ভোঁ, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের ফিসফিস-করা হাওয়া, সবই জাগত তার মনে এক অভূতপূর্ব দ্যোতনা নিয়ে, একটি অবশ অসাড়-করা অর্থপূর্ণতা, যা সে কোনোদিন জানে নি জীবনে। কল্পনার চোখে নীলুকে দেখত তার গৃহকর্ত্রী হিসেবে, হাতে শাঁখা, সীথেয় সিঁদুর। চৌত্রিশ বছর বয়স, অথচ আশ্চর্য, দেখে মনে হয় না। মনে হয় বড় জোর তিরিশ কি একতিরিশ। এত কালো হওয়ার হয়তো এই আরেকটা গুণ, মনে হ'ত জোদ্দার।

আর এই ছুটিছাটার দিনগুলোর জন্যে সারা সপ্তাহ ধ'রে কী আকুল প্রতীক্ষা তাদের। অথচ কারুর মনে কোনো সন্দেহ জাগাব অবকাশও দেওয়া যায় না। তাই অনেক সময় যেচে জোর ক'রে নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সম্পর্কটা বজায় রাখতে হয়েছে। মণ্টুবাবু যখন আসতেন, তাঁর কাছে গেছে সন্ধ্যের দিকে।

একদিন তো মণ্টুবাবু সরাসরিই বললেন ঃ

'কী মশাই, গজাননের রেষ্টুরেণ্টটা হঠাৎ বয়কট করলেন ? অথচ বাড়ি গিয়েও পাত্তা মেলে না। কোথায় থাকেন ?'

এর কী উত্তর দেবে জোদ্দা ? বলে ঃ

'মানে, হঠাৎ একটু কাজ পড়েছে তাই......'

'কাজ ? ইস্কুলের কাজ ?'

'এক রকম তা-ই বলতে পারেন। তবে কাজটা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। বাঃ, খাসা পাঞ্জাবীটা করেছেন তো, কী কাপড়?' তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চ'লে যায় জোদ্দা।

কিন্তু এভাবে লোকের চোখে ধুলো আর কদ্দিন দেবে? বিশেষত মন্টুবাবু, কম ধড়িবাজ লোক কি তিনি? আর লোকটা তো একটা গেজেট, রাজ্যের লোকের হাঁড়ির খবর রাখাই তার একমাত্র পেশা। একদিন তো হাতে নাতে ধরা প'ড়ে যায় আর কি। এক রবিবার সকালে সহরের প্রান্তে এসে পৌঁচেছে, যেখান থেকে চ'লে গেছে ডানদিকে মাদরালের দিকে মেঠো রাস্তা, বাঁ দিকে গঙ্গার ধার ও বুড়ো শিব মন্দিরের পথ। এমন সময় হঠাৎ দেখে মাদরালের দিক থেকে ফোটন আসছে···হয়তো বেড়িয়ে ফিরছে, কিম্বা কোনো কাজে গিয়েছিল, কে জানে। জোদ্দাকে দেখেই ব'লে উঠল :

'কী দাদা, এই সকালে এত মাঞ্জা দিয়ে কোথায়?'

'মাঞ্জা' দেওয়ার মধ্যে তো পরেছিল একটা নতুন সস্তা সিল্কের পাঞ্জাবী আর একটা সদ্য ধোপার বাড়ি ফেরত ধুতি। ফোটনকে থামাবার জন্যে হয়তো আরও পাল্টা প্রশ্ন করা উচিত ছিল : 'তুমিই বা এত সকালে এই দিকে কোথায় গিয়েছিলে?' কিন্তু সেটা সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে নি। শুধু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে ব'লে ফেলে :

'এই একটু মাদরালের দিকে।'

'এখন মাদরালের দিকে, কেন?

'এই একটু বেড়াতে আর কি, বেড়ানো তো হয়ই না, শরীরটা মাটি হ'য়ে যাচ্ছে।'

'সে কি দাদা, এই রোদ্দুরে? ঘেমে যে নেয়ে উঠবেন। আরে দূর মশাই, ফিরে চলুন। বেড়াতে হয় তো ভোরের দিকে আসবেন।

কত তা-না-না-না ক'রে, কত বাজে ধাপ্পা দিয়ে সেদিন ছাড়া পায় ফোটনের হাত থেকে।

না, লোকে জেনে ফেলবে, বা কানাকানি করবে, বা এভাবে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেশিদিন চলা যাবে না, শুধু তা ভেবেই নয়, জোদ্দা ও নীলুর তাড়া করার অন্য কারণও ছিল। এবং সে কারণটা তাদের একেবারে নিজেদের, তাদের দুজনের একান্তই ব্যক্তিগত। সেই ঝমঝমে বর্ষার বিকেল থেকে আরম্ভ ক'রে কয়েক দিনের মধ্যেই নীলু যেন আশ্চর্য পাল্টে যায়। এই ধীর স্থির বিষণ্ণ অল্পভাষী মেয়েটা, সে যে হঠাৎ এত প্রগলভ হ'য়ে উঠতে পারে, এত উচ্ছল হ'তে পারে, তার নিজের জীবন ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে এত আকুল হ'তে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু কি তাই? বাইরের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তার কী আগ্রহ। সেদিন আমবাগানে হঠাৎ ব'লে ওঠে:

'ছাখো ছাখো, ঐ ডালটার আড়ালে। দেখছ? কালো কুচকুচে পাখি, কিন্তু ল্যাজটা লাল টুকটুকে। চুপ, শব্দ করো না, উড়ে যাবে।'

তার অন্তরে এতদিন যেন এক সমুদ্র লুকিয়ে ছিল, আজ হঠাৎ জেগে উঠেছে। সে তো নিজেই বলেছে কতবার, সে জীবনে চায় নি কিছুই। তার যে কিছু চাইবার থাকতে পারে বা কিছু চাইবার অধিকার যে আছে তার, এ-কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। তার সমবয়সী মেয়েদের একে একে বিয়ে হ'য়ে যেতে দেখেছে, কিন্তু তারও যে বিয়ে হ'তে পারে একদিন, এমন অসম্ভব কথা সে কখনো ভাবতে পর্যন্ত পারে নি। প্রথমত, বিয়ে দেবে কে, টাকা কোথায়? দ্বিতীয়, আর অতীতটার কথা স্মরণ ক'রে কোন মুখেই বা সে বিয়ের স্বপ্ন দেখবে? সে যে ধর্ষিতা, পাঁচ জনের সামনে যে তার কৌমার্যহানি ঘটেছে, সে যে চিরকালের জন্যে পতিতা, অভিশপ্তা।

আর আজ, তার এই প্রায় মধ্য বয়সে, একজন যেচে এসে তাকে গ্রহণ করতে চায়। সেইজন তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে গৃহের, সংসারের মায়ার, সন্তানের—আজ তার এই প্রায় ভাঁটা প'ড়ে

আসা যৌবনে। তাই সময় নেই, এখুনি ঘরটা বেঁধে ফেলতে হবে, ছুটতে হবে ত্রস্ত পদে সমস্ত সম্ভাবনা পূরণের পথে। এতদিনে আজ চাইবার সময় এল তার, দুই হাত তুলে।

জোদ্দা জানে, তারো কথা ঐ একই। সে জানে, সকলেই এই পৃথিবীতে ঘর বাঁধতে আসে—ভালোবাসা রাখার, স্নেহ রাখার একটা জীবন্ত জায়গা চাই। নইলে সবই বৃথা, নইলে অকারণে একটা ভাঙা ল্যাম্পপোস্টের মত দাঁড়িয়ে থাকা। আর জানে জোদ্দা, সে-ঘর বাঁধা যায় না যদি ঘরণী না থাকে, কারণ ঘরণীই ঘর, ঘরণী ছাড়া ঘরের অস্তিত্ব নেই। এতদিন ধ'রে জোদ্দার যে-জীবন, সে-জীবন নীলুরও, তা ছিল ঐ ভাঙা ল্যাম্পপোস্টেরই মত। কিন্তু আজ?

তাই তাড়া। তাই এক মাস যেতে না-যেতে সব ঠিকঠাক, সব সঙ্কল্পের প্রথম গোড়া পত্তনের দিকে এগোনো।

অবশ্য, এখন এই রাখালের ঘরে ব'সে থাকতে থাকতে মনে হ'ল জোদ্দার, আজকের যে-তাড়াটা, এই ঘুষ-টুষ দিয়ে বিবাহের দিন আজই ধার্য ক'রে ফেলাটা, সেটার কারণটা একটু আলাদা। ও তা' ভাবতে গিয়েও তার সমস্ত দেহে এক অজানা আনন্দের শিহরণ ব'য়ে যায়। সত্যিই, কী তাড়া নীলুর, আশ্চর্য। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরো একটি ছোট্ট ঘটনা, একদিন ঐ আমবাগানের মধ্যাহ্নে।

সেদিন আবার বলছিল নীলু তার সেই অতীতটার কথা, কারণ সে-কথা সে কিছুতে ভুলতে পারে না, তা তার মনে ফিরে আসে বার বার, তাদের আলোচনাতেও তাই বার বার সে-প্রসঙ্গ ওঠে। এক সময় জোদ্দা বলে ঃ

'এতে আমার মহত্ত্বের তুমি এত কী পেলে জানি না। আমি তো বরং তোমাকেই মহৎ বলব, কারণ তুমি কিছুই লুকোওনি আমার কাছে।'

'যাঃ, তা কি কখনো হয়? তোমাকে যে বিয়ে করতে চলেছি, কী ক'রে লুকোব তোমার কাছ থেকে?'

'না, তা নয়। কথা হচ্ছে, তুমি যদি আমাকে না বলতে, আমি জানতেও পারতাম না। পারতাম কী? তোমার ওপর যে এই ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে একদিন, তার তো কোনো প্রমাণ নেই।'

হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে নীলু, বলে :

'প্রমাণ আছে, আর তা খুঁজে পেতে তোমার দেরীও হত না। সে সম্বন্ধে তুমি আমায় জিজ্ঞেসও নিশ্চয়ই করতে।'

'কী প্রমাণ?'

'সেই দিনের প্রমাণ। সেই ভয়াবহ দিনের স্বাক্ষর আমার দেহে আছে।'

চমকে ওঠে জোদ্দা, বলে : 'কোথায়?'

নীলু ম্লান হেসে বলে :

'অত চমকাবার কিছু নেই, ভয় পেয়ো না। কোনো এক জায়গায়। বিয়ের পরই দেখতে পাবে।'

এই ছোট্ট ঘটনাটা মনে পড়ার হয়তো বিশেষ কোনো কারণ নেই, কিন্তু ভাবতে যেন খুব ভালো লাগে, জোদ্দার। একটা আবিষ্কারের আশা, একটা বিস্ময়ের প্রতিশ্রুতি র'য়ে গেছে। আর সত্যি, এই শান্ত ও প্রায় বোবা মেয়েটার পেটের মধ্যে এত ছিল, দরকার পড়লে এত কাণ্ডও সে ক'রে উঠতে পারে? তার মনে পড়ছে আরেকটা ঘটনা।

সন্তান কে না চায়? বিশেষ ক'রে মেয়েরা, এ-পৃথিবীতে তাদের আসার সব থেকে বড় কারণটাই হ'ল এই। মা হওয়া সন্তান থাক আর না থাক, সব মেয়েই মা। সন্তান তাই নীলুও চায়—এ চাইবার অধিকারটা এতদিন বাদে আজ যখন তাকে দেওয়া হয়েছে, তার আর তর সয় না। আর শুধু নীলুই বা কেন, সন্তান জোদ্দা নিজেও চায়, অত্যন্ত বেশী ক'রেই চায়। এ তো

আর ছেলে বেলাকার প্রেম নয়, এ বুড়ো বয়সের প্রেম, ঘর বাঁধার প্রেম। তাই সন্তান। কারণ একমাত্র সন্তানের মধ্যে দিয়েই ঘর বাঁধাটা সার্থকতায় উন্নীত হ'তে পারে। জানে তা জোদ্দা, জানে নীলু।

তবু নীলুর সন্তান কামনাটা যেন জোদ্দার থেকেও আরো অনেক প্রবল, ও তার নানান আভাসও জোদ্দা পেয়েছে তাদের ছুজনের কথাবার্তায়। একদিন নীলু বলে ঃ

'মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে জানো ?

'কেন ?'

'এত বয়সে বিয়ে করছি, যদি ছেলেপিলে না হয় ?'

'দূর কত লোকের হচ্ছে।'

'কিন্তু অনেকের হয়ও না, জানো ?'

'তাদের কথা আলাদা। তোমার আমার বয়সটা কী ? ছেলে পিলে হওয়ার বয়স খুবই আছে।'

'তা বলছি না। তুমি তো মেয়েদের কথা জানো না। শুনেছি, বেশি বয়সে, অর্থাৎ আমার মতন বয়সে যারা বিয়ে করে, সে-সব মেয়েদের পক্ষে গর্ভবতী হওয়া খুব শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়।'

'আরে বাবা, অত শত আমি জানি না, এখনো ভেবে দেখিনি।

তবে দরকার পড়লে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে। এসব নিয়ে অনর্থক ভেবে মাথা খারাপ করছ কেন ?'

'না, মাথা খারাপ নয়, তবে এখন ভয়টা জাগলে হঠাৎ বড্ড দিশেহারা বোধ করতে থাকি।'

নীলুকে দেখে করুণা হয় জোদ্দার, বলে ঃ

'ভেবো না নীলু, তেমন তেমন দরকার পড়লে আমার এক বন্ধু আছে, জানো ? সে একজন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ।'

'তাই নাকি ?' অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হ'য়ে ওঠে নীলু।

'হ্যাঁ, এক রকমের বন্ধু আর কি, আলাপ-পরিচয় আছে। ওর সঙ্গে অবশ্য পড়িনি-টড়িনি, তবে আমার সহপাঠীদের অনেককেই ভালো ক'রে চেনে। সেই সূত্রেই আলাপ।'

'নামে তোমায় চিনতে পারবে?'

'খুব পারবে। কতবার দেখা হয়েছে। এই তো সেদিনও যখন কলকাতা যাই, হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। খবরা-খবর জিজ্ঞেস করলাম, আমার খবরাখবর নিল। আজকাল তো বেশ প্রতিপত্তি করছে

মিনিট খানেক চুপ থাকার পর হঠাৎ নীলু বলল:

'কী নাম ভদ্রলোকের?'

'ডাক্তার শিশির রায়। আর ওঁর ডিস্‌পেন্‌সারীটা হচ্ছে খুব সম্ভব বৈঠকখানা রোডে······হ্যাঁ হ্যাঁ, বৈঠকখানা রোডেই।'

প্রসঙ্গত কথাটা ওঠে ব'লেই বলে, নইলে তেমন কিছু ভেবে বলেনি জোদ্দা। আসলে তার মনেই হয় নি, এসব ডাক্তার-ফাক্তার নিয়ে খুব একটা তেমন কিছু ভাববার দরকার এখুনি থাকতে পারে। শিশিরের নামটা মুখে এল, ব'লে দিল···এই পর্যন্তই।

একদিন যায়, দুদিন যায়···হঠাৎ নীলু এসে জানায়, তাকে এখুনি কলকাতা যেতে হবে। কাকীমার অসুখ নাকি ভয়ানক, অশোককাকা লিখেছেন। নীলু দুদিন রইল কলকাতায়, ফিরে যখন এল, জোদ্দা জানতে চাইল:

'কাকীমা কেমন?'

'এ-বয়সে আবার কেমন? হাঁপানিতে ভুগছেন অনেক কাল ধ'রেই, তার ওপর বুকে বেদনা, এখানে বেদনা, ওখানে বেদনা, এখন তো বিছানা ছেড়ে নড়ার ক্ষমতাও নেই। মাঝে মাঝে কেবল কাশিটা বড্ড চেপে ধরে, তখন মনে হয় এই বুঝি গেলেন, এই যাত্রা শেষ। কিন্তু গেলেই ভালো, এ-কষ্ট থেকে বেঁচে যান।'

'ও, তা হ'লে কিছু হয় নি তাঁর এখনো? মানে, তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচেই আছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব বেঁচে আছেন। আসলে ওঁরা আমাকে আসতে লেখেনও নি, অসুখের খবরটা শুনে আমিই ছুট ক'রে চ'লে যাই। সারাজীবন বড্ড ঋণী তো ওঁদের কাছে। আজ এ-জগতে আমার আপনার জন বলতে ওঁরা ছাড়া আর কে আছে বল? আর অবশ্য তুমি আছ আজ, সত্যিই তো, আমার সবচেয়ে বড় আপনার জন।'

একটু চুপ ক'রে থাকার পর নীলু ব'লে ওঠে আবার:

'শোনো, একটা কথা রাখবে?'

'কী?'

'আমাকে তুমি এক্ষুণি এক্ষুণি বিয়ে ক'রে ফেল।'

'এক্ষুণি এক্ষুণি?'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'তা তো করছিই নীলু।'

'না, আরো তাড়াতাড়ি, আরো অনেক তাড়াতাড়ি। আমার ভীষণ ভয় করছে, জানো? আমার কেবলি মনে হচ্ছে, এত সুখ হয়তো আমার কপালে নেই, হয়তো শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হবে না।'

শুনে চমকে ওঠে জোদ্দা, মনে আছে। কারণ এ-ধরণের একটা আশঙ্কা, যাকে সে এ্যাদ্দিন সম্পূর্ণ অমূলক ব'লে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছে, তা তার মনেও জেগেছে বহুবার। তবে হয়তো আশঙ্কাটা তত সম্পূর্ণভাবে অমূলক নয়? কারণ সে একলাই ভাবেনি তা, নীলুও ভেবেছে, এবং নীলু সেটাকে আজ সোজাসুজি ব্যক্ত পর্যন্ত ক'রে দিল। অতএব?

জোদ্দাকে নাচানোর জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। সে তাই বিয়ের তোড়জোড়ে লেগে গেল। ভেবেচিন্তে দেখল, রেজিষ্ট্রী ম্যারেজই একমাত্র পন্থা। তাতে খরচ সব থেকে কম, বিয়েটাও হবে তাড়াতাড়ি, এবং লোকেও কিছু জানবে না আগে থেকে। কিন্তু সে-রকম বিয়ের জন্যে তো কলকাতায় যেতে হয়। অতএব চল কলকাতায়।

কলকাতায় এসে খোঁজ নিতে গিয়ে জানল, এক মাসের নোটীশ লাগবে। শুনে তো নীলু যেন অথৈ জলে পড়ল ঃ

'ও বাবা, সে একেবারেই সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয় ? কেন ?' জোদ্দা হতবম্বের মত চেয়ে থাকে।

'এক মাস, সে অনেক দেরী। আমাকে এখুনি বিয়ে করতেই হবে।'

'কিন্তু নীলু, এ যে সরকারী নিয়ম-কানুন, এ তো আমি তৈরি করিনি।'

'তাহ'লেও।' নীলু নাছোড়বান্দা।

অতএব ফিরে যাওয়া কর্মচারীটির কাছে এবং······ঘুষ-টুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা। কিন্তু একেবারে ঠিক সেইদিনই বিয়ে সম্ভব নয়, কর্মচারী স্পষ্টাস্পষ্টি বলে। দিন দশ-বারো নাকি অপেক্ষা করতেই হবে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জোদ্দা তাকায় নীলুর দিকে, যেন নীলুর মতেরই অপেক্ষা। নীলু আপন মনে কী একটা গোণাগুণতি করল, যার আদি-অন্ত কিছুই জোদ্দা বুঝল না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে শুনে গেল। শেষে নীলু বলল, খুব ভালো হয় তারা যদি আগামী সোমবারের মধ্যে বিয়ে ক'রে ফেলতে পারে! জোদ্দার সঙ্গে কর্মচারীর অবার কিছুক্ষণ ধ'রে কথা, ; শেষে কর্মচারী রাজী।

সেখান থেকে জোদ্দা ফিরে যায় তার ভবানীপুরের হোটেলে নীলু ফিরে যায় কাকীমাদের বাড়ি। এখন তাঁরা দক্ষিণ কলকাতায় এক উদ্বাস্তু কলোনীতে বাড়ি ক'রে উঠে গেছেন। বাড়িটি ছোট হ'লেও জায়গা আছে, নীলু আরো পাঁচদিন কোনোরকমে থেকে যেতে পারবে।

আশ্চর্য, তখনো এতটুকু সন্দেহ হয়নি জোদ্দার। নীলুর গোণাগুণতি দেখে ভেবেছিল, মেয়েমানুষ তো, হয়তো তিথি-টিথি মানে, বারবেলা-টারবেলা।

পরের দিন সকালে চৌরঙ্গীতে হাঁটছে, নীলুকে নিয়ে, সেখানে পড়বি তো পড় একেবারে শিশির রায়ের সামনা-সামনি।

'আরে, কবে এলেন?' ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন জোদ্দাকে উদ্দেশ ক'রে।

পরে হঠাৎ নীলুর দিকে নজর পড়তে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। এবং নীলুও একটু হেসে তাঁকে নমস্কার করল।

জোদ্দা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বলল:

'কী ব্যাপার বলুন তো, আপনারা পরস্পকে চেনেন ব'লে মনে হচ্ছে?'

'বিলক্ষণ,' ডাক্তার রায় বললেন, 'চিনি আবার না? কী বলেন মিস্ দাস?'

মিস দাস তো মাটিতে মিশে যেতে পারলে বেঁচে যায়, অন্তত তার দিকে তাকিয়ে তাই তো মনে হ'ল জোদ্দার।

'তা হ'লে, মিস্টার খাঁর সঙ্গেই…' ভদ্রলোক নীলুর দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

নীলু যেন নিরুপায় হ'য়েই একটু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

'ওঃ হো, কনগ্রাচুলেশন্স।'

'ধন্যবাদ,' আস্তে গলায় বলল জোদ্দা।

ভদ্রলোক চ'লে যেতে না-যেতেই নীলু নিজেই আরম্ভ করল। প্রথমে ক্ষমা চাওয়া, হ্যানো-ত্যানো, ইত্যাদি। কান্না, জোদ্দাকে আগে কিছু পরিষ্কার ক'রে বলে নি ব'লে। ঘটনাটি হ'ল এই: জোদ্দার কাছেই একদিন কথাচ্ছলে শিশির রায়ের নাম-ধাম সম্বন্ধেও জানতে পারে। তাই কাকীমার অসুখের দরুণ গতবার যখন কলকাতায় আসে, কী মনে ক'রে ডাক্তার রায়ের কাছে একদিন চ'লে যায়। জানায়, সে বিয়ে করতে চলেছে এতদিন বাদে এই প্রথম, কিন্তু তার আগে জেনে নিতে চায় সে বিয়ে করার যোগ্য কিনা, এবং বিশেষত, বিয়ের পরে তার সন্তান ধারণের সম্ভবনা

আছে কিনা। ডাঃ রায় নাকি তাকে খুব যত্ন সহকারে পরীক্ষা করেন, পরে জানান তার সব কিছুই অন্য যে-কোনো সাধারণ সুস্থ মেয়ের মতই—অর্থাৎ তার শরীরের ভিতরে কোনো গণ্ডগোল নেই।

'আর সন্তান সম্বন্ধে?' জোদ্দা জানতে চায়।

'সন্তান সম্বন্ধেও কোনো গণ্ডগোল হওয়ার আশঙ্কা হয়তো নেই, তবে বিয়েটা তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলতে বললেন।'

'কেন?'

'বাঃ, বয়স বাড়ছে না?'

'কিন্তু তোমার সন্তান হয়তো না হ'তেও পারে, এমন কোনো ভয় দেখিয়েছেন কি?'

'না, না নয়। একেবারেই নয়। সেরকম কোনো ভয় দেখালে সে কথা আমি তোমার নিশ্চয়ই লুকোতাম না। সিউড়িতলায় ফিরেই বলতাম।'

জোদ্দার মনটা তবু ঠিক শান্ত হ'ল না। নীলুকে গাঙ্গুলী বাগান পৌঁছে দেবার পর বিকেলের দিকে ও চ'লে গেল বৈঠকখানা রোডে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই মশাই,' শিশির রায় বললেন, 'আমি ওঁকে বেশ ভালো ক'রে পরীক্ষা করেছি। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হ'ল ভয়ঙ্কর নার্ভাস এবং যেন একটু একসেসিভ সন্তান কামনা। তবে জানেন, একদিক থেকে বলতে গেলে সেটা খুব স্বাভাবিকও এই বয়সে। ভদ্রমহিলার জীবনে সিকিওরিটির অভাব তো, তাই একটা ছেলেমেয়ে কিছু হ'লে…'

'তো সেদিকে ভয় বা ভাবনার তেমন কিছু নেই বলছেন?'

'কিচ্ছু নেই। শুধু একটা জিনিস হচ্ছে ওঁর, এবং যেটা ওঁকে স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলেওছি, সেটা হচ্ছে ঐ ফেলোপিয়ান টিউব

দুটো আছে না ? ওঁর ক্ষেত্রে ঐ টিউবগুলো একটু সংকীর্ণ হ'য়ে আসছে, এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো আরো সংকীর্ণ হ'য়ে হয়তো একদিন সম্পূর্ণ ব্লকড্ হ'য়ে যাবে। তখন আর বাচ্চা হওয়ার কোনো সম্ভবনা থাকবে না। এক যদি অবশ্য খুব ব্যয়সাধ্য অপারেশন-টপারেশন করতে রাজী থাকেন। আর এ-সব ক্ষেত্রে অপারেশন ক'রেও খুব একটা ফললাভ সচরাচর হয় না।'

'তবে ?'

'তবে আর কি ? ওঁর প্যাসেজটা ব্লকড্ হবার আগেই ওঁকে বিয়ে ক'রে ফেলতে হবে, ওঁকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গর্ভবতী হ'য়ে যেতে হবে, ব্যস।'

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'এর মানে এ-ই নয় যে আমি বলছি, ওঁর প্যাসেজ একদিন ব্লকড্ হ'য়ে যাবেই। না, তা না হ'তেও পারে। কিন্তু আবার হ'তেও পারে। এবং ওঁর ক্ষেত্রে সেই হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী, এই পর্যন্ত। বুঝলেন তো ?'

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, বাইরে জুতোর শব্দ নেই, রাখাল ফিরে এল ঘরে।

'কী, বলিনি তোদের, ঘাড়ে আরো এক গাদা কাজ চাপিয়ে দিল। হাসতে হাসতে বলল রাখাল।

'কিন্তু আমাদের কী হবে ? এত···'

'সব হবে। আমার ফিরতে একটু দেরী হ'য়ে গেল ভাই, কিছু মনে করিস না। ক'টা বাজে ? চারটে বাজতে পাঁচ। এখনো যথেষ্ট সময় আছে। চ'। আসুন মিস্ দাস।'

নীলু উঠেছিল আগেই, এবার জোদ্দাও উঠল চেয়ার ছেড়ে।

'সাক্ষী মিলেছে ?' বলল জোদ্দা।

'আগে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে দে, তবে তো মিলবে। এতক্ষণ তো কর্তার ঘরের মধ্যেই বন্ধ হ'য়ে ছিলাম। হ্যাঁ, ওঁদের কোনো খবর পেলি?'

'কাদের?'

'সৌরেন সেন আর মণ্টুবাবুর?'

'না, একদম না।'

'আশ্চর্য। যাকগে, ভাবিস নে। সাক্ষী তোদের জুটিয়ে দিচ্ছি। ছুটো সাক্ষী বই তো নয়?'

'হ্যাঁ, দুজন মাত্র। কিন্তু জুটবে তো ভাই?'

'আলবৎ জুটবে। এক্ষুণি জুটবে।' ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল রাখাল।

নীলুর দিকে চেয়ে দেখে জোদ্দা, তার ঠোঁটের কোণে সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু এখনো লেগে রয়েছে। জোদ্দার ভিতরটাও যেন হঠাৎ হাস্যময় হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল তার, তার ভিতর থেকেও যেন কেউ বলছেঃ 'জুটবে না? আলবৎ জুটবে। এক্ষুণি জুটবে।'

ছয় ॥ শেষ মানে পথ

ওদের তো খুব একটা উৎসাহ দেখিয়ে নিয়ে চলল, কিন্তু যাবে কোথায়? ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মনে হ'ল রাখালের, এ কী ঝামেলা বল তো। বেশ হয়েছে, তার পাপের শাস্তি হয়েছে। আজ সে বড্ড একলা-একলা থাকতে চেয়েছিল, বড্ড ফাঁকি দিয়েছে কাজে। এখনো ঠেলা সামলাও। মণ্টুবাবুই ওস্তাদ, আপিস থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু রাখালও তো তা করতে পারত, হয়তো তা-ই তার করা উচিত ছিল। ব্যস, ছোট কর্তার ঘর থেকে সটাং রাস্তায়, রাস্তা থেকে ট্রামে, ট্রাম থেকে নেমে বাড়িতে ধরছে কে? অন্তত আপিসে তো কেউ-ই নয়। মাঝে মাঝে ওদের এমনি বেরিয়ে যেতেও হয় হঠাৎ-হঠাৎ। কাজে যাচ্ছে, না অকাজে যাচ্ছে, না নিজের কাজে যাচ্ছে, না কোনো কাজেই নয়, হঠাৎ একটু ইচ্ছে হ'ল, তাই সিনেমা দেখতে চ'লে গেল, তা-ই বা জিজ্ঞেস করছে কে? আর যদি কোনো তলব পড়েই ইতিমধ্যে তো কাল সকালে এসে বললেই হ'ত, কাজে বেরিয়েছিলাম। তা' নয়, আবার এই ঘরে ফিরে এসে এ-দুটির সম্মুখীন হওয়া। চলে যেতে পারলে কিন্তু মন্দ হত না, বেশ হত। সময়ে আপিস বন্ধ হ'য়ে যেত, আর তা দেখে যদি জোদ্দা জানতে চাইত রাখাল কোথায়, রাখাল ফিরছে না কেন, তো শ্রীনিবাস—ও, শ্রীনিবাস তো নেই, কিন্তু ততক্ষণে হয়তো ফিরে আসত, আর না ফিরে আসলেও কৃষ্ণধন তো থাকতই —কৃষ্ণধন জোদ্দাকে ব'লে দিত রাখালবাবু বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন? নিশ্চয়ই কোনো জরুরী কাজ পড়েছে। এরা খুব শেখানো পড়ানো ছেলে এখানকার, বিশেষত কৃষ্ণধনের মত ছেলে। মুখ তো নয়, যেন সব সময় খই ফোটাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক

আগে এ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটা নিয়ে কী ভেলকিবাজীটাই দেখিয়ে গেল। আর, একবার বাড়ি ফিরতে পারলে তখন তো আর জোদ্দা ধাওয়া করতে পারত না সেখানে। ধাওয়া করবে কী ক'রে? ঠিকানাই জানে না।

অবশ্য বাড়ি না ফিরলেও ছোট কর্তার ঘরেই না হয় আরো খানিকক্ষণ ব'সে থাকা যেত, এটা-ওটা নানা প্রসঙ্গ পেড়ে। পরে সাড়ে চারটে নাগাদ গজেন্দ্র গমনে ঘরে ফিরে আসা। ততক্ষণে এদেরও সময় ফুরিয়ে যেত, এবং রাখালেরও করার কিছুই থাকত না। 'বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে ভাই, এখন কী করি বল, আপিসের সময়, বুঝতেই পারছিস,' মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেই হত। অবশ্য, এটাও একটা প্রশ্ন, ছোট কর্তা খামাখা তাকে ঘরে ব'সে থাকতে দেবেন কেন? ডেকেছিলেন কাজের কথা বলতে, কথা ফুরিয়েছে, চ'লে এসেছে রাখাল।

কিন্তু এ কী অমানুষিক সব ভাবনা ভাবছে রাখাল, নিজের ওপর ঘেন্না ধরে না তার? একটা বাল্যবন্ধুর সঙ্গে এত যুগ ব্যবধানে আজ এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দেখা, আর সে এসেছে এমনি প্রচণ্ড একটা দায়ে প'ড়ে। শুধু সে-ই নয়, তার প্রেয়সীও সঙ্গে রয়েছে। মেয়েটার মুখটা মনে পড়ল, আর ঐ অদ্ভুত সলজ্জ হাসিটি তার। এই তো এখুনি হাতে হাত লেগে গেল, ঘর থেকে বেরোবার সময় স্প্রিং-আঁটা দরজাটা খুলে ধ'রে রাখতে গিয়ে। না, মণ্টুবাবু যা করেছেন, তা অমানুষিক—সে-রকম কিছু রাখাল তার বাল্যবন্ধুর সঙ্গে করতে পারবে না। নিজেকে অতটা সে কিছুতে নামাবে না। আর নামাতে চাইবেই বা কোন মুখে? সে কি নিজেই আশ্বাস দেয়নি ওদের, একেবারে যেচে গায়ে প'ড়ে? এসব আদিখ্যেতার কোনো দরকার ছিল না।

না, আশ্বাস দিয়েছে, বেশ করেছে। বন্ধু বিপদে প'ড়ে সহায্য চেয়েছে, এবং রাখাল সেই সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি

জোদ্দাকে দিয়েছে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায় নি। বরং সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়াটারই দরকার ছিল তার, নইলে সে মানুষ কেন? নইলে বন্ধু ব'লে কাউকে গ্রহণ করার সাধ কেন তার? সবই মানা গেল, তবুও অস্বস্তির ভাবটা কিছুতেই যায় না। এই যে খুব একটা উৎফুল্লের ভাব নিয়ে ওদের সঙ্গে ক'রে বেরোল, ওরা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত ওর মনের আসল কথাটি কী তো কী ভাবত ওরা? কিন্তু আবার এই অস্বস্তিটাও সব নয়, তা নয় তার জটিল মনের একমাত্র কথাটি। আসলে সে জোদ্দাদের সাহায্যও করতে চায়, সত্যিই করতে চায়, এমন কি সাহায্য করতে পারলে বেঁচে যায়, তাতে সে নিজেকে নিয়ে পরে গর্ব অনুভব করতে পারে। শুধু যদি, কোনো রকমে নিজে এই ব্যাপারের মধ্যে ঢুকে না প'ড়ে অন্য কাউকে ঢুকিয়ে দিতে পারত। তাতে একদিকে যেমন বন্ধুর কাছে নিজের মানটাও রক্ষা হয়, অন্যদিকে সাক্ষী-ফাক্ষী দিয়ে নিজেকেও জড়ায় না। এবং সেই চেষ্টাই করছে সে।

'কার কাছে যাবি কিছু ঠিক করেছিস?' জোদ্দা বলল ঘরের বাইরে উঠোনে পা দিয়েই।

তবে কি রাখালের মনের কথাটা জোদ্দা খানিকটা আঁচ করতে পেরেছে না কি?

'দেখি চল, আগে যাওয়া যাক পি-আর-ও'র কাছে।'

মুখে এল, ব'লে ফেলল। ব'লেই মনে হ'ল, বাঃ, বেশ বলেছে তো, অর্ধেন্দুবাবুই হবেন খাসা লোক এসব ব্যাপারে। কারণ প্রথমত, তিনি পি-আর-ও, এখানকার সকলকে ভালো ক'রে চেনেন। দ্বিতীয়ত, কাজে অকাজে এখানে বাইরে থেকে নিত্যই আসছে যারা, তাদের সাহায্য করা তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ। অবশ্য, জোদ্দা ইনকাম-ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসে নি, তা সত্যি। কিন্তু তাতেই বা কী? সে একজন বাইরের লোক, কিছু সাহায্য চেয়ে এসে পড়েছে এই আপিসে, নয় কি? আর তা যদি

হয় তো পি-আর-ও'র কাছেই জোদ্দাকে নিয়ে যাওয়ার দরকার প্রথমেই। এবং বলা যায় না, জোদ্দাকে ও তার প্রেয়সীকে এই অবস্থায় দেখলে অর্ধেন্দুবাবু হয়তো কোনো সমাধান বাতলে দিতে পারবেন এক্ষুণি-এক্ষুণি। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই পারবেন। অন্তত সেই আশা নিয়েই তো যাওয়া তাঁর কাছে। এবং, আরো একটা কথা, যদি অর্ধেন্দুবাবু ছুটো সাক্ষী যোগাড় ক'রে দেন, আর তা' তিনি নিশ্চয়ই পারবেন, অতি সহজেই পারবেন, তখন সেই দুজন সাক্ষী হবে অর্ধেন্দুবাবুর নিজেরই যোগাড় ক'রে দেওয়া লোক, রাখালের নয়, অর্থাৎ এ-ব্যাপারে রাখালের সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হবার পক্ষে এমন পন্থা আর নেই। কারণ, বলা তো যায় না, বিয়েটা হওয়ার পরেও হয়তো কেঁচে যেতে পারে, এর মধ্যে জটিল কোনো গণ্ডগোল থাকতে পারে, আর তখন যারা সাক্ষী দিয়েছিল এই বিয়েতে, তাদের হয়তো আদালতে একদিন তলব পড়তে পারে। আর সেই সাক্ষীদের মধ্যে যদি এ-আপিসের কেউ থাকে তো তার চাকরি নিয়ে হয়তো সে-সময় টানাটানি পড়তে পারে। তখন? না বাবা, সাক্ষী-ফাক্ষী দেওয়ার জন্যে রাখাল নিজে থেকে এ-আপিসের কাউকে জোর ক'রে পাঠাবে না। কারণ রাখাল যদি সে-রকম কোনো সাক্ষী পাঠায় এবং পরে যদি সেই সাক্ষীর চাকরী নিয়ে কোনো গোলমাল বাঁধে তো সে-সা[illegible] কি দরকার পড়লে বলবে না, 'না মশাই, আমি এ-সবের কিছুই জানতাম না, রাখালবাবুর কথা শুনে সাক্ষী দিতে যাই, ভদ্রলোক নাকি রাখালবাবুর বাল্যবন্ধু?' তখন রাখালের নিজের চাকরি নিয়েই কি টানাটানি পড়বে না? যেটা ও এমন প্রাণপণে এড়াতে চেয়েছিল, এত সত্বেও ঠিক সেইটাই ঘ'টে যাবে না? কিন্তু রাখাল না হ'য়ে যদি অর্ধেন্দুবাবু পাঠান সেই সাক্ষী তো রাখালেব লটকে পড়ার কোনো আশংকাই থাকবে না [illegible]ার। এমন স্বার্থপরের মত চিন্তা করা পিশাচোচিত, জানে তা রাখাল। কিন্তু এ-জগতে কেই

বা পিশাচ নয়? সকলকেই যে খেটে খেতে হবে, আগে নিজে বাঁচতে হবে। বন্ধুর প্রতি তার দরদ কিছু কম নয়, কিন্তু সে-দরদ দেখাবার অবকাশটা কি জগত দেয় একবারের জন্যেও?

'পি-আর-ও মানে?' প্রশ্ন করল জোদ্দা।

'অর্ধেন্দুবাবু, অর্ধেন্দু সরকার। আমাদের পাব্‌লিক রিলেশন্স অফিসার।'

'ও।'

উঠোনে বেরিয়ে দেখে, রোদের তেজটা ইতিমধ্যেই অনেকটা কম। এবং কেমন যেন মেঘ মেঘও করছে। ভালো ক'রে তাকাতে গিয়ে দেখে সত্যিই, একটা প্রকাণ্ড কালো মেঘ আকাশের বেশ খানিকটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। অতএব সন্ধের দিকে প্রচণ্ড ঝড় একটা উঠবে। আশা করা যায়। ঝড় ওঠা তো স্বাভাবিকই, যা সাংঘাতিক গরম পড়েছিল কয়েকদিন ধ'রে।

চত্বরটায় অনেক লোক, বেশির ভাগই বাইরের লোক। কারুর মাথায় পাগড়ি, কারুর হাতে লাঠি, কেউ বা ছাতা হাতে করে এসেছে রিটার্নস সাবমিট করতে, কি অন্য কোনো কাজে। আসুক গে, এত লোক আর দেখা যায় না এই আপিসে। কী দরকার এই সব ট্যাক্স-ফ্যাক্স নিয়ে লোককে ব্যতিব্যস্ত করার? কিন্তু ট্যাক্স উঠিয়ে দিলে আপিসটাও তো উঠে যাবে। তখন রাখাল চাকরি করবে কোথায়, তার সংসারে ভাত জোটাবে কে?

'ওঃ, একটা ভুল হয়ে গেল যে।' হঠাৎ জোদ্দা ব'লে উঠল।

'কী?'

'মণ্টুবাবু যদি এসে পড়েন?

'আর এসেছেন। সে-আশা ছেড়ে দে।'

'না, আশা নয়, কিন্তু ধর যদি এসেই পড়েন?'

'তো তাতেই বা কী? তুই তো 'তোর সাক্ষী আগেই পেয়ে যাচ্ছিস।'

'না, তবু একটা খবর তো দেওয়া উচিত তাঁকে। ধর ওঁর জন্য যদি একটা নোট লিখে রেখে আসি?'

'তাতে তোর সুবিধেটা কী হচ্ছে তো বুঝতে পারছি না।'

'না, ভদ্রলোক ফিরে এসে খামাখা ভাববেন······'

'আরে, ভদ্রলোক তোকে আসতে ব'লে এমন নাজেহাল ক'রে ছাড়লেন, আর তুই এখনো ভাবছিস তাঁর জন্যে?

'তা সত্যি। কিন্তু নাজেহাল হয়তো ইচ্ছে ক'রে করেন নি, হয়তো তাঁর বেরিয়ে না প'ড়ে উপায় ছিল না। ভেতরের ব্যাপারটা যে কী হয়েছে, তা তো ঠিক জানি না, বিচার করি কী ক'রে বল? আর ভদ্রলোককে জানি এত ভালো ক'রে, তিনি যে ইচ্ছে ক'রে আমাদের এমন একটা বিপদে ফেলবেন···'

'তো কী করতে চাস এখন?'

'ভাবছিলাম, যদি ওঁর জন্যে ছোট্ট দু লাইন লিখে রেখে আসি ওঁর টেবিলের ওপর।'

'তো বেশ যা না, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।'

'একলাই যাব? তুইও চল না। আপিসের ব্যাপার ভাই, একলা ঘরে আমাকে প্যাড-ফ্যাড নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে কেউ যদি আবার কিছু বলে···'

'আচ্ছা চল।' কেমন একটু অনিচ্ছার সুরে বলল রাখাল।

'নীলু, তুমি আসবে? না এখানেই দাঁড়াবে একটু? আমরা যাব আর আসব।

নীলু অসহায়ের মত একবার তাকাল জোদ্দার দিকে।

'তুমি তবে এখানেই দাঁড়াও একটু, হ্যাঁ?' বলল জোদ্দা।

ঘরে ফিরে যেতে যেতে মনে হ'ল রাখালের, সত্যিই এটা কি আশ্চর্য নয় যে মেয়েটার সঙ্গে কিছুতেই তাকে একটু একলা থাকতে দেবে না জোদ্দা? পাছে সে কিছু বা··· ক'রে ফেলে মেয়েটার কাছ থেকে, পাছে মেয়েটা একটা বেফাঁস কোনো কথা ব'লে ফেলে,

হয়তো জোদ্দার ভয়টা এই। রাখালের ভারী, বয়েই গেল তাদের ভেতরের কথা জানার জন্যে। তবু জানতে পারলে মন্দ হত না, কেন এই ঘুষ-টুষ দিয়ে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা। অবশ্য সে-ধরনের যদি কিছু থাকেই, যা রাখাল আঁচ করছে—আর এতে এত আঁচ করার আছেই বা কী, এ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?—তো মেয়েটা কি বলবে সেই কথা? বলে জোদ্দা নিজেই চেপে যাচ্ছে, আর এটা তো একটা মেয়ে। এসব কথা সে কী ক'রে বলবে? আর এমনিতেই তো কথা ব'লে উল্টে গেল কন্যা, এসে এস্তোক টু শব্দটি করে নি। কে জানে, হয়তো সেটাও একটা কারণ। হয়তো তার সঙ্গে একটু একলা থাকলে রাখাল অচিরেই ধ'রে ফেলতে পারত যে মেয়েটা কথা বলতে পারে না। যতই সে এটা-ওটা প্রশ্ন করে, মেয়েটা ততই বোকার মত চুপ ক'রে থাকে, আর ততই তারও মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। হ্যাঁ, হয়েছে, হয়তো এই কারণেই মেয়েটাকে তার কাছে একলা রেখে কিছুতে এল না জোদ্দা। যাকগে মরুকগে, জেনে কী দরকার তার, মেয়েটা কথা বলতে পারে কি না পারে? এখন তোমরা কোনোরকমে দুটো সাক্ষী যোগাড় ক'রে ফেল এবং ভালোয়-ভালোয় এখান থেকে বিদেয় হও, রাখালকে নিস্তার দাও, এই একমাত্র কামনা রাখালের।

আর সেই সাক্ষীর ব্যাপারে, যখন সব প্রায় ঠিক হ'য়ে আসতে চলেছে, এত খেটে-খুটে তার মহামূল্য সময় নষ্ট ক'রে রাখাল তোমাদের জন্যে সাক্ষীর ধান্দায় অবশেষে বেরিয়েছে, তখন তোমার হঠাৎ দরকার পড়ল মণ্টুবাবুর জন্যে নোট লেখার। এদিকে তাড়া-তাড়া ক'রে লোকটা রাখালের মাথাটা তো প্রায় খারাপ ক'রে এনেছিল বললেই হয়, আর এখন যখন ইচ্ছে ক'রে সময় নষ্ট করছে, তার বেলা? গা জ্বলে যায় কাণ্ড কারখানা দেখে। এসেই যদি কোনো ভনিতা না ক'রে সোজাসুজি বলত, ছাখ, আমি

বিয়ে করতে যাচ্ছি, আমার প্রেয়সী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তুজন সাক্ষী চাই, তো কত আগে রাখাল সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলতে পারত, এতক্ষণে বর-বধূ হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় তোমরা ঘুরে বেড়াতে পারতে, আর রাখালও তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচত। অবশ্য রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা একটা কথার কথা, তুপুরে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে কেউ মজা মেরে বেড়ায় না, কিন্তু এতক্ষণে বিয়ে থা হ'য়ে গিয়ে অন্য কিছু তো করতে পারতে এই ইনকাম ট্যাক্স আপিসে ব'সে ব'সে রাখালের সময় নষ্ট করার বদলে।

তবে এটাও ঠিক, জোদ্দা যে তার বাল্যবন্ধু সেটা আবিষ্কার করতে সময় লাগতই, এবং সেই আবিষ্কারের দরকারও ছিল। নইলে রাখালই কি এত সহজে রাজি হত ওদের জন্যে কিছু করতে। না, দেরী যা হ'য়ে গেছে, তা হ'য়ে গেছে, তার জন্যে জোদ্দাকে সে দোষী করে না, নিজেকেও দোষী করে না রাখাল। দোষ যদি কারুর থেকেই থাকে তো তা মণ্টুবাবুর, কিন্তু তিনি তো পালিয়ে বেঁচেছেন। এদিকে এখন দেরী হ'য়ে গেছে, খুবই দেরী হ'য়ে গেছে, সাক্ষী যদি পেতে হয় তো এখুনি পেতে হবে। এবং রাখাল সত্যিই চায় যে ওরা সাক্ষী পাক, আর সেই সাক্ষী পাওয়ার ব্যাপারে যতটুকু সাহায্য দরকার তা রাখাল করতে প্রস্তুত। প্রস্তুত না হ'য়েই বা তার উপায় কী ?

হঠাৎ রাখালের ভিতরটা বিদ্রোহ ক'রে উঠল, ধোৎ নিকুচি করেছে, জোদ্দার কথায় সে কেন এত উঠবে-বসবে, এটা তার আপিস নয় ? এই সৌরেন সেনকে ফোন কর, এই তার জন্যে তুটো সাক্ষী যোগাড় ক'রে দাও, এই সে মণ্টুবাবুর জন্যে একটা নোট লিখতে চায়, অতএব তুমি চল তার পিছন-পিছন, এই এটা কর, এই সেটা কর, কেন রাখাল মুখ বুঁজে এই সব সহ্য ক'রে যাচ্ছে ? তোমাদের যা খুশী কর, বিয়ে করতে হয় কর, না করতে

হয় না কর, সাক্ষী পেতে হয় পাও, না পেতে হয় না পাও, কিন্তু এভাবে রাখালকে খামাখা অতিষ্ঠ ক'রে তোল কেন ?

কিন্তু প্রথম থেকেই দোষ তো জোদ্দার নয়, দোষ রাখালেরই। সে কেন তখন জোদ্দাকে জোর ক'রে সিঁড়ি থেকে ফিরিয়ে আনল, এটা-ওটা জানতে চাইল, এত আগ্রহ দেখাল ?

'কী, হয়েছে লেখা ? রামায়ণ-মহাভারত লিখছিস না কি রে ?' না থাকতে পেরে ব'লে উঠল রাখাল।

'হ্যাঁ, হ'য়ে গেছে। দু লাইন তো লিখলাম, তাতেই এত তাড়া দিচ্ছিস ?'

'তাড়া তো আমার নয়, তোদেরই। দুলাইন কেন, লিখতে ইচ্ছে হয় তো দু হাজার লাইনই লেখ না ব'সে ব'সে, আমার কী ?'

'চল, হ'য়ে গেছে।'

চিঠিটা ভাঁজ ক'রে মণ্টুবাবুর টেবিলের ওপর রাখাল জোদ্দা, মাঝখানে ছাইদানিটা চাপা দিল, যাতে উড়ে না যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নীলুর কাছে। সত্যি, কীযে পেল জোদ্দা এই মেয়েটার মধ্যে, কে জানে। দেখতে অবশ্য মন্দ নয়, হাসিটা তো খুবই সুন্দর। কিন্তু এর সঙ্গে যদি ঘণ্টা খানেক একলা ব'সে থাকতে হয়, তবেই তো গেছি। শুধু হাসি দেখে তো আর বাঁচা যায় না, মাঝে মাঝে বউ-এর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে যায় মানুষের। কে জানে, হয়তো বোবা-টোবা কিছুই নয়, শুধু অতি মাত্রায় লাজুক, হয়তো জোদ্দার সঙ্গে কথা ঠিকই বলে। তা ছাড়া বোবা হোক না হোক, লাজুক হোক না হোক, কী আসে যায়। এই বয়সে বিয়ে করতে পারছে, জোদ্দার পক্ষে হয়তো সেইটাই যথেষ্ট। নেই মামার চেয়ে কানামামা ভালো। কিন্তু এই সব কানামামা-ফানামামা বলারই বা দরকারটা কী ? রাখাল তো কিছুই জানে না মেয়েটার সম্বন্ধে। হয়তো সব দিক থেকেই

মেয়েটা খুবই ভালো। তা-ই যেন হয়, তার বন্ধুর হ'য়ে অন্ততঃ এই আশাটুকু করুক রাখাল।

বাইরের দালান দিয়ে বেশ খানিকটা গেলে আরেকটা বড় গেট পড়ে, আর তার ঠিক সামনেই পাবলিক রিলেসনস্ অফিসারের ঘরটার উদ্দেশ্যে লাল কালিতে আঁকা একটা প্রকাণ্ড তীর মারা আছে। লোকেও তাই ছোটে তীর বেগে সেই দিকে, এখনো ছুটছে। ক্লার্ক টাইপিস্টদের পাশ কাটিয়ে পার্টিশনটা ভেদ ক'রে সোজা অর্দ্ধেন্দু-বাবুর ঘরে ঢুকে পড়ল রাখাল ওদের নিয়ে। ঢুকে দেখে, অর্দ্ধেন্দু-বাবুর সামনে একজন বাইরের লোক দাঁড়িয়ে আছে। এবং অর্দ্ধেন্দু-বাবুর পিছনে, দেওয়ালে একটু ওপরের দিকে, এখনো টাঙানো রয়েছে সেই হাস্যকর বচনটি। যতবার অর্দ্ধেন্দুবাবুর ঘরে এসেছে, লেখাটা প'ড়ে প্রতিবারই রাখালের হাসি পেয়েছে। মোটা কাগজের ওপর হাত দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা, ও পিন দিয়ে আঁটা দেওয়ালের গায়। লেখা ইংরাজীতে, যার বাংলা করলে দাঁড়াবে ঃ

হও ষাঁড়ের মত ধৈর্যশীল,

হও সিংহের মত সাহসী,

হও মৌমাছির মত তৎপর

এবং পাখির মত প্রফুল্ল।

'কী মশাই, পথ ভুলে যে ? আসুন আসুন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন অর্দ্ধেন্দুবাবু।

'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।'

'দয়া ক'রে করুন। সব্বাই করছে, আপনিই বা বাদ যান কেন ?

'ইনি হচ্ছেন······'

'এক মিনিট স্যার,' রাখালকে থামিয়ে বললেন অর্দ্ধেন্দুবাবু। পরে হাঁক দিলেন ঃ

'ধীরেন।'

কেরাণী ধীরেনের প্রবেশ।

'ধীরেন,' পরে বাইরের ভদ্রলোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'এ ভদ্রলোককে আমার ঘরে কেন ঢুকিয়েছ ?'

'আজ্ঞে স্যার,' মুখ কাঁচুমাচু করে বলল ধীরেন, 'উনি পি-আর-ওর সঙ্গেই দেখা করতে চান বললেন ব'লেই তো…'

'যে কেউ পি-আর-ও'র সঙ্গে দেখা করতে চায় বললেই তাকে হুট ক'রে এখানে ঢুকতে দিতে হবে ?'

যাঁকে নিয়ে এত প্রশ্ন, বোঝাই যাচ্ছে সে ভদ্রলোক অন্তত অপ্রস্তুত বোধ করছেন। তিনি ব'লে উঠলেন ঃ

'মাপ করবেন মশাই, আমি বাইরের লোক, অত জানি না। আপনার আপিসে খবরটা পাওয়া যায় শুনেই…'

'No no, it's none of your fault, আমার কেরানীরই দোষ। রিটার্ণ সাবমিট করেছেন, এখন কত ট্যাক্স দেবেন তা ক্যালকুলেট ক'রে এরাই ব'লে দেবে। এটা একটা রুটিন ম্যাটার ধীরেন, এর জন্যে I need not to be disturbed।'

ভদ্রলোককে নিয়ে ধীরেনের প্রস্থান।

'কী, কর্তার মেজাজ যে একেবারে সপ্তমে চ'ড়ে আছে দেখছি।' রাখাল বলল।

'আরে মশাই, বলেন কেন। একেবারে অতিষ্ঠ হবার যোগাড়। যাকগে, কী খবর বলুন।'

'আগে আলাপ করিয়ে দিই। জোদ্দা, ইনিই হচ্ছেন অর্দ্ধেন্দু-বাবু, আমাদের পাবলিক রিলেশন্‌স অফিসার। আর ওঁরা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত জরদ্রথ খাঁ, আমার বাল্যবন্ধু, আর ইনি মিস দাস।'

'বসুন বসুন। ও, ঐ লেখাটা নিয়ে আপনি আবার একটা ঠাট্টা করবার মতলব আঁটছেন তো ?'

অর্দ্ধেন্দুবাবুর শেষের প্রশ্নটি রাখালকে উদ্দেশ্য ক'রে। অনিচ্ছা সত্বেও রাখালের চোখটা আবার এখুনি ঐ ষাঁড়ের বচনটার দিকে চ'লে গিয়েছিল।

'আরে না-না, ষাঁড়-ফাঁড় নীয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়, শেষে রাস্তায় পেলে একদিন গুঁতিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ, যা বলেছেন। অন্তত আধুনিক কবিদের থেকে ষাঁড় জিনিসটা অনেক শ্রেয় ?'

রাখাল জানে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর এ-উক্তিটি তার কাব্য প্রচেষ্টার ওপর একটি তির্যক কটাক্ষপাত, এ-রকম ঠাট্টা তিনি আগেও বহুবার করেছেন।

'কী, কবিতার বইটার কদ্দুর ?' আবায় প্রশ্ন অর্দ্ধেন্দুবাবুর।

'তুই কবিতা লিখিস নাকি ?' হঠাৎ জোদ্দা ব'লে উঠল।

'ঐ হ'ল আর কি,' রাখাল কী বলবে ভেবে পায় না।

'লেখে না মানে ?' হাসতে হাসতে বলে অর্দ্ধেন্দুবাবু, 'বিখ্যাত কবি, ডাকসাইটে কবি মশাই, জানতেন না এ্যাদ্দিন ? কী রকম বাল্যবন্ধু আপনি ?'

'ওঁর কথায় বিশ্বাস করিস নে', বলল রাখাল একটু সঙ্কোচের সঙ্গে, 'হ্যাঁ, কবিতা লিখি, অন্তত লেখবার চেষ্টা করি খুব। দুয়েকটা ছাপাও হয়েছে এখানে-ওখানে, ঐ পর্যন্তই।'

জোদ্দার দিকে তাকিয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু বললেন ঃ

'আমি তো মশাই ভেবেই পাই নে, লোকে কী ক'রে কবিতা লেখে, বিশেষ ক'রে এই কলকাতা সহরে বাস ক'রে, এই ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ ক'রে। কবিতা লেখেনই বা কী দিয়ে ?'

'কেন,' হাসিচ্ছলে রাখাল বলল, 'কবিতার যে-আদি বক্তব্য একদিন ছিল, আজও তাই আছে। বিষয় সেই একই মানুষেরই প্রেম। আমার বেদনাটাকে তোমার ক'রে তোলা, তোমার আনন্দাকে আমার ক'রে তোলা। এই লেনদেনেই তো সাহিত্য বেঁচে আছে, আমরাও বেঁচে আছি। যাক গে, বড় বড় কথা আওড়াতে আসিনি এখানে, এখানে, একটা ভীষণ তাড়ায় প'ড়ে এসেছি ভাই।'

'বেশ তো, ব'লে ফেলুন। আর আগে একটু চা হ'য়ে যাক? রাখালও জোদ্দাদের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন অর্দ্ধেন্দুবাবু।

'না ভাই, তার একেবারে সময় নেই। আর এঁরা এখুনি আমার ঘরে চা খেয়ে আসছেন। যাক, যা বলছিলাম। এই এঁদের দেখছেন তো, এঁরা এখুনি বিয়ে করতে চলেছেন।'

'কার বিয়ে?' একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন অর্দ্ধেন্দুবাবু। এঁর না ওঁর, না এঁর সঙ্গে ওঁর?'

'এঁর সঙ্গে ওঁর। এখন মুস্কিল হয়েছে, এখুনি-এখুনি দু'জন সাক্ষী চাই।

'সাক্ষী? এ কি রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ না কি?'

'হ্যাঁ, এই তো রাইটার্স বিল্ডিং-এ, এখুনি যাবে আর আসবে।'

'তো সেই দুজন সাক্ষী এখান থেকেই চাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কার কাছে যাই ঠিক ভেবে পেলাম না। আপনার কথা মনে হ'ল তাই চলে এলাম।'

'বেশ করেছেন, বেশ করেছেন,' অর্দ্ধেন্দুবাবু ইতিমধ্যেই একটু গম্ভীর হ'য়ে গেছেন। তা ভাই আমার যাওয়া তো frankly out of the question। পি-আর-ও টি-আর-ও ব'লে আপনারা তো আমাকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে বসিয়ে রেখেছেন এখানে। পূজারীর মিছিলের অন্ত নেই, আমি কী ক'রে নড়ি বলুন?'

'না-না, আপনার নড়তে হবে না। শুধু, আপনি তো চেনেন সকলকেই এখানে, সকলের সঙ্গে আপনার অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্ক। তাই ভাবছিলাম, যদি দুটি লোককে শুধু আপনি কোনো রকমে যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।'

'ও, এই কথা। তা তো খুবই সম্ভব।'

মেঘ কেটে গেছে অর্দ্ধেন্দুবাবুর মুখ থেকে। ভদ্রলোকের টাকটা চকচক করছে, হয়তো এখনো চুলের আশা রেখে জবাকুসুম-টবাকুসুম

মেখেই চলেছেন। কালো ফ্রেমের চশমাটা নধরকান্তি গৌরবর্ণ মুখে মন্দ দেখাচ্ছে না।

'বিলক্ষণ', আবার বললেন অর্ধেন্দুবাবু। 'তা আপনার নিজের কী হ'ল, আপনি যেতে পারেন না?'

এই মরেছে, এ তো মহা ছ্যাঁচড়া লোক রে বাবা। তাড়াতাড়ি বলল রাখাল:

'আজ্ঞে আমি নিজেই তো যাব ঠিক করেছিলাম। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল এখুনি একটা কাজে বেরোনোর কথা আছে। তার ওপর ছোটকর্তা খানিকক্ষণ আগে ডেকে আরো কতকগুলো আর্জেন্ট কাজ ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।'

অর্ধেন্দুবাবু এমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন যে সে-দৃষ্টিটা রাখালের একেবারেই পছন্দ হ'ল না। কে জানে, হয়তো ধ'রে ফেলেছেন ভদ্রলোক রাখালের ভিতরের কথাটা। বললেন:

'কে, সান্ন্যাল? ওর কথা এত গায়ে মাখেন কেন? ওটা একটা ছ্যাবলা। সে-কাজ কালও করতে পারেন। না?'

'কী করি বলুন, loss is loss। তো যোগাড় ক'রে দেবেন দুটি লোক? এদের আবার বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।'

'দেখি দাঁড়ান। আচ্ছা, ২২৯-এর 'এ'-তে চ'লে যান না, ঐ ফর্ম-টর্ম বিলি করার ঘরটায়? ও-ঘরে এক গাদা লোক, জরুরি বিশেষ কিছু করার নেই। রমাপদর সঙ্গে আমার নাম ক'রে দেখা করুন, ছেলেটা ভালো, আমার সঙ্গে খাতির আছে। বলেন তো একটা ফোন পর্যন্ত ক'রে দিতে পারি।'

'দিন না দাদা। রমাপদর সঙ্গে অবশ্য আমারও খাতির আছে, তবে আপনি একটু ব'লে দিলে সুবিধে হয়।'

ফোনটা ধ'রে রমাপদর এক্সটেনশনটা চাইলেন অর্ধেন্দুবাবু; পরে ফোন নামিয়ে রেখে বললেন:

'engaged, তো আপনারা ওপরে চ'লে যান, ইতিমধ্যে

আমি ফোন ক'রে দিচ্ছি। কী নাম যেন বললেন আপনাদের?'

'আজ্ঞে আমার নাম জয়দ্রথ খাঁ, আর ইনি নীলাঞ্জনা দাস।' জোদ্দা বলল আগ্রহান্বিত হ'য়ে।

'করেন কী? অবশ্য তা বলবার দরকার নেই। এমনি কৌতূহল হ'ল, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'আজ্ঞে আমরা দুজনেই শিক্ষকতা করি।'

'বাঃ, দুজনেই চাকরী করেন? তো বিয়ে করলেই তো আয় ডবল হ'য়ে যাবে, ট্যাক্সের হারটাও বেড়ে যাবে।'

রাখালের ইচ্ছে হ'ল বলে, ওরা মফস্বলে ইস্কুল মাস্টারি করে, কতই বা পায়, সামান্যই। হয়তো বিয়ে-টিয়ে করার পর দুজনের মিলিত আয় সেটা আয়করাধীন হ'লেও হ'তে পারে। পরে ভাবল, কী দরকার, এসব অধেন্দুবাবুকে জানিয়ে কী হবে?

'চল উঠি, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।' জোদ্দা রাখালকে তাড়া দিল।

'চল, আচ্ছা নমস্কার অর্ধেন্দুবাবু ও অজস্র ধন্যবাদ।'

'আমি নিজে যেতে পারলাম না ব'লে কিন্তু দয়া ক'রে কিছু মনে করবেন না। মনে মনে আমার সমস্ত সহানুভূতি ও শুভ কামনা রইল। আমার আন্তরিক সচন্দনমাল্য-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।'

মনে হ'ল এক চাপা কৌতুকে ভদ্রলোকের মুখ উদ্ভাসিত।

সিঁড়ি ধরল ওপরে ওঠার। তিন তলায় ২২৯-এর 'এ' ঘরটা। দালানে ভিড়, দেয়ালে পানের পিক। বহু লোকের ঘামের গন্ধে ভিতরের বদ্ধ হাওয়া জমজমাট। রমাপদ ছেলেটা ভালো, কিন্তু ওর আবার সেই বালাইটা আছে, আপিসের সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। রাখালের কাছেও ওদের সমিতির জন্যে কতবার টাকা চাইতে এসেছে, যত সব বাজে ব্যাপার, পাগলামি। এখনো কোন রকমে হাঁ-না-হাঁ-না ক'রে ওকে ঠেকিয়ে রেখেছে রাখাল, টাকা

দেয় নি। কিন্তু আজ বোধ হয় আর পারা যাবে না, ক্যাঁক ক'রে ধরবে। বিশেষ ক'রে ওর কাছে একটা সাহায্য চাইতে যাচ্ছে তো এখন। সত্যি, জোদ্দার কারণে কী না হ'তে হচ্ছে। না গিয়ে উপায়ই বা কী, অর্ধেন্দুবাবু এতক্ষণে রমাপদর কাছে নিশ্চয়ই ফোন ক'রে দিয়েছেন।

ঘরের মধ্যে ব'সে পনের-বিশ জন লোক। একজন ফর্ম বিলি করে। তাকে ঘিরে বহু বাইরের লোক দাঁড়িয়ে এবং, আশ্চর্য, সেই ভদ্রলোকটিও, যাঁকে এখুনি অর্ধেন্দুবাবুর ঘর থেকে বেরোতে দেখল। ভদ্রলোককে বেশ উত্তেজিত ব'লে মনে হচ্ছে, বলছেন:

'কী মশাই, আমাকে এই ছ'তুবার ওপর নিচে করানোর মানেটা কী?'

'কী চাই আপনার?' যে-লোকটি ফর্ম বিলি করে, সে বলল নির্বিকার ভাবে।

'মিনিট দুয়েক আগে আমাকে এই চালান ফর্মটা আপনি দেন। মনে পড়ে? তো এর ওপর আপনাদের রবার স্ট্যাম্পটা মেরে দেন নি কেন? জানেনই তো, স্ট্যাম্পটা না থাকলে ব্যাঙ্ক আমার ট্যাক্স গ্রহণই করবে না। তখন সেখান থেকে আবার আপনাদের আপিসে দৌড়োদৌড়ি করতে হবে।

'তো প্রথমবারই বলেন নি কেন?'

'আরে মশাই, আমি অত কী জানব? এটা তো আপনারই জানা দরকার, আর আপনি সেটা জানেনও। আমি একটা বাইরের লোক, দ্বিতীয়বার পি-আর-ও'র আপিসে ফিরে যেতেই ওঁরা চালান ফর্মটা দেখে বললেন, এতে তো হবে না, আবার ওপরে যান, গিয়ে স্ট্যাম্প মারিয়ে নিয়ে আসুন। তো সেটা যদি দয়া ক'রে প্রথম বারেই করতেন তো আমারও খানিকটা সময় বাঁচত, আপনারও সময় বাঁচত। ছি ছি, সাধে কি আর লোকে ট্রাম বাস পোড়ায়।'

বোঝাই যাচ্ছে, ভদ্রলোক রাগের মাথায় একটা জিনিসের সঙ্গে আরেকটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস গুলিয়ে ফেলছেন। কেরাণীটি নীরবে ফর্মটার ওপর যথারীতি স্ট্যাম্প মেরে ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিল ও ভদ্রলোক রাগে গজ গজ করতে করতে চ'লে গেলেন। তখন অন্য এক সহকর্মীর দিকে চেয়ে কেরাণীটি মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল, যেন ভাবখানা এইঃ লোকটাকে এইভাবে বাঁদর নাচ নাচিয়ে কী বাহাদুরিই না করেছি।

সত্যি, আপিসের কাণ্ডকারখানা দেখে ঘেন্না ধ'রে যায়, মনে হ'ল রাখালের। কিন্তু রমাপদটা কই? ঐ তো, হাত নেড়ে মুখ নেড়ে কাকে কী সব বোঝাচ্ছে। বলা যায় না, হয়তো সমিতিটার কথাই বলছে, লোকটাকে সমিতির সভ্য করার চেষ্টা করছে। আপিসে ব'সে কাজে ফাঁকি কি রাখাল একলা দেয়? সকলেই দেয়, যে যার নিজের কাজটি গুচোচ্ছে।

'আরে এই যে, আসুন আসুন স্যার। আপনার কথাই ভাবছিলাম।' রাখালকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রমাপদ।

'কী খবর? অর্ধেন্দুবাবুর ফোন পেয়েছিলেন?'

'কখন বলুন তো?'

'এই তো খানিকক্ষণ আগেই।'

'কই না তো। আমি তো ঘরেই ব'সে আছি, ফোন এলে নিশ্চয়ই পেতাম।'

'কী জানি, হয়তো তবে ফোন এখুনি করবেন, দুয়েক মিনিটের মধ্যেই। একটা বড় মুস্কিল হ'য়ে গেছে ভাই, আপনার একটু সাহায্যের ভয়ঙ্কর দরকার।'

'হ্যাঁ স্যার, ব'লে ফেলুন।'

'আমার এই দুজন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। এঁরা আমার অনেক কালের পরিচিত, দুজনেই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় পেশায় নিযুক্ত, এঁদের ভেতরে মার প্যাঁচ কিছু নেই। দুজনেই শিক্ষকতা করেন।'

'আইডিয়াল। ঠিক এমন লোকেরই তো দরকার আমাদের সমিতির জন্যে।'

'কিসের সমিতি?' হঠাৎ জোদ্দার প্রশ্ন।

'ভারতীয় ইতিহাস পুর্নলিখন সমিতি। এটা কোনো ধাপ্পাবাজি নয়, এর মধ্যে অনেক বড় বড় লোক আছেন, এবং এবং এই অধম হচ্ছে সমিতির অনরারী সেক্রেটারী। সভ্য হতে গেলে বার্ষিক চাঁদা দশ টাকা। দাঁড়ান, সমিতি সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য, তা এই লিটারেচারগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন।'

ব'লে রমাপদ টেবিলের ড্রয়ার খুলতে গেল।

জোদ্দা ও মেয়েটি হতচকিতের মত চেয়ে থাকে। এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল, রাখাল মনে মনে প্রমাদ গুণল।

'ভোম্বল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দি,' জোদ্দাকে বলল রাখাল। 'এঁরা একটা সমিতি তৈরি করেছেন, ভারতীয় ইতিহাস নতুন ক'রে লিখতে। এঁদের ধারণা, এবং আমার মনে হয় সে-ধারণা খুবই যুক্তিযুক্ত, যে আজ পর্যন্ত ভারতের যত ইতিহাস ইংরেজরা ও ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা লিখেছেন, তা অসংখ্য ভুল খবরাখবরে পরিপূর্ণ। এবং ভারতবর্ষকে হেয় করার জন্যে সেই ভুলগুলো ইংরেজরা ইচ্ছে ক'রে করেছে, আর সেই সব মিথ্যা ইতিহাসই আজো পড়তে আমরা বাধ্য হচ্ছি। এঁরা তাই চান সেই ভুলটাকে সংশোধন করতে।'

'ও, সে তো খুবই মহৎ কাজ,' বলল জোদ্দা, 'করতে পারলে তো ভালোই হয়। কিন্তু আমরা…'

জোদ্দার মুখ থেকে কথাটা লুফে নিয়ে বলে উঠল রমাপদ:

'ভালো নয়? That's right, you'r exactly the people we're searching for. এবং শুধু ভারতীয়দেরই বা কেন, হিন্দুদেরও মুসলমানদের চোখে ছোট করতে চেয়েছে ইংরেজরা।

জানেন, তাজমহলটা আসলে একটা হিন্দুপ্রাসাদ ছিল আগে? আর সিকান্দ্রাও তাই, কুতুব-মিনারও তাই?'

রাখাল জানে, জোদ্দা ভিতরে-ভিতরে নিশ্চয়ই ছটফট করছে, এখুনি সাক্ষী নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবেই। অথচ রমাপদকে থামানো যায় কী ক'রে? এবং থামাতে গেলে পাছে চ'টে যায়? আর চ'টে গেলেই তো তাদের স্বার্থ সিদ্ধির কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তাই রমাপদকে একটু তেল দিতেই হবে, এবং সেই তেল দেওয়ার মধ্যে দিয়েই ঘুরিয়ে জোদ্দাকে জানিয়ে দিতে হবে, কী একখানি বিচিত্র মাল এই রমাপদটি, তার কথায় গ'লে গেলে চলবে না।

'আমাদের রমাপদবাবু, বুঝলি জোদ্দা,' রাখাল বলল, 'আসলে আইনের ছাত্র। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি ওঁর এক আশ্চর্য অনুরাগ। শুধু কি তাই? আরো অনেক গুণ ভদ্রলোকের। অত্যন্ত ভালো জ্যোতিষী একজন, হাত না দেখেই শুধু কপালের দিকে একবার চেয়ে লোকের জন্ম-মৃত্যু বিবাহ ব'লে দিতে পারেন। নিজে নিয়মিত যোগ করেন, ক'মিনিট করে যেন রমাপদবাবু? দশ মিনিট, না?—দিনে রোজ দশ মিনিট মাথার ওপর দাঁড়ান। মানে শীর্ষাসন করেন। বাড়ি থেকে তিন মাইল হেঁটে আসেন আপিসে, হেঁটে ফেরেন। আর হিন্দুধর্মের সব কিছুর প্রতিই ভদ্রলোকের আশ্চর্য এক শ্রদ্ধাও। হাঁচি-টিকটিকিতে বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে আবার প্রাকৃত বুদ্ধিতেও কিছু কম যান না কারুর থেকে—অবসর সময়ে ইনসিওরেন্সসের দালালি করেন।'

না শোনার ভান ক'রেও নিশ্চয়ই গদ গদ হ'য়ে শুনছিল রমাপদ। হঠাৎ জিভ কেটে ব'লে উঠল:

'দালালিটা আর নাও বা বললেন স্যার, হাটের মাঝে হাড়ি নাই বা ভাঙলেন। সরকার টের পেলে...'

'কে, এঁরা ?' বলল রাখাল। 'আরে এঁরা আমার অনেককালের অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু, বললাম না ? এরা কখেনো কাউকে কিছু বলতে যাবে না। যাক গে, শুনুন, আপনি তো এত পরোপকার ক'রে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে, আমার এই বন্ধু দুটির একটা সাংঘাতিক উপকার এখুনি ক'রে দিতেই হবে। করবেন ?'

'আলবাত্ করব। আমার সমিতির সভ্য হ'তে চলেছেন এঁরা আর এঁদের জন্যে একটা উপকার ক'রে দিতে পারব না ? এ—পৃথিবীতে বাঁচাই তো পরের জন্যে স্যার, নয় কি ?'

'সমিতির ব্যাপারটা নিয়ে না হয় পরে কথা বলা যাবে, আর ......'

রাখালকে শেষ না করতে দিয়ে হঠাৎ জোদ্দা ব'লে উঠল ঃ আর আমরা তো কেউ ঠিক ঐতিহাসিক নই...'

'ঐতিহাসিক নন ?' রমাপদর প্রশ্ন। 'আমি নিজেই কি ঐতিহাসিক নাকি ?' But we cann't escape history, we're all part of historv ভেবে দেখুন কথাটা, একটা ভীষণ গভীর কথা......'

'গভীর কথা শোনার সময় আমাদের নেই,' হঠাৎ জোদ্দা দৃঢ়স্বরে ব'লে উঠল। 'আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি দুজন। সাক্ষী চাই। আপনি যাবেন ?'

'বিয়ে করতে যাচ্ছেন ? আপনি আর..... এই ইনি ?

'হ্যাঁ, আমি আর ইনি। আপনি আসবেন ?'

'নিশ্চয় আসব। আপনার সঙ্গে এঁর বিয়ে। আপনারা সশরীরে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন, আর আমি আসব না ?'

'আপনি তা হ'লে আসছেন সাক্ষী দিতে ?' জোদ্দা যেন হাতে স্বর্গ পেল।

'সাক্ষী ? কিসের সাক্ষী ?' রমাপদর চোখ দুটো দেখে মনে হয় যেন সে ভূত দেখেছে।

'বিয়ের সাক্ষী। এটা রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ, সাক্ষী চাই। এখুনি যাচ্ছি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ, আর সাক্ষী দিয়ে ফিরেও আসবেন এখুনি।

জোদ্দাই চালাচ্ছে কথাবার্তা। চালাক। ওর ব্যাপার, ওকে নিজেই দেখতে হবে। রাখাল তো আর পেরে উঠছে না।

'দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই,' রমাপদ বলল, কোথাও একটা কিছু ভুল হ'য়ে গেছে বোঝার। মশাই, সাক্ষী-ফাক্ষী তো জীবনে দিই নি।'

'আরে,' রাখাল বোঝাতে গেল, 'এ-সাক্ষী তো······'

'না স্যার, ঐ একই হ'ল। ও-সব অনুরোধ করবেন না। আমিও আমার অনুরোধটা তুলে নিচ্ছি, তিনজনের কাউকেই সমিতির সভ্য হ'তে আর বলব না। ব্যস, কাটাকুটি হ'য়ে গেল, খুশী তো ?'

'আরে, রমাপদবাবু আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন···'

'না, Please রাখাল,' রাখালকে থামিয়ে বলল জোদ্দা, 'তর্ক করার সময় নেই, অন্য জায়গায় চল।'

'চল।'

কিন্তু কোথায় যাবে ? কিছুই ভেবে পায় না রাখাল। জোদ্দার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না, নিজেকে কেমন বড্ড অপরাধী অপরাধী ব'লে মনে হচ্ছে। অথচ সে কী দোষ করেছে ? যাদের কথা ছিল আসার, তারা গা-ঢাকা দিয়েছে। এখন এই ঝক্কি তাকে বহন করতে হবে, কেন ? কিন্তু কেনই বা নিজেকে এ-সবের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনল, কেনই বা সে জোদ্দাকে সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দিল ? এখন সে করবে কী, কী ক'রে নিজেকে বাঁচাবে ? অথচ প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছিল, তখন ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা এত দুঃসাধ্য ঠেকবে পরে।

মেয়েটার চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, তাও বাইরেব আকাশের মত গুরু গম্ভীর, মেঘাচ্ছন্ন। একটা কিছু তো এখুনি এখুনি ক'রে ফেলতেই হবে—কী করবে ? কোথায় যাবে ? তার মনে হ'ল, নিজেকে এর মধ্যে না জড়িয়ে তার আর নিস্তার নেই। অর্ধেন্দুবাবু বা অন্য কারুর ওপর নির্ভর ক'রে থাকলে চলবে না,

এ-সাক্ষী তাকে নিজেই যোগাড় করতে হবে। এবং সেই কারণে যদি তাকে একদিন আদালতে দাঁড়াতে হয় তো হবে, তার চাকরি নিয়ে যদি একদিন টানাটানি পড়ে তো পড়বে।

গিরিজাবাবুর কাছে গেলে হয় না? শিবপ্রসন্নবাবুর ছেলেটার গলা ফোলা কিছুতেই সারছিল না, কত চিকিৎসা করলেন, কত বড় বড় ডাক্তার দেখালেন। অবশেষে মাস দেড়েক আগে রাখালই তাঁকে পরামর্শ দেয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক'রে দেখতে, ডাক্তার মজুমদারের কাছে যেতে। এখন ছেলেটা প্রায় সেরে উঠেছে। আর গিরিজাবাবুর ছোট মেয়েটাও কি নার্সারী স্কুলে জায়গা পেত যদি রাখালের শালী না সাহায্য করত? না, এরা দুজনেই রাখালের কাছে কৃতজ্ঞ, প্রতিদানে তাঁদের কাছ থেকেও কিছু সাহায্য চাইবার অধিকার রাখালের নিশ্চয়ই থাকতে পারে, নয় কি?

গিরিজাবাবুদের ঘরটা রাখালের ঘরেরই কাছে, এক তলায়। তাই সিঁড়ি ধরা আবার, এবার তলার দিকে মেয়েটাও নামছে হন হন ক'রে। রাখাল মনে মনে প্রার্থনা করছে, যা হবার হ'য়ে গেছে, নিজেকে জড়িয়ে যখন সে ফেলেছেই তখন আর উপায় নেই, কিন্তু এবার গিরিজাবাবু যেন রাজী হন, শিবপ্রসন্নবাবু যেন রাজী হন, বন্ধুর কাছে তার চোখটা যেন বজায় থাকে। অথচ চোখ ফুটে আর কোনো আশ্বাস সে দিতে পারছে না জোদ্দারকে, কেমন যেন ভয় ধরতে আরম্ভ করেছে তার ভিতরে ভিতরে, হাড়ের মধ্যে, মজ্জায় মজ্জায়। শুধু এখনো আশা করছে হবে, হ'য়ে যাবে, প্রার্থনা করছে যেন হয়, যেন হ'য়ে যায়।

আর এই যে সে ক্রমাগতই চলেছে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে অন্যের হ'য়ে সাহায্যের ভিক্ষা চাইতে, এততেও কি তার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। সেই জোদ্দাকে কিছু না জেনে শুনে একটা খামাখা প্রতিশ্রুতি দিতে যাওয়ায় যে-ভুলটা, তার? তবে? আরো কি

গঞ্জনা আছে তার কপালে? তার বন্ধু কি শেষকালে এই ধারনা নিয়েই ফিরে যাবে যে রাখালের সহকর্মীরা রাখালকে বিশ্বাসই করে না, তার কোনো অনুরোধই রাখে না? যদি কিছুই না হয়, সাহায্য করতে যদি কেউই না এগিয়ে আসে, তবে হয়তো তাকে নিজেই চ'লে যেতে হবে এদের সঙ্গে। কিন্তু সে-উপায়ও তো সে আর রাখে নি। সে তো আগেই ব'লে দিয়েছে, না ভাই, আমার অন্য কাজ আছে এখন যদি বাধ্য হ'য়ে তাকে নিজেই যেতে হয় তো জোদ্দ কি তবে ভাবতে বসবে না, তাহ'লে আগে রাখাল তাকে একটা ধাপ্পা দিয়েছিল, একটা মিথ্যে ওজর দিয়ে এর মধ্যে মাথা গলাতে চায় নি? তাহ'লেও বন্ধুর কাছে তার সেই চোখটি নষ্ট হচ্ছেই। এ যেন শাঁখের করাত।

দোতলায় পৌঁছোতে না পৌঁছতেই দেখে, ১১০ নম্বর ঘরের সামনে বেঞ্চিতে একটা পিওনের সঙ্গে ব'সে শ্রীমান কৃষ্ণধন, আরামে বিড়ি ফুঁকছে। আরে, এ-হতভাগাটা এখানে কী করছে? স্রেফ আড্ডা মারা ছাড়া কোনো কাজ নেই—রাখালের বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমানও বেরিয়েছে। ইচ্ছে হ'ল, একবার টেনে ধমক দেয়। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল—মনে হ'ল সত্যি তো, এই তো একটা চমৎকার সমাধান চোখের সামনে রয়েছে। ডাকল:

'কৃষ্ণধর!'

'আজ্ঞে স্যার,' কৃষ্ণধন তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল।

'এখুনি যেতে হবে এই বাবুর সঙ্গে রাইটার্সবিল্ডিং-এ, একটু সাক্ষী দিয়ে আসতে হবে। আর একজন পিওন-টিওন কাউকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাও।'

'কে সাক্ষী দেবে স্যার?'

'তোমরা। কথায় কথা বাড়িও না, সময় নেই। বিয়ের ব্যাপার, অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার, ভয়ের কিছু নেই। যাবে আর আসবে।'

'ওরে বাবা স্যার। সাক্ষী-ফাক্ষী দিতে পারব না স্যার। আর যা বলুন করব স্যার। এখান থেকে যদি নৈহাটী হেঁটে চ'লে যেতে বলেন স্যার, তাও করব স্যার। আপনারা মা-বাপ স্যার।'

'এত ভয়টা কিসের তোমার?'

'আমি কী করেছি স্যার? চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি, কাউকে খুন করিনি, কেউ আমায় খুন করে নি, আমাকে কেন সাক্ষী দিতে পাঠাচ্ছেন স্যার? আমার ঠাকমা শুনলে হার্টফেল ক'রে মরবে স্যার। এই আপনার পা ছুঁচ্ছি...'

'থাক থাক, বেশ তোমায় যেতে হবে না।'

'মাপ করুন স্যার, আপনারা মা-বাপ স্যার। সাক্ষী, পুলিশ, হাতে হাতকড়া, তারপর ফাঁসি, ওরে বাবা, না স্যার...'

এবার কিন্তু জোদ্দা একটি কথাও বলল না, নিঃশব্দে তলায় নামতে আরম্ভ করল। মেয়েটাও জোদ্দার অনুসরণ করল। বাঙাল যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। কৃষ্ণধনটা পর্যন্ত যেতে রাজী হ'ল না? তাহলে আর কাকে সে রাজী করাতে পারবে? কোনো অফিসারকে, বা অন্য কোনো কেরাণীকে, বা কোনো কর্মচারীকে? ভাবার সময় নেই। দৌড়ে সেও অনুসরণ করল জোদ্দাদের।

যেমন গিরিজাবাবু, তেমনি শিবপ্রসন্নবাবু, জনেই অত্যন্ত সজ্জন, অতি মিষ্ট ব্যবহার। কিন্তু তাঁদের কাছে গিয়েও অভিজ্ঞতার কোনো রকমফের হল না। 'ও, এত পরে বিয়ে করছেন, কী সুখের কথা। আরে ভাই, বিয়ে না ক'রে কি চলে মানুষের? সুখী হন মশাই, সারাজীবন দাম্পত্যসুখ উপভোগ করুন, আর কী বলব।' ইত্যাদি ধরনের কথা। কিন্তু যে-মুহূর্তে ওঠে সাক্ষী দিতে যাওয়ার প্রশ্ন, যে-স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত আনন্দের আলো একটু আগে তাঁদের চোখে দেখা গিয়েছিল, তা যেন দপ্ ক'রে নিবে যায়। গিরিজাবাবু তো স্পষ্টই বললেন:

'আরে মশাই, সাক্ষী-ফাক্ষী দিয়ে কি আর বিয়ে হয়? আর আপনাদের তো কারুরই কেউ-ই নেই সংসারে, তো ভয়টা কী? ধ'রেই নিন না কেন আপনাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। দুজনে দুটো ভিন্ন সংসার চালিয়ে তো লাভ নেই, আর তাতে খামাখা খরচাও বেশী, আপনি এইখানে, আর উনি সে···ই ঐখানে। কেন, কী দরকার? তার চেয়ে এক সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করুন স্বামী-স্ত্রীর মত। পরে সুবিধে দেখে কোনোরকমে নমো-নমো ক'রে হিন্দু মতে একটা বিয়ে ক'রে ফেললেই পাড়াপড়শীর মুখটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, ব্যস। বিয়েটা একটা সামাজিক কর্ম, বুঝলেন? নিজের সন্তুষ্টির জন্যে। ছেলের মেয়ে পেলেই হ'ল, আর মেয়ের ছেলে পেলেই হল। কেবল সমাজের চোখটা ঠাণ্ডা করার জন্যেই বিয়ে না ক'রে মানুষ পারে না। নয় কি?'

প্রস্তাবটা জোদ্দাদের খুব একটা মনঃপূত হ'ল বলে মনে হ'ল না। হওয়া উচিতও নয়। এটা আবার কী রকম একটা কথা হ'ল? বিয়ে না ক'রে স্বামী-স্ত্রীর মত থাকবে এক সঙ্গে?

রাখাল তাকাল জোদ্দার চোখের দিকে—তেমন একটা সাহসের সঙ্গে নয়, সাহসের প্রশ্নই নেই আর, যেমন রাখালের লজ্জারও প্রশ্ন নেই আর, তার কোনো সংকোচেরও প্রশ্ন নেই। সে কেমন যেন একটা পাষাণ হ'য়ে যাচ্ছে, জোদ্দারা তার সম্বন্ধে কী ভাবতে পারে বা না পারে, সে-চিন্তায় যেন সে আর এতটুকু উদ্বিগ্নও নয়। আর যেন কোনো অনুভূতিই নেই। চেয়ে দেখে, জোদ্দার চোখ মড়ার মত ফ্যাকাশে।

'ক'টা বাজল তোর ঘড়িতে?' যেন কিছুই হয় নি, শুধু একটা কোনো কথা বলতে হবে ব'লেই বলছে, এমন ভাবে জিজ্ঞেস করল জোদ্দা।

'চারটে বেজে পাঁচ।'

অর্থাৎ এখনো মিনিট দশেক সময় অনায়াসেই হাতে

আছে। এক নতুন সম্ভাবনার আশায় দুলে উঠল রাখালের মন, বলল ঃ

'দাঁড়া, একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি ক্যান্টিনে গিয়ে, যাবি? ওখানে অনেক লোক ব'সে থাকে, হয়তো বাচ্চুটাও ব'সে আছে, আড্ডা মারছে। আর বাচ্চুটাকে একবার পেয়ে গেলে কোনো ভাবনাই নেই আর। যাবি?'

'চ', এত আস্তে বলল জোদ্দা যে কথাটা যেন শোনাই গেল না।

আবার সেই দালান। কত অজস্র লোক আসছে যাচ্ছে, এদের একজনও কি সাক্ষী হ'তে পারবে না? না একবার বললেই এরা প্রত্যেকেই রাজী হ'য়ে যাবে? কে জানে। হঠাৎ যেন এক রূপকথার রাজ্যে এসে পৌঁচেছে রাখাল, এ যেন তার এতদিনের পরিচিত আপিস নয়, এ-দালানে যেন সে আগে কোনোদিন হাঁটেনি। আর এত যে লোক ঘুরছে দালানে, তাদের মুখও সে আজ এই প্রথম দেখছে। তবে থামাবে কি লোকগুলোকে এক এক ক'রে? কিন্তু সাহস নেই, শক্তি নেই। ভয় করছে। আর এই যে ক্যান্টিনে চলেছে, সেখানে গিয়েও যদি কিছু না হয়, তবে? তার চেয়ে এসব পণ্ডশ্রম আর না ক'রে সে নিজেই কি চ'লে যাবে এদের নিয়ে? কারণ তার তো সত্যিই কোনো কাজ নেই, সে তো অনায়াসেই যেতে পারে, গিয়ে সাক্ষী দিতে প' র। আর আজ বিকেলটা তার নষ্ট এমনিতেও হয়েছে অমনিতেও হবে। বরং সাক্ষীটা দিতে পারলে হয়তো খানিকটা ভালো লাগতেও পারে।

তবু মনটা যেন কেমন অবশ অসাড় হ'য়ে গেছে, ইচ্ছে থাকলেও যেন সে যেতে পারবে না রাইটার্সবিল্ডিং-এ, তার পা দুটো যেন কে বেঁধে রেখেছে আর তার একলা গিয়ে এখন লাভটাই বা কী হবে? অন্তত দুটো লোকের দরকার তো।

নিজের চিন্তায় মশগুল হ'য়ে -ত দুয়েক এগিয়ে এগিয়ে চলছিল রাখাল। হঠাৎ মনে হ'ল, আসছে তো জোদ্দারা? পিছন ফিরে

তাকিয়ে দেখে ঠিকই আসছে, যন্ত্রচালিতের মত। মেয়েটার মুখটা যেন সেই মায়ের মত, যার একমাত্র সন্তান সদ্য মারা গেছে, সেই সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে যেন সে শ্মশানঘাটে চলেছে। কী বিলুপ্ত শূন্য দৃষ্টি সেই ছুটি বড় বড় চোখের, দেখে রাখাল আঁৎকে উঠল :

ক্যান্টিনে ঢুকে দেখে অজস্র লোক, নানান স্বর কানে ভেসে আসছে। যাক, বাচ্চুও রয়েছে। চা খাচ্ছে, তাকে ঘিরে তিন চারজন উৎসুক শ্রোতা, নিশ্চয়ই আজকের কোনো ঘটনা ফলাও ক'রে বলছে।

'এ কি! আজ কোনোদিকে সূর্য উঠল রে? তুই ক্যান্টিনে সটাং?' রাখালকে দেখেই ব'লে উঠল বাচ্চু।

'ভয়ংঙ্কর দরকারে প'ড়ে এসেছি ভাই। আমার এই তুই বন্ধু বিয়ে করতে যাচ্ছেন··'

'বিয়ে করতে যাচ্ছেন? কনগ্রাচুলেশনস। আজ দেখি একটার পর একটা অভিনব ব্যাপার ঘটছে।'

'আবার কী অভিমব ঘটল?'

'গড়িয়ার সেই মালের কথা মনে আছে? আদি গঙ্গায় চান করতে গিয়ে একটা শিবলিঙ্গ কুড়িয়ে পেয়েছিল? সেই যে রে, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী,শালা আসে পাকিস্তান থেকে, আগে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে খেত?'

'হ্যাঁ, সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে আজ যে বিরাট বড় লোক হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তিন-তিনখানা বাড়ি তুলে ফেলেছে রে। শিবলিঙ্গের মাথায় হাত দিয়ে যাকে যা খুশী বলছে, সব ফ'লে যাচ্ছে। পয়সাও আসছে প্রচুর। শুধু কি পয়সাই? পয়সার সঙ্গে কাপড়টা, চালটা, আজ ঘিটা, কাল তেলটা, পরশু ত্যানোটা, আর তা ছাড়া তো এক গাদা মেয়েছেলের দল আছেই, ব্যাটা সিদ্ধ বাবা হ'য়ে বসেছে মন্দিরে। এত সম্পত্তির উৎস কোথায় জানতে

চাইলেই লোকটা শিবলিঙ্গটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে, বলবে সবই ওনার ইচ্ছা, সবই দেবোত্তর সম্পত্তি। অতএব সে ট্যাক্স দেবে না। কিন্তু আজ শালাকে ধরেছি, কেমন ক'রে ধরলাম জানিস?'

'আরেকদিন শুনব ভাই, আজ সময় নেই। আমার এই তুই বন্ধু বিয়ে করতে চলেছেন, এঁরা কলকাতায় কাউকে চেনেন না, কলকাতায় থাকেনও না, একটা অত্যন্ত জরুরী সাহায্যের দরকার এক্ষুণি।'

'সব ঠিক ক'রে দেব, ভাবিস নে। ভাববেন না মশাই। যত গণ্ডগোল আছে আমার ঘাড়ের ওপর ছেড়ে দিন, নিশ্চিন্ত হন। বলে কত লোকের কত বিয়ের যোগাড় ক'রে দিলাম আজ পর্যন্ত।'

'যেতে পারবি এঁদের সঙ্গে এখুনি রাইটার্সবিল্ডিং-এ সাক্ষী দিতে?'

'সাক্ষী দিতে? কিসের সাক্ষী?'

'রেজিস্ট্রীম্যারেজ রে। এক্ষুণি যেতে হবে, মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

'ও, এক্ষুণি? সাক্ষী দিতে? কিন্তু সেটা তো হবে না ভাই, আরেকটা জরুরী কাজ যে আগেই নিয়ে নিয়েছি হাতে। তুই যদি শুধু আধ ঘণ্টা আগে আমাকে জানাতিস তো·'

'কী আর এমন জরুরী কাজ তোর? চ'লে যা না। এঁদের বড্ড উপকার হয়।'

'উপায় নেই ভাই, পারলে কি যেতাম না? তো তোর কী হ'ল? তুই যা না।'

'আমারও যে একটা কাজ প'ড়ে গেছে।'

বাচ্চু শুধু একটু হেসে তাকাল রাখালের দিকে। আর কোনো মন্তব্যের দরকার নেই যেন, তুজনেই তুজনের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। রাখালের গা'টা শির শির ক'রে উঠল, বলল:

'তবে? কী হবে ভাই? দুটো সাক্ষী কোনোরকমে যোগাড় ক'রে দে না, তুই তো সকলকে এত ভালো ক'রে চিনিস। আমি কতক্ষণ ধ'রে চেষ্টা করছি···'

তারপর এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে। এবার কর্মাধ্যক্ষ হয়েছে বাচ্চু, কথাবার্তার ভার সে-ই নিয়েছে! রাখালের সমস্ত কপালটা-মুখটা ঘেমে নেয়ে উঠেছে, ঠোঁটে নোনতা-নোনতা স্বাদ। বাচ্চুর আগ্রহের অন্ত নেই, ছেলেটা সত্যিই ভালো। কিন্তু যার কাছেই যায়, কেউ নড়ে না, সকলেরই এক আশ্চর্য উদাসীন দৃষ্টি। কে একজন বিয়ে করতে চলেছে, তাতে কার কী? প্রতি নিয়তই তো কত বিয়ে হচ্ছে। কোন হৃদয়ের দরজায় ধাক্কা দিতে চেষ্টা করছে বাচ্চু? সে-হৃদয় যে এক পাষাণ দুর্গের অচল অনড় প্রাচীর।

'আশ্চর্য তো,' আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বলল জোদ্দা, 'কলকাতা সহরে এত লোক, এই পাল পাল লোক, আর আমরা দুটো সাক্ষী পাব না?'

চমকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল রাখাল, তাকাল বাচ্চু।

'আপনারা কি কেউ শুনতে পাচ্ছেন না?' চেঁচিয়ে উঠল জোদ্দা, 'আমরা দুজন· দুজনকে ভালোবাসি। আমাদের জীবনে এক শুভ মুহূর্ত এসে হাজির, এক শুভতম মুহূর্ত, সেই মুহূর্তটি ঘটতে দয়া ক'রে সাহায্য করুন। আপনারা তো এতজন এখানে বসে আছেন, চা খাচ্ছেন, গল্প করছেন। দুজন, মাত্র দুজন কি এগিয়ে আসবেন না? আপনাদের ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে যাব, ট্যাক্সি ক'রে পৌছিয়ে দেব এখানে, যাবেন আর আসবেন।'

লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি? দেখে বড্ড করুণা হচ্ছে। কেন জানে না, রাখালের মনে প'ড়ে যাচ্ছে রাসবিহারী এভেনিউ-এর ট্রামস্টপের সেই অন্ধ ভিখিরীটার কথা, ট্রামের এক জানলা থেকে আরেক জানালায় যে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়, তার স্ত্রী তার হাতটা ধ'রে থাকে।

এতক্ষণে ক্যান্টিনের সবাই মুখ তুলে চেয়েছে জোদ্দার দিকে, যেন তামাসা দেখছে, একটা নাটক হচ্ছে। কিন্তু এ-কোন অরণ্যে রোদন করতে এসেছে জোদ্দা? রাখালের বুকটায় মোচড় দিয়ে উঠল, অথচ কিছু করার নেই, শুধু ব'সে ব'সে এ-নাটক দেখার আছে, শোনার আছে।

'ও,' ব'লে জোদ্দা আবার, 'দেখছি এমন মহানুভব আপনাদের মধ্যে একজনও নেই। চল নীলু, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়, আর কিছু হোক বা না হোক, অন্তত এই নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে চ'লে যাই।'

নীলুর হাত ধ'রে টানে জোদ্দা।

'দাঁড়া, শোন,' বলতে যায় রাখাল।

'না ভাই, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। দ্যাখ, এঁদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, কারণ এঁরা আমায় চেনেন না, এঁদের ওপর আমার দাবী নেই। কিন্তু তুই? তুই অনায়াসেই যেতে পারতিস, এতক্ষণে গিয়ে ফিরে আসতে পারতিস, শুধু ইচ্ছে ক'রে গেলি না। তুই না কবিতা লিখিস? তুই না একটু আগে মানুষের প্রেম নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিলি? কিসের কবিতা লিখিস রে? লজ্জা করে না তোর কবিতা লিখতে?'

এ-প্রশ্নের কী উত্তর দেবে রাখাল, কোনো উত্তর কি তার জানা আছে? শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

'চল নীলু,' ব'লে নীলুকে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল জোদ্দা। যাবার আগে একবার কারুর দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

বিমূঢ়ের মত কাটল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে আসতেই রাখালও হঠাৎ উঠল, এবং রাখালের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চুও। ও বাচ্চুর পিছন-পিছন আরো দুয়েকজন। বেরিয়ে দালানে পড়তেই দেখে দূরে জোদ্দা ও মেয়েটা হেঁটে চলে যাচ্ছে হন হন ক'রে। রাখালও পা চালিয়ে চল্ল তাদের পিছন পিছন, কেন জানে

না। এই দালানটা, এই এত লোকের মুখগুলো, কানে ভেসে আসা এর-ওর দুয়েকটা বিচ্ছিন্ন কথার ধ্বনি, সব যেন কেমন অবাস্তব ঠেকছে। জোদ্দারা গেট পেরিয়ে গুর্খা দারোয়ানটার সামনে দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল, দালানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তাও দেখল রাখাল। তারপর নাটক দেখা যেন শেষ হয়েছে, এই মনে ক'রে ফিরে এল নিজের ঘরে।

কী ভীষণ একলা ঘরটা, যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে। সত্যি, তার যাওয়া উচিত ছিল, খুবই উচিত ছিল এতদিনের একটা বন্ধু, তার সঙ্গে এমন অমানুষি ব্যবহার রাখাল কী ক'রে করল। তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে অনুতাপে, নিজের ওপর এক প্রচণ্ড আক্রোশে আপিসটাকে তার মনে হ'ল এক মৃত ধ্বংসস্তূপের মত, আর এই বিকেলটা, তার সেই লাঞ্চের পরের একলা ঘরের এত সাধের বিকেলটা, তা যেন এখন প'ড়ে রয়েছে এক মূর্তিমান বিপর্যয়ের মত। তবে কি তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এখনো হ'তে পারে, তবে কি সে এখুনি ছুটে বেরিয়ে যাবে রাস্তায়, ওদের খুঁজতে? কিন্তু কোথায় খুজবে ওদের, কোন্ পথে ওরা গেছে কে জানে। ওরা নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে ভিড়ে। অবশ্য রাইটার্সবিল্ডিং-এ সটাং চ'লে যেতে পারে রাখাল, কিন্তু সেখানে যদি ওরা না যায় আর?

ছটফট করছে রাখাল, না পারে বসতে, না পারে দাঁড়িয়ে থাকতে। হঠাৎ নজরে পড়ল মন্টুবাবুর টেবিলের ওপর জোদ্দার রেখে যাওয়া চিঠিটা। খুলে পড়ে:

'মন্টুবাবু,

যথাসময়েই এসেছিলাম। চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বুঝছি, আপনাকে নিশ্চয়ই কোনো জরুরী কাজে আটকে প'ড়ে যেতে হয়েছে। যাকগে, ভাববেন না। সাক্ষী মিলেছে। জানেন, আপনাদের রাখাল চক্রবর্তী আমার বাল্যবন্ধু? ভারী আশ্চর্যভাবে

তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। এবং তারি দয়ায় দুজন সাক্ষী পেয়ে গেলাম। এখন চলেছি রাইটার্সবিল্ডিং-এ। কাল সন্ধ্যায় নীলুকে নিয়ে যাব আপনার বাড়ি। থাকবেন তো?

প্রীতি নমস্কারান্তে

জয়দ্রথ খাঁ

চিঠিটা প'ড়ে দ্বিগুণ অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল রাখাল। অতএব এই দয়াটাই সে করল তার বাল্যবন্ধুকে। এখনো কানে বাজছে জোদ্দার কথাটা: 'লজ্জা করে না তোর কবিতা লিখতে?' এত দূর এসে ফিরে যেতে হ'ল জোদ্দাকে, এত তোড়-জোড় ক'রে, সব গুছিয়ে এনে, ঘুষটুষ দিয়ে বিয়ের দিনটাকে এগিয়ে এনে···

হঠাৎ মনে হ'ল রাখালের সত্যিই তো, একবার যখন ঘুষ দিতে শিখেছেই জোদ্দা, আর একবার ঘুষ দিতে পারবে না সে? নিশ্চয়ই পারবে। এবং এ-সম্ভাবনার কথা জোদ্দার মনে জেগেওছে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে। অতএব খামাখা এত লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপির দরকারটা ছিল কি তার? এত অপ্রীতিকর কথাবার্তা, এত লোককে এত কথা শোনানো, এমন নাটুকেপনা, এসব কি একেবারেই অর্থহীন নয়? ফিরে যাও রাইটার্সবিল্ডিং-এ, গিয়ে সেখানকার দুয়েকটা লোককে আট আনা দশ আনা শিস দাও। ব্যস, তারা সাক্ষী দিয়ে দেবে। তাদের কী যায় আসে, তুমি কে, কাকে বিয়ে করছ, কেন বিয়ে করছ, কী বৃত্তান্ত তাদের ভারী ব'য়েই গেল।

সত্যিই তো, এ-কথাটা রাখালের এতক্ষণ মনে হয় নি কেন? মনে হ'লে তাকে আর এই মিথ্যা মনঃকষ্টে ভুগতে হত না। জোদ্দারা নিশ্চয়ই ফিরে যাচ্ছে রাইটার্সবিল্ডিং-এ, এবং ওদের বিয়েটাও হ'য়ে যাচ্ছেই। তেমন সন্দেহ থাকলে রাখাল না হয় পরশু একবার জিজ্ঞেস করবে মণ্টুবাবুকে, জোদ্দারা ওঁর সঙ্গে

দেখা করতে এসেছিল কি না, কী হ'ল না হ'ল। আর সে-সবেরই বা কী দরকার? না, এ-মনঃকষ্টে ভোগার তার কোনো অর্থই হয় না।

যাক, বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। কিন্তু রাইরার্স বিল্ডিং-এ ফিরে গিয়ে আবার ঘুষ দেওয়ার কথাটা মনে আসবে তো জোদ্দার? কেন আসবে না, নিশ্চয়ই আসবে। আর জোদ্দার মনে না এলে মেয়েটার মনে আসবেই। তবে?

কখন আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে ঘর ছেড়ে দালানের প্রান্তে এসে পৌ:চেছে রাখাল, খেয়ালই নেই। হঠাৎ দেখে, গেট দিয়ে মণ্টুবাবু আর সৌরেন সেন ঢুকছে, ধীর মন্থর গতিতে, যেন কিছুই হয় নি, এমন একখানা ভাব। কী ব্যাপার? জোদ্দার সঙ্গে তবে কি ওদের দেখা হয়েছে রাস্তায়, না ওরা সটাং রাইটার্স বিল্ডিং-এ তুল ক'রে চ'লে যায়, অপেক্ষা ক'রে ক'রে এতক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরছে? অথবা জোদ্দার ব্যাপারটা একেবারে ভুলেই গিয়েছে, অন্য কোথাও গিয়েছিল, ফিরে আসছে? অথবা ইচ্ছে ক'রে জোদ্দাকে এড়িয়ে তবে ফিরছে এখন?

রাখালকে দেখেই মণ্টুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন:

'রাখালবাবু, একটু ক্যান্টিনে যাচ্ছি ভাই, এখনো চা খাওয়া হয় নি। একটা কাজ করবেন?'

'কী?' রাখাল দালানে দাঁড়িয়েই বলল।

'এক শালা শূয়োরের বাচ্চার আসার কথা আছে সাড়ে চারটেয়। যদি আসে তো একটু বসতে বলবেন?'

চমকে ওঠে রাখাল। কার কথা বলছে রে বাবা? চেঁচিয়ে বলল:

'কার আসার কথা অছে?'

'শালার নাম মাগনিরাম ঢনঢনিয়া।'

ব'লে রাখালের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ভদ্রলোক ক্যান্টিনের দিকে এগোলেন সৌরেনসেনকে নিয়ে। খাসা। রাখাল

কি তবে ছুটে যাবে, জিজ্ঞেস করবে জোদ্দার সম্বন্ধে ? পরক্ষণেই মনে হ'ল, কী দরকার ? সবই ঠিক হ'য়ে যাবে, নিশ্চয়ই ঠিক হবে। আর ঠিক যদি না-ই হয়, তাতেই বা কী ? সবঠিক হওয়া-না-হওয়া তো আর তার ওপর নির্ভর করছে না, সে একটা সামান্য মানুষ বই নয়। এতক্ষণে, এত ব্যর্থ অপেক্ষার পর, নিজের ঘরটাকে অবশেষে পেতে পারবে একেবারে একলা ক'রে। অবশ্য কতক্ষণের জন্যেই বা, ছুটির তো বেশী দেরী নেই আর ঐ চনচনিয়াটারও আসার কথা আছে। তবু সে হতভাগা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তো রাখাল একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারবে।

কী মেঘই করেছে আকাশটায়, বর্ষা নামল ব'লে। অতএব সেই মধুর অপেক্ষাটিও করার আছে ঘরে ফিরে গিয়ে বৃষ্টির অপেক্ষা।

———